শরৎচন্দ্রের শিল্প-চাতুর্য্য

প্রথম খণ্ড

শ্রীক্ষীরোদবিহারী ভট্টাচার্য্য

ও

শ্রীরামগোপাল চট্টোপাধ্যায়

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রকাশক ঃ

শ্রীরাধারমণ চৌধুরী, বি. এ.

প্রবর্ত্তক পাবলিশিং হাউস,

৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

'রাস-পূর্ণিমা, ১৩৪৭

মূল্য দুই [illegible]

প্রিণ্টার ঃ

শ্রীফণিভূষণ রায়

প্রবর্ত্তক প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৫২।৩, বহুবাজার ষ্ট্রীট্‌,

কলিকাতা।

শরৎসাহিত্য রত্নখনি। তন্মধ্যে যে বিশিষ্ট রত্নগুলি আমাদের দৃষ্টিপথে প্রথম পড়িয়াছে তাহারই আলোচনায় প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইল। এই খণ্ডে শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ মুখ্য নারী-চরিত্র-গুলির চিত্রণ-বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ-পন্থায় আলোচনা করা হইয়াছে। শরৎসাহিত্যের অপরাপর বিশিষ্ট সম্পদের রূপ প্রকাশের এবং শিল্প-চাতুর্য্য ও মাধুর্য্যের বিস্তারিত আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

দারজিলিং
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭

গ্রন্থকারদ্বয়

ভূমিকা

এই বইখানির নাম হচ্ছে "শরৎচন্দ্রের শিল্প-চাতুর্য্য", কিন্তু প্রথম খণ্ডে তাঁর শিল্প-চাতুর্য্যের বিশেষ কোনও পরিচয় দেওয়া হয়নি। শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যায় লেখকের ভাষায় আর তাঁর গল্প-রচনায়। উপন্যাস-লেখকদের মধ্যে কারো ভাষা চমৎকার, আবার কারো তা' নয়। ইংরাজী নভেল-লেখকদের মধ্যে Thackeray-র ভাষা সুন্দর, কিন্তু Dickens-এর নয়। অথচ ইংরেজদের মতে Dickens Thackeray-র চাইতে বড় নভেলিষ্ট। তারপর গল্প গড়ে' তোলবার কৌশলও সকলের সমান নয়।

এই পুস্তকের লেখকদ্বয় এই দুইটি বিষয়ের পাশ কাটিয়ে গিয়েছেন এই বলে যে, দ্বিতীয় খণ্ডে তাঁরা শরৎচন্দ্রের শিল্প চাতুর্য্যের সম্যক্ বিচার করবেন।

কোন লেখক প্রসিদ্ধি লাভ করলে পাঠকদের মনে তাঁর দোষগুণ বিচার করবার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। আর যাঁরা তাঁদের মত ব্যক্ত করেন, তাঁদের আমরা বলি সমালোচক। এ ক্ষেত্রে লেখকদ্বয়ও শরৎচন্দ্রের সমালোচক মাত্র।

বাঙলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস লেখক হচ্ছেন বঙ্কিমচন্দ্র, কেননা তাঁর পূর্ব্বে যে-সব গল্প লেখা হয়েছিল, সে সবই নগণ্য; একমাত্র "আলালের ঘরের দুলাল" ছাড়া। নভেল হিসাবে উক্ত গ্রন্থের বহু ত্রুটী থাকা সত্ত্বেও, এইটিই হচ্ছে বাংলা ভাষায় প্রথম নভেল।

তারপরে বঙ্কিমের যুগে বঙ্কিম ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী উপন্যাস-লেখক। আজ পর্য্যন্ত আমরা তাঁকে সাহিত্যিক হিসাবে উচ্চাসন দিই।

এর পরের যুগকে আমরা রবীন্দ্রনাথের যুগ বলি। তিনি অসংখ্য ছোট গল্প লিখেছেন এবং বহু উপন্যাসও লিখেছেন। তাঁর প্রতিভা

অতুলনীয়। আমরা ক্ষুদ্র সাহিত্যিকরা সকলেই তাঁর কাছে ঋণী। কি ভাষায়, কি ভাবে,—তাঁর বিরাট প্রতিভার প্রভাব এড়িয়ে যাবার উপায় নেই। সুতরাং এ যুগ যে রবীন্দ্রনাথের যুগ, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই।

আমরা যারা কবিতা বা ছোট গল্প লিখি, তাঁর সাহিত্যের আবহাওয়াই আমাদের সাহিত্যিক মন গড়ে' উঠেছে। রবীন্দ্র-যুগ আজও শেষ হয়নি। রবীন্দ্রনাথের পদানুসরণ করে অসংখ্য লেখক অসংখ্য ছোট গল্প লিখেছেন এবং কেউ কেউ উপন্যাসও লিখেছেন।

এই নভেল-লেখকদের মধ্যে শরৎচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা খ্যাতি অর্জ্জন করেছেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়েছেন।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখকযুগল কি গুণে শরৎচন্দ্র লোকমতে এই বিশিষ্ট আসন গ্রহণ করেছেন, তারই সন্ধান দিতে চেষ্টা করেছেন। শরৎচন্দ্রের নভেলে তাঁর অঙ্কিত নারীমূর্ত্তিই বিশেষ করে পাঠকের চোখে পড়ে।

"চরিত্রহীন" নামক নভেলের কিরণময়ী হচ্ছে Vitamin। যদিচ কিরণময়ী হিন্দু-সমাজেরও আদর্শ নারী নয়, অপর কোন সমাজেরও নয়।

শরৎচন্দ্রের নভেলের নারীরা কোন কোন পাঠককে মুগ্ধ করে, আবার কোন কোন পাঠককে ক্ষুব্ধ করে। এই কারণেই বোধহয় এ পুস্তকের প্রথম খণ্ডে লেখকদ্বয় একমাত্র শরৎচন্দ্রের কল্পিত নারী-চরিত্রেরই বিচার করেছেন। নভেলে আরও অনেক বিষয় থাকে—যেমন বর্ণনা, বক্তৃতা প্রভৃতি; সে সব বিষয়ে আলোচনা তাঁরা মুলতবী রেখেছেন।

এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। এখন থেকে বিশ বৎসর পূর্ব্বে শরৎচন্দ্রের স্বরচিত সাহিত্যকে নানা আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল। শিক্ষিত সমাজের একদল লোক শরৎ-সাহিত্যের ঘোর

বিরোধী হয়ে ওঠেন। কারণ তাঁরা এ সাহিত্যকে অসামাজিক ও দুর্নীতিপরায়ণ জ্ঞানে ভীত হয়ে উঠেছিলেন।

আমি শরৎচন্দ্রের defence উকিল স্বরূপে একবার শিবপুর, আর একবার হাওড়ায়, তারপরে বৈদ্যবাটীতে উপস্থিত হই।

সে সব ক্ষেত্রে আমার বক্তব্য ছিল এই যে, মানবজাতির সামাজিক মনোভাব এবং সামাজিক নীতি এমন ঠুন্‌কো জিনিষ নয়, যা'কে স্পর্শ করলেই তা' ভেঙ্গে পড়ে। আর শরৎচন্দ্রও সামাজিক নিয়মভঙ্গের মিশনারি নন। এ ক্ষেত্রে একমাত্র বিচার্য্য হচ্ছে—শরৎচন্দ্রের কল্পিত উপন্যাসের কোনও শক্তি আছে কিনা? যদি থাকে, তাহ'লে তিনি যথার্থ কথাকার। আমি আর্ট কথাটি ব্যবহার করতে চাইনে, কেননা অসামাজিক চরিত্রসৃষ্টি মাত্র আর্ট নয়, সামাজিক চরিত্রসৃষ্টি মাত্রও আর্ট নয়; যদিচ এ উভয়ই আর্ট হতে পারে। লেখকদ্বয় শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ সম্বন্ধে অজ্ঞ নন, তাই তাঁরা লিখেছেন যে, "শরৎচন্দ্র কোন নীতির প্রশ্ন, কোনও আদর্শের কথা উত্থাপন করেন নাই। তিনি নারীর আন্তরশক্তির সহজ রূপ যেমন দেখিয়াছেন, তেমনি আঁকিয়াছেন"। কারণ "তিনি সমাজকর্ত্তা নন, নীতিজ্ঞ নন, অর্থ-শাস্ত্রবিৎ নন,—তিনি কবি, দ্রষ্টা ও শিল্পী"। অতএব শরৎচন্দ্রের রচিত কথাসাহিত্যের যদি কোনও বিশেষ মূল্য থাকে, তা সাহিত্য হিসাবে আছে;—লেখকদের এ কথা গ্রাহ্য।

আর এক কথা, লেখকদ্বয় সাহিত্যজগতে অপরিচিত হ'লেও, তাঁদের ভাষা অকৃত্রিম, সহজ ও স্বচ্ছ। সুতরাং যারা শরৎচন্দ্রের কথা-সাহিত্যের অনুরাগী—তাঁরা এ পুস্তক পড়ে' খুসী হবেন।

১ পাম প্লেস, বালিগঞ্জ
কলিকাতা।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সূচীপত্র

বড়দিদি	১
গৃহদাহ	২৫
বিন্দু	৬৭
নারায়ণী	৮১
হেমাঙ্গিনী	৯৭
গঙ্গামণি ও কুসুম	১০৫
পার্ব্বতী	১১১
চন্দ্রমুখী	১২৯
বিজলী	১৪১
কিরণময়ী ও সাবিত্রী	১৪৭

সাহিত্য-সম্রাট শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বড়দিদি

১৩১৪ সালে শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' সাহিত্যাকাশে ধূমকেতুর মত আবির্ভূত হইল। তিন কিস্তীতে 'ভারতী'তে 'বড়দিদি' প্রকাশিত হয়। ইহার আবির্ভাব সাহিত্যক্ষেত্রে সত্য সত্যই এক অভিনব বিস্ময়ের সৃষ্টি করিল, প্রশ্ন উঠিল, "কে এই শক্তিমান্ লেখক?" সাহিত্য-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথকে পর্য্যন্ত এই গল্পটির রচয়িতা বলিয়া অনেকে সন্দেহ করিয়াছিলেন। তৃতীয় কিস্তীতে যখন লেখকের নাম প্রকাশিত হইল, তখন শরৎচন্দ্র সুদূর ব্রহ্মদেশে। পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে তিনি আর বাঙ্গালাদেশে ফিরিয়া আসিলেন না। সাহিত্যজগতেও লেখকের আর কোনও খোঁজ পাওয়া গেল না।

অজ্ঞাতনামা লেখকের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথকে সন্দেহ করায় তিনি বলিয়াছিলেন, "লেখাটি সত্যিই ভারী চমৎকার। কিন্তু তবু আমার ব'লে স্বীকার করবার উপায় নেই, কারণ লেখাটি সত্যিই অন্য লোকের।"

'বড়দিদি'র পূর্ব্বেও শরৎচন্দ্রের প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত, স্বনামী বেনামী ছোট-খাটো অনেকগুলি লেখা পাওয়া যায়। কিন্তু 'বড়দিদি'ই প্রথমতঃ সাহিত্যক্ষেত্রে একটা অভিনব বিস্ময়ের সৃষ্টি করে,—লেখকের প্রতি সাহিত্যজগতের একটা সস্নেহ ও সশ্রদ্ধ দৃষ্টি পড়ে। তাই আমাদের সাহিত্য-সম্রাট্ শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ সমালোচনায় প্রথমেই 'বড়দিদি'র স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্নেহ-নির্ঝরের কথাই মনে পড়িতেছে। কারণ, অপরাধ যদি কিছু হয় 'বড়দিদি' তাহা নিজে স্নেহের আবরণে ঢাকিয়া লইবেন।

'বড়দিদি'কে আমরা প্রথমে দেখিতে পাই ষোল বৎসরে 'ভাদ্র মাসের ভরা গঙ্গার মত রূপ, স্নেহ, মমতা এবং স্বামীর শেষ আশীর্ব্বাদ,

'সৎ-পথে থাকিও—তোমার পুণ্যে তোমাকে পাইব', মাত্র সম্বল করিয়া তাহার মাতৃহীন পিতৃগৃহ স্নেহধারায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতে আসিল। বিপত্নীক পিতার স্নেহ ছায়ায় বাঙ্গালার বিধবা ষোড়শী মাধবী পিতৃগৃহে বড়দিদির আসন জুড়িয়া বসিল। যে স্নেহ এককালে একমুখী ছিল, আজ তাহা সেবায়, পরিচর্য্যায়, কারুণ্যে বহুমুখী হইল। "তাহার নিজের হৃদয়ে অনেক ফুল ফোটে, আগে সে-ফুলে মালা গাঁথিয়া সে স্বামীর গলায় পরাইয়া দিত। এখন স্বামী নাই, তাই বলিয়া ফুল-গাছটি সে কাটিয়া ফেলে নাই। এখনও তাহাতে তেমনি ফুল ফোটে, ভূমে লুটাইয়া পড়ে। এখন সে আর মালা গাঁথিতে যায় না সত্য, কিন্তু গুচ্ছ করিয়া অঞ্জলি ভরিয়া দীন-দুঃখীকে তাহা বিলাইয়া দেয়। যাহার নাই তাহাকেই দেয়, এতটুকু কার্পণ্য নাই··· ।"

সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে মাতৃহীন সুরেন্দ্র বিমাতার উগ্র স্নেহের আবেষ্টনে দিন দিন বাড়িতেছিল। এম, এ পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিলেও সে দেখিতে পাইল যে, আত্মনির্ভরতা সে একবারেই শেখে নাই। 'তাহার থুথু ফেলাটি পর্য্যন্ত' বিমাতার চোখ এড়াইতে পারিত না। নিজের উপর তাহার বিশ্বাসও জন্মিল না। 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বাইশ ঘণ্টাই' বিমাতার হেফাজতে তাহাকে থাকিতে হইত। প্রাণ তাহার ছট্‌ফট্‌ করিত। স্নেহের এই অধীনতা সে আর সহ্য করিতে পারিতেছিল না। বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শে এবং স্বাধীনতা ও শিক্ষার প্রলোভনে সুরেন্দ্রনাথ বিলাত যাত্রার সঙ্কল্প করিল। তাহার মত নিতান্ত আত্মনির্ভরশূন্য, যাহাকে ক্ষুধা পাইয়াছে কিনা তাহাও বলিয়া দিতে হয়, সে ছেলের বিলাত গমনের প্রস্তাব নিতান্ত হাস্যাস্পদ,—বিমাতা তাহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। বিমাতার হাসির স্রোতে যে তাহার

প্রস্তাবটি তৃণের মত ভাসিয়া গেল, তাহা সুরেন্দ্র বুঝিল এবং আর সে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া অধিকতর উপহাসাস্পদ হইতে চাহিল না। মনের দুঃখে ও দৃঢ় সঙ্কল্পে সে গৃহত্যাগ করিল,—লেখাপড়া ত কিছু শিখিয়াছে, যেমন করিযা হউক একটা স্বাধীন জীবিকা সে করিয়া লইবে। কিন্তু যে নিজেরটি নিজে বুঝিয়া চলিতে শেখে নাই,—ইচ্ছা করিলেই সে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে না। তাই দুইচারিদিন কলের জল ও দোকানের খাবারে ক্ষুন্নিবৃত্তি কবাইয়া লেখক সুরেন্দ্রকে কল্পতরু বডদিদির আশ্রয়ে পৌছাইয়া দিলেন। বড়দিদির সেবাব্রত, সকলের সঙ্গে এই নিরাশ্রয়, আত্মনির্ভরহীন, গো-বেচারা সুরেন্দ্রকেও আশ্রয় করিয়া বাড়িতে লাগিল। চিরনির্ভরশীল সুরেন্দ্রও নিজের ভার বড়দিদির হাতে সম্পূর্ণ ফেলিয়া দিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। এইরূপে স্নেহ-ফল্গুধারায় নির্ভরশীল সুরেন্দ্র মাধবীর অন্তর-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া স্থিতিলাভ করিল।

সুরেন্দ্রের 'বৃদ্ধের মত বৈরাগ্য, অথচ বালকের ন্যায় সরলতা, পাগলের মত উপেক্ষা', মাধবীর নিকট বড় রহস্যময় বলিয়া বোধ হইত। অজানিতে মাধবীর প্রেম সজাগ হইয়া উঠিল। সুরেন্দ্রের স্বভাব-উদাসীন ভাব তাহার আর ভাল লাগে না। সে চায় সুরেন্দ্রের প্রাণে তাহার নিজ অন্তরের গোপন স্পন্দনের সাড়া শুনিতে। যেমন উপলখণ্ডে বাধা পাইয়া নদীর খরস্রোত কল্লোলিয়া উঠে, তেমনি মাধবী সুরেন্দ্রের স্বতঃ উদাসীন স্নিগ্ধ জীবনে স্বীয় অভাবের বাধা সৃষ্টি করিয়া তাহার প্রাণকে সচেতন করিয়া তুলিতে চাহিল। তাহার স্নেহ-মন্দাকিনী ধারা নিরুদ্ধ করিয়া সে কাশী যাত্রা করিল। সুরেন্দ্রের প্রাণে মাধবীর প্রভাব সজাগ করিবার জন্যই লেখক মাধবীকে কাশী যাত্রা করাইলেন।

প্রেম পারস্পরিক। মাধবীর অন্তরে সুরেন্দ্রের জন্য যে স্থান প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, সুরেন্দ্রের চেতনাতেই সে আসনের ভিত্তি সুদৃঢ় হইবার একমাত্র সম্ভাবনা। সুরেন্দ্রের উপেক্ষাকে তাই আগ্রহে পরিণত করা আবশ্যক। শিল্প-চাতুর্য্যে লেখক সুরেন্দ্রের প্রাণে মাধবীর অভাবের ছায়াপাত করিয়া সুপ্ত দেবতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিলেন।

যাহার স্নেহে যত্নে নির্ভর করিয়া সুরেন্দ্র পরম আরামে দিন কাটাইয়া দিতেছিল, আজ তাহার 'অবর্ত্তমানে তাহার চলিতেছে না।' বড়দিদির প্রত্যাবর্ত্তন সে নীরবে প্রতীক্ষা করিতেছিল, এবং যখন প্রমীলা জিজ্ঞাসা করিল, "বড়দিদিকে আসতে লিখে দেব?" সে তাহাতে সাগ্রহে সম্মতি দিল। সুরেন্দ্রের উদাস ও উপেক্ষাপরায়ণ প্রাণে আত্মীয়তার স্পন্দন মিলিল। বড়দিদি ফিরিয়া আসিল। তাহার আগমন-বার্ত্তায় উদাসী সুরেন্দ্রের প্রাণে আজ এক অভিনব আনন্দের অনুরণন আসিল। সে সাগ্রহে অন্তঃপুরে প্রমীলার সঙ্গে ঠিক তাহারই মত শিশুর সারল্য লইয়া বড়দিদিকে দেখিতে গেল, এবং নিঃসঙ্কোচে ডাকিল, "বড়দিদি।"

মাধবীর চমক ভাঙ্গিল। ফিরিয়া আসিতে সুরেন্দ্র প্রমীলাকে দিয়া অনুরোধ করিয়াছে, প্রত্যাবর্ত্তনের পরেই অন্তঃপুরে তাহারই কক্ষের সম্মুখে সশরীরে সুরেন্দ্রনাথ তাহাকে চির-আত্মীয়তার সুরে নিঃসঙ্কোচে ডাকিল; শুধু তাই নয়, সুরেন্দ্র কহিতেছিল, "বড়দিদি, তোমার জন্য আমি বড় কষ্টে,—তুমি চলে গেলে—"। লজ্জা ও অপমানে মাধবীর অন্তর শত ধিক্কারে ছি ছি করিয়া উঠিল। জাগিয়া উঠিল তাহার প্রাণে শত শতাব্দীর সংস্কার, বংশমর্য্যাদার অভিমান, স্বামীর শেষ নির্দ্দেশ 'সৎপথে থাকিও—', ও স্মরণাতীত যুগ হইতে সামাজিক বৈধব্য ব্রতের

অনুশাসন। এই সকল অনুশাসন, মর্য্যাদাজ্ঞান ও সাংস্কারিক শিক্ষা রোষ-কষায়িত চক্ষে তাহার প্রতি শাসন দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তীব্র কষাঘাতে মাধবীর সহজ-প্রকৃতি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গেল। মনে শুধু জ্বলিয়া উঠিল অনুশাসনের তীব্র ধিক্কার সহস্র 'ছি ছি' লইয়া। লেখকের শিল্প-চাতুর্য্যে এতদিন অজ্ঞাতে যে প্রেমাঙ্কুর সহজে হৃদয়ে ধীরে ধীরে বাড়িতেছিল, আজ অনুশাসনের কঠিন আবেষ্টনে নবীন কোমল সেই বৃক্ষটি ক্ষণিকের জন্য মলিন হইয়া গেল। জীবনের সহজ ধারা ভয় ও শঙ্কায়, অনুশাসনের পায়ে মাথা নোয়াইল। বিন্দু দাসীর বক্রহাসি ইন্ধন যোগাইল। লজ্জা ও ঘৃণায় চাপা গলায় মাধবী 'মাষ্টারমহাশয়'কে বাহিরে যাইতে বলিল। সুরেন্দ্র ভাবিল, 'যেতে নেই,—না?' বিন্দুর মারফৎ সুরেন্দ্রকে মাধবী ভালরূপে বুঝাইয়া দিল যে, সুরেন্দ্র শুধু প্রমীলার শিক্ষকতা করিতেই ব্রজরাজবাবুর বাড়ীতে আছে, শুধু ইহাই তাহার অবলম্বন। সুরেন্দ্র বুঝিল, 'তাহার বড় ভুল হয়েছে।' এতদিন সে বড়দিদিকেই একমাত্র আশ্রয় মনে করিয়া আসিতেছিল। তাহা কি ভুল? যদি সত্যই তাহা ভুল হয়, তবে কোন অবলম্বনে সুরেন্দ্র আর এ বাড়ীতে থাকিবে? আশ্রয় খসিয়া গেল,—সুরেন্দ্র ধীরে ধীরে নিঃসম্বল, বড়দিদির দেওয়া চশমাজোড়াটি পর্য্যন্ত ফেলিয়া রাখিয়া, বাড়ী হইতে চলিয়া গেল।

সমাজ গড়িয়া উঠে ব্যক্তির সমষ্টি লইয়া। সামাজিক অনুশাসনও তাই সমষ্টির মঙ্গলাদর্শে অনুপ্রাণিত থাকে। ব্যক্তিগত মনঃসংঘাতে যে স্বতন্ত্র সামাজিক মন গড়িয়া উঠে, সেই বিশিষ্ট মনে ব্যক্তি তাহার নিজের মনের সাড়া পায়। তাই ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সমাজ শাসন মানিয়া চলে। যেখানে সামাজিক অনুশাসনে ব্যক্তির স্বেচ্ছা সম্মতি নাই,

সেইখানেই ব্যক্তির অভিব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সংঘর্ষ সুরু হয়। সমাজ ঐরূপ মনঃ সংঘাতের পরিণামে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু যতদিন সমাজে ঐরূপ স্বতঃ পরিবর্ত্তন না আসে ততদিন পর্য্যন্ত সংঘর্ষ সত্ত্বেও ব্যক্তিকে সমাজের শাসন মানিয়া চলিতে হয়। তৎকালীন সামাজিক অনুশাসন ব্যক্তিত্ব স্ফূরণের বিরোধী হইলেও লেখক সামাজিক অনুশাসন মানিয়া লইয়াছেন। শরৎচন্দ্রের শিল্পধারা তাই অতি সহজ ও সরল ভাবে সমাজের লৌহ কারাপ্রাচীরে বিকচোন্মুখ ব্যক্তিত্বের স্বতঃ সংঘাত দেখাইয়াছে। সমাজ বিধান বিধবার অন্তরে প্রেমের স্থান অস্বীকার করিয়াছে। কিন্তু নারীর প্রাণ স্বভাবতঃই প্রেমময়। সেই প্রেমের স্ফূরণ হয়ত সেবাধর্ম্ম পালনের ভিতর দিয়া হইতে পারে, কিন্তু যেখানে সে একবার তাহার প্রেমের ঠাকুরের সন্ধান পায়, নির্ব্বাধ গতিতে প্রাণ তাহার সেইদিকেই ছুটিয়া যায়। সমাজ যেখানে প্রাকৃতিক নিয়মের বাধাস্বরূপ দাঁড়ায়, সংঘাত সেখানে অবশ্যম্ভাবী। মাধবীর প্রাণের স্বতঃ উৎসে সামাজিক অনুশাসন ও আবেষ্টন যে বাঁধ সৃষ্টি করিল তাহা ক্ষণিকের তরে সেই উৎসের মুখকে অবরুদ্ধ করিলেও, অধিকক্ষণ টিকিল না। প্রাণ তাহার আবার সেই বিতাড়িত সুরেন্দ্রের চিন্তায় নিমগ্ন হইল। ‘কোথায় গেছেন’, ‘না খেয়েই চলে গেলেন’ ইত্যাদি চিন্তায় মাধবী আকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল। ফিরাইয়া আনিবার আশায়, চাকরদের পুরস্কার পর্য্যন্ত ঘোষণা করিল। জাগ্রত প্রাণের দেবতা সুরেন্দ্রের সংবাদ প্রতীক্ষায় সে আকুল-পথ চাহিয়া রহিল। সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে লেখক সুরেন্দ্রকে মাধবীর চোখের আড়াল করিলেন। কিন্তু সে অনুশাসন জাগ্রত প্রাণকে ধ্বংস করিতে পারিল না। মাধবীর সমস্ত প্রাণ জুড়িয়া সুরেন্দ্রনাথ বাস করিতে লাগিল। চক্ষুর অন্তরালে

সমাজ সুরেন্দ্রকে লইয়া গেলেও, মাধবীর প্রাণের অন্তরালে লইয়া যাইতে পারিল না। প্রাণ গাঢ়তম প্রেমাবেষ্টনে সুরেন্দ্রকে নিকটতম করিয়া লইল। মাধবীর সমাজ-মন যাহাকে মর্য্যাদার অভিমানে দূরে নির্ব্বাসিত করিল, তাহার স্বাধীন প্রাণ তাহাকেই হৃদয়ের শ্রেষ্ঠতম আসনে বসাইল। বৈধব্যের পর পিতৃগৃহে যাহাকে কেন্দ্র করিয়া মাধবী সেবার উৎস খুলিয়া দিয়াছিল, সংসারে এখন সুরেন্দ্রের অভাবে তাহার সেবার সেই অন্তঃসারিণী শক্তি আর সজীব রহিল না। 'মাধবীর চোখের কোণে কালি পড়িল, কাজকর্ম্মের তেমন বাঁধনি আর রহিল না'; এখন কাজ করিতে হয় তাই যন্ত্রচালিতের মত করিয়া যায়।

ব্রজবাবুর সংসারে যাইয়া সুরেন্দ্র আশ্রয় পাইয়াছিল মাধবীর স্নেহ-বীথিতলে। তাহার প্রাণ আপনা-আপনি মাধবীকে আত্মীয়ারূপে মানিয়া লইয়াছিল। কেন, তাহা সে জানিত না। তাহার প্রাণ বলিত মাধবী তাহার আপন। শত সুখদুঃখ অভাব অভিযোগ পূরণের দাবীস্থল একমাত্র মাধবী,—মাধবীর স্নেহ-নীড়েই সে বাসা বাঁধিয়াছিল। মাধবীর সমাজ-মন যখন বুঝাইয়া দিল যে, ব্রজবাবুর সংসারে সুরেন্দ্রের স্থান শুধু মাষ্টার হিসাবেই, অন্যস্থান নাই, তখন সুরেন্দ্রের বিশ্বাসে যেন মস্ত একটা আঘাত লাগিল। মনে করিল সে আশ্রয়হীন। ব্রজবাবুর গৃহ সে পরিত্যাগ করিল। কিন্তু জানে না কোথায় যাইবে। অন্য আশ্রয় তাহার নাই। থাকিলেও প্রাণ তাহা মানিয়া লইতেছিল না। তাহার অভিমান হইল বটে, কিন্তু সে অভিমান শুধু মনের বহিঃ-শক্তিতেই অবরুদ্ধ ছিল, প্রাণ স্পর্শ করে নাই। হাঁসপাতালে প্রথম জ্ঞানলাভের পর মুক্তপ্রাণ তাই প্রথমেই 'বড়দিদি' বলিয়া উঠিল। 'বড়দিদি' ডাকটি সুরেন্দ্রের নগ্ন প্রাণের স্বরূপ দেখাইয়া দেয়। কিন্তু

জ্ঞান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রাণ মানের আবরণে আবৃত হইল। বড়দিদি নাম আর সে মুখে আনিল না। সে পিতৃগৃহে ফিরিয়া গেল। নগ্ন প্রাণ আর সমাজ-মনের এই তীব্র দ্বন্দ্ব আবার লেখক ফুটাইয়া তুলিলেন তাঁহার তুলির অভিনব অঙ্কনে। মাধবী শুনিল, সুরেন্দ্র জ্ঞানলাভ করিয়া প্রথমেই তাহার নাম করিয়াছে,—ব্রজরাজবাবুও সুরেন্দ্রকে দেখিতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। মাধবী ইচ্ছা করিলেই যাইতে পারিত,—কিন্তু আবার সেই সমাজ-নির্দ্দেশ তীব্র কষাঘাতে মাধবীর দর্শনোন্মুখ মনকে শাসন করিল। মাধবী দেখিতে গেল না। সামাজিক বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হইল। একান্তে মিলনোন্মুখ দুইটী প্রাণ, দুইটি বহু দূর দেশে অবস্থান করিতে লাগিল।

যত রকম বন্ধনে প্রাণকে আবদ্ধ করা যায়, সুরেন্দ্রের তাহা সমস্তই হইল। সে এখন জমিদার। তাহার বিপুল বৈভব, পতিগতপ্রাণা সুন্দরী স্ত্রী শান্তি, ইয়ারবন্ধু ও বাগানবাড়ীর আমোদপ্রমোদ কিছুরই অভাব ছিল না, কিন্তু এত সত্ত্বেও তাহার প্রাণের শূন্যতা কিছুতেই পূর্ণ হইল না। সকল কাজই যেন অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়, কিছুতেই প্রাণের সাড়া পায় না। অন্তরের দিক দিয়া যেন সব আশা, সব তৃষ্ণা, আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ রহিয়া যায়। মাঝে মাঝে সুরেন্দ্র বুকে সেই গাড়ী চাপা পড়ার ব্যথা অনুভব করে, কিন্তু ব্যথা ত শুধু তাহার বুকে নয়, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে,—শুধু বড়দিদির অভাবে।

পিতার মৃত্যুর পর ভাইয়ের সংসারে স্বাভাবিক অধিকার ভ্রাতৃবধূর উপরেই বর্ত্তায়। মাধবী সামাজিক ব্যবস্থাই মানিয়া লইয়াছে, তাই অবিচলিত চিত্তে সংসারের কর্ত্রীত্ব ভ্রাতৃবধূর উপর অর্পণ করিয়া সমাজ তাহার জন্য ন্যায় ও ধর্ম্মতঃ যে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে, সেই শ্বশুরের

বাস্তুকেই একমাত্র আশ্রয়স্থল করিয়া লইতে কৃতসঙ্কল্প হইল। যে সমাজের অনুশাসনকে প্রাণের রক্ত নিঙাড়িয়া পালন করিতে মাধবী বদ্ধপরিকর হইল, সেই সমাজ কিন্তু চাটুয্যে মহাশয়ের গ্রাম্য কূট নীতিজালে সেই আশ্রয়টুকু মাধবীর নিকট হইতে ছিনাইয়া লইল। অধিকার বজায় রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতে গিয়া মাধবী জানিতে পারিল যে, বিচারপতি জমীদারের সম্মুখীন হইলে তাহার শেষ সম্বল নারীধর্ম্মও অনাহত থাকিবে না। জমিদারের বরকন্দাজ তাহাকে স্বামীব ভিটা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিল। সমাজ-শাসনকে মানিয়া চলিবার মর্ম্মান্তিক চেষ্টা এইরূপে মাধবীর একে একে সবই বিনষ্ট হইল। পিতৃবিয়োগের সহিত বাপের ভিটার স্বাভাবিক অধিকার ভ্রাতৃবধূতে উপজিল, স্বামীর ভিটার ন্যায্য অধিকার হইতে সামাজিক চক্রান্তে সে বঞ্চিত হইল। আপ্রাণ যে সমাজকে সে সেবা করিতে চাহিয়াছিল, সেই সমাজই তাহাকে একেবারে নিরাশ্রয় করিল। নৌকায় মাধবী নদীবক্ষে ভাসিল।

লেখকের সৃষ্টিকৌশলে, অদৃষ্টের ক্রূর পরিহাসে আজ সুরেন্দ্রই সেই চরিত্রহীন ও অত্যাচারী জমিদারের ভূমিকায় মাধবীকে স্বামীর বাস্তু হইতে বিতাড়িত করিবার কারণ হইল। এই দুষ্ট পরিহাস নায়েবের চক্রান্তে পাঠকের চক্ষে ফুটিয়া উঠিল। পাঠক দেখিল, একদিকে যখন তাহারই কর্ম্মচারী ও পাইকের হাতে তাহারই জমিদারী হইতে বিধবা শেষ আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইতেছিল, জমিদার সুরেন্দ্র ঠিক সেই সময়ে প্রাণের সকল পূজা অর্ঘ্য নিঃশেষ করিয়া অন্তরের একান্ত আরাধ্যা মাধবীর পূজায় রত। অদৃষ্টের এই নিদারুণ পরিহাস যখন অতি স্বাভাবিক কৌশলে জমিদারীর খাতাপত্র দেখিতে দেখিতে সুরেন্দ্রের

গোচরীভূত হইল, তখন যেন এক প্রচণ্ড কম্পনে সুরেন্দ্রের ধৈর্য্যের সকল বাঁধগুলি খসিয়া পড়িল। সহ্যের সীমা কোথায়? বেগবান অশ্বের ঝটিতি গতিতে সুরেন্দ্রের প্রাণ ছুটিয়া চলিল সেই দেবীর অনুসন্ধানে। গতির বিরাম নাই, প্রাণের সকল শক্তি সমাহিত করিয়া, সে একান্তে তাহারই অন্বেষণে ছুটিতে লাগিল। ক্ষিপ্রতর গতিতে আঘাতের পর আঘাত করিয়া যখন ইষ্টার সম্মুখে পৌঁছিল, তখন সমাজের সমস্ত প্রাচীর ও অনুশাসন দূরে ঠেলিয়া ফেলিয়া বড়দিদি, মাধবী মূর্ত্তিতে সুরেন্দ্রকে কোলে টানিয়া লইল। সংগ্রামে বিজয়ী বীর সুরেন্দ্র রক্তিম মহিমা মণ্ডিত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিল।

২

রচনা পাঠে প্রথমতঃই আমাদের মনে আসে এবং জিজ্ঞাসাও করি, —কেমন লাগিল। রচনাটি আমাদের মনে কি প্রভাব রাখিয়া গেল। পাশ্চাত্য সমালোচকগণ এই প্রভাবকেই effectiveness বলিয়াছেন। এই প্রভাবের রূপ ও ধারা অনুসারে রচনাকে আমরা ভাল বা মন্দ বলিয়া থাকি। ইহা হইল রচনাবিচারের প্রথম মাপকাঠি। রচনার বিষয়বস্তু যত সরল ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় তত আমাদের ভাল লাগে এবং লেখকেরও স্বাভাবিক ক্ষমতা প্রতিপন্ন করে। ইহা হইল দ্বিতীয় মাপকাঠি। তৃতীয়তঃ আমাদের দেখিতে হইবে, রচনাটির বিষয়বস্তু ও চরিত্রসকল স্বতঃ-সম্বদ্ধ (organic) কিনা। অর্থাৎ একই বীজ হইতে অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত পূর্ণাবয়ব বৃক্ষ, না ইহাতে পরগাছাও আছে? উল্লিখিত মাপকাঠিতে গল্পটি বিচার করিতে যাইয়া দেখিতে পাই যে, শরৎচন্দ্র বাঙালী হিন্দুসমাজের দৈনন্দিন অতি সাধারণ ঘটনা অবলম্বনে

বড়দিদি

'বড়দিদির' আখ্যান বস্তুটি 'পূর্ণাবয়বে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। বাঙালী সমাজের প্রাণহীন প্রতিষ্ঠান ও অনুশাসনের চিত্র লেখকের "পল্লীসমাজে" আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই। সমাজে সঞ্জীবনী শক্তি না থাকায় উহা শুধু অনুশাসনের মৃত কঙ্কালে পরিণত হইয়াছিল। ইহার আবেষ্টন আত্মিক অভ্যুদয়ের অনুকূল না হওয়ায়, ব্যক্তিত্ব ও অনুশাসনে যে নিত্য দ্বন্দ্ব চলিতেছিল, তাহা একরূপ সার্ব্বজনীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু লেখকের নিজেরই কথায় আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার অভিমত ছিল, 'সমাজ যাই হোক, তাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার কোন শক্তিই থাকে না।' সমাজের গলদ আছে বলিয়া তাহাকে ত্যাগ করা চলে না,—আত্মাহুতির মধ্য দিয়া তাহাকে অনুপ্রাণিত ও সংস্কৃত করিতে হইবে; কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত তাহা না করিতে পারা যায় ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে মানিয়া চলিতেই হইবে। 'বড়দিদি'তে তাই সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের ঘাতপ্রতিঘাত দেখিতে পাই। মাধবী বিধবা হইয়াছে বটে, কিন্তু মরিয়া যায় নাই। সে প্রাণবন্তা। প্রাণের বিকাশের অনুকূল আবেষ্টন একান্ত প্রয়োজন। লেখক প্রথমতঃ বিপত্নীক পিতৃগৃহে পিতার স্নেহছায়াতলে সেবা ও পালনের ভিতর দিয়া এই বিকাশ দেখাইয়াছেন। বিকাশোন্মুখ নারীর স্বভাব দেবতা 'প্রেমের ঠাকুর' সুরেন্দ্রের প্রতি সেবা ও করুণাস্পর্শে জাগিয়া উঠিল। সমাজকে ত্যাগ করা চলে না, তাহাকে মানিয়া চলিতেই হইবে, তাই জাগ্রত দেবতাকে কক্ষরুদ্ধ করিয়া মাধবী সমাজকেই মানিয়া চলিল, অবাধ্য হইল না। তাহার সংযম, সেবা, ধৈর্য্য, কর্ত্তব্য-জ্ঞান, সকলের মিশ্রণে করুণার এক অমর জ্যোতিঃতে মাধবীকে মণ্ডিত করিয়া লেখক সকলের স্নেহদৃষ্টি তাহার প্রতি আকর্ষণ

করিলেন। কাহিনীর প্রথমাংশে অতি গোপন দুর্ব্বলতার যে ছায়া বড়দিদিতে দেখা গিয়াছিল তাহা যেন সংযমের আগুনে পুড়িয়া কষিত কাঞ্চনের মত ভাস্বর হইয়া উঠিল। লেখক পাঠকের হৃদয়ে জাগাইয়া তুলিলেন এক অমর স্নেহ-সিঞ্চিত সহানুভূতি, অতি সরল, সহজ ও সুনিপুণ অঙ্কনে।

মাধবীর পরেই সুরেন্দ্রের কথা আমাদের মনে পড়ে। আখ্যায়িকাটি প্রথমতঃ মাধবী ও দ্বিতীয়তঃ সুরেন্দ্রকে লইয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে। গল্পারম্ভের প্রথম হইতে তৃতীয় অধ্যায়ের মধ্যে আমরা নায়ক নায়িকার এবং তাহাদের আবেষ্টনের একটি সাধারণ পরিচয় পাই। আখ্যায়িকার মূল বস্তুটির স্বরূপও প্রথম কয় অধ্যায়ে পাঠকের নিকট উন্মোচিত হইয়াছে। সুরেন্দ্র বাঙালীর ঘরের ভাল ছেলে,—শান্তশিষ্ট, বিদ্বান, কিন্তু পুরুষোচিত আত্মনির্ভরশীল নয়। পুরুষের এই দুর্ব্বলতার প্রায়শ্চিত্ত তাহাকে করিতে হইবে। আত্মনির্ভরহীন পুরুষ, ঘৃণার পাত্র না হইলেও, করুণার পাত্র সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই গুণ ও দুর্ব্বলতাযুক্ত মানুষটিকেই তাই সূক্ষ্মদৃষ্টিসম্পন্ন শরৎচন্দ্র নায়কত্বে বরণ করিলেন। সৃষ্টি-নৈপুণ্যে Aristotleএর নিয়মাবলী আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, দুঃখান্ত আখ্যায়িকার নায়ক আমাদেরই মত দোষগুণযুক্ত মানুষ হইবে, কারণ তিনি যদি নির্দ্দোষ হন, তাহা হইলে দেবচরিত্র, দোষহীনকে দুঃখে নিপতিত করায় অস্বাভাবিক-ভাবে পাঠকের মনে ক্লেশের সঞ্চার করা হয়। অপরপক্ষে নায়ক নিতান্ত গুণহীন, দুর্ব্বৃত্ত ও দুরাচারী হইলেও চলিবে না, কারণ এইরূপ লোক শাস্তি ও দুঃখ পাইলে পাঠকের মনে করুণার সঞ্চার হয় না। বিশিষ্ট ভালমানুষ কোন ভুল বা দুর্ব্বলতার জন্য যে শাস্তি বা দুঃখ

ভোগ করে তাহার স্ফূরণেই পাঠকের সহানুভূতি লেখক নায়কের উপর সম্পূর্ণরূপে জাগাইয়া তুলিতে পারেন। Aristotle আরও বলিয়াছেন যে, দুঃখান্ত আখ্যায়িকার নায়কের চরিত্র স্বতঃস্ফূর্ত্ত হইতে হইলে তাহার গুণাধিক্যের মধ্য দিয়া সামান্য দোষ ত্রুটির জন্য যে শাস্তি বিধান করা হয়, তাহাতে তাহার প্রতি করুণা ও সমবেদনা আকর্ষণ করা যায়। পাঠকের সমবেদনার উপর নির্ভর করিয়াই দুঃখান্ত আখ্যায়িকার সাফল্য গড়িয়া উঠে। আখ্যায়িকার সমস্ত ধারাই একই চরিত্রের দোষ ও গুণরাশির মধ্য দিয়া বিকশিত হয়।

স্বাচ্ছন্দ্যে প্রতিপালিত সুরেন্দ্রের শিশুর মত সারল্য, বিদ্যানুরাগ, নিষ্কলঙ্ক স্বভাব প্রথমেই আমাদের মনে তাহার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি জাগাইয়া তোলে। বিমাতার অস্বাভাবিক স্নেহাতিশয্যে সে আত্মনির্ভরতা শিখে নাই, ইহাই হইল তাহার দুর্ব্বলতা। তাহার স্বচ্ছ-গুণমুগ্ধ পাঠকগণ তাই বিমাতার স্নেহকেও ভাল চক্ষে দেখিতে পারেন নাই,—পাঠকের সহানুভূতি সম্পূর্ণ বজায় রাখিতে লেখক তাই সুরেন্দ্রকে অস্বাভাবিক স্নেহপাশ মুক্ত করিলেন। সুরেন্দ্রের আত্মনির্ভরতা শিখিবার প্রচেষ্টায়, পাঠকের মনে তাহার প্রতি সহানুভূতি আরও বাড়িয়া উঠিল। শৈশবে ও কৈশোরে যে আত্মনির্ভরতা শিখে নাই, এখন তাহার সে চেষ্টা বিফল হইবেই,—আর শিখিবার অবসরই বা কোথায়, বিদ্যানুরাগইত তাহার সমস্ত মন জুড়িয়া রহিয়াছে,—অন্য চিন্তা বা শিক্ষা করিবার সময় তাহার নাই। আত্মনির্ভরতা লাভ করিতে গিয়া, স্বীয় চরিত্রের স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায় সে আপনাকে নির্ব্বিশেষে মাধবীর সেবাপরায়ণ হাতে বিলাইয়া দিল। অজ্ঞাতে, এই দুর্ব্বলতার ভিতর দিয়া মাধবীর সমস্ত প্রাণখানি সে দখল করিয়া বসিল।

আত্ম-নির্ভরশূন্য হইলেও সুরেন্দ্র আত্মসম্মান জ্ঞান শূন্য নয়,—কাশী হইতে ফিরিয়া আসিবার পর মাধবী যখন তাহার প্রাণের সহজ ও সরল ভক্তি নিবেদনে ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে স্বীয় কর্ত্তব্যের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিল, সুরেন্দ্রের আত্মসম্মান সে অনুজ্ঞা মানিয়া লইতে পারিল না। মাধবীর সামাজিক-মন সুরেন্দ্রকে যে পথ দেখাইয়া-দিল, সুরেন্দ্রের আত্মমর্য্যাদা সেই নির্দ্দেশের বিদ্রোহী হইল। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মাধবীকে সে গভীর শ্রদ্ধাভরে পূজা করিল, কিন্তু তাহার সামনে আর আসিল না। সম্মানবোধ ও আত্মসংযমের প্রকটতা পাঠকের মনে উত্তরোত্তর সমবেদনা বাড়াইতেছিল—যেন পাঠকেরা সুরেন্দ্রের প্রাণের সব দুঃখ, জ্বালা, নিজ নিজ প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন।

তাই দেখা যাইতেছে যে, শরৎচন্দ্র সমাজের দৈনন্দিন চিরসত্য ও সাধারণ ঘটনা অবলম্বনে অতি সহজ ও সুষ্ঠুভাবে কাহিনীর স্বাভাবিক স্ফূরণ দেখাইয়াছেন। বাঙালীর সমাজে যেন এইরূপ ঘটনা প্রত্যেকেই দেখিয়া থাকেন,—বিষয় বস্তুটি যেন সকলেরই চিরপরিচিত ও পুরাতন। সার্ব্বজনীন প্রাণের নিগূঢ় কথা শরৎচন্দ্রের লেখনীতে ফুটিয়া উঠায় পাঠক সমাজ 'বড়দিদি' প্রকাশের পরে অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, 'কে এই শক্তিশালী লেখক?'

৩

শিল্প-চাতুর্য্যের সৌন্দর্য্য বিচার করিতে গেলে শুধু নায়ক নায়িকার চরিত্র বিশ্লেষণেই সমালোচনা সীমাবদ্ধ রাখা যায় না। পুষ্পোদ্যানের ব্যাপক সৌন্দর্য্য যেমন পুষ্প-বীথির শোভা বৃদ্ধি করে, পুষ্পের একক সৌন্দর্য্য তেমন করে না। প্রধান চরিত্রটী সুবিকশিত করিবার জন্য

ক্ষুদ্র চরিত্রের কার্য্য ও চিন্তা সংঘাত, পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথাও বিবেচনা করিতে হয়।

পাশ্চাত্য সমালোচক Quiller—Couch বলিয়াছেন যে, কোন রচনা বিচারের প্রথমেই দেখিতে হইবে যে, রচনার বিষয় সমূহ একত্র মিলিত হইয়া রচনাটিকে একটি বিশিষ্ট পূর্ণাবয়ব শিল্পে পরিণত করে কি না। পূর্ণাঙ্গ সম্পাদনায় আখ্যায়িকার গতি, ভাব ও কর্ম্ম-ধারার সন্নিপাত, চরিত্র সমূহের পরস্পর আকর্ষণ বিকর্ষণশক্তি-বস্ত্র বয়নের 'টানা পোড়েনে'র মত সমধারা হওয়া চাই। আখ্যায়িকাটির অভিব্যক্তি ও পরিবর্দ্ধন যে সরল ও স্বাভাবিক হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। উপস্থিত দেখিতে হইবে যে, আখ্যানভাগটিতে অপরাপর চরিত্র সমূহের সন্নিবেশ যথাযথ হইয়াছে কিনা, এবং যে বিশিষ্ট সামাজিক ও সাংসারিক আবেষ্টনে প্রধান চরিত্রদ্বয় পরিপালিত ও বর্দ্ধিত, তাহা অনুরূপ চরিত্র বিকাশের ও পরিণতির কতদূর সহায়ক হইয়াছে।

মাধবীর পিতা ব্রজরাজ লাহিড়ী পূর্ব্ববঙ্গের জমিদার। তাঁহার চরিত্র আলোচনায় প্রথমেই মনে হয়, মাধবী সেবা সংকার গুণটি পিতার নিকট জন্মগত সূত্রে পাইয়াছিল। পালনব্রতে ও আতিথ্যে ব্রজরাজ-বাবুর এতটুকু কার্পণ্য ছিল না। প্রথম সাক্ষাতেই সুরেন্দ্রের অভাবের কথা তিনি মনে মনে বুঝিয়া লইয়া তাহাকে আশ্রয় দিলেন। সুরেন্দ্রের আশ্রয় ভিক্ষা করিতে হইল না। ব্রজরাজবাবুর যে বংশগত অভিজাত সংস্কৃতি ছিল তাহাই মাধবীকে অত বড় হৃদয়বতী করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার দয়া দাক্ষিণ্যের সীমা ছিল না। সুরেন্দ্রের চলিয়া যাওয়ায় মাধবীর মত ব্রজরাজবাবুরও দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। মাধবীর উপর

সংসারের সকল ভার অর্পণ করিয়া, তাহাকে সেবা ও দুঃখীর প্রতি সমবেদনার সুযোগ দিয়া ব্রজবাবুর বিধবা কন্যার অশ্রুর ভার লাঘব, করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি নিজে বিপত্নীক হইয়াও আর বিবাহ করেন নাই,—পিতার স্নেহ-প্রাবল্যে পুত্র ও কন্যার মাতার অভাব মিটাইয়াছিলেন। এমন দরদী আবহাওয়াতেই, মাধবীর স্নেহপরায়ণা. মূর্ত্তি বিকাশের আনুকূল্যের সৃষ্টি করিয়াছেন শরৎচন্দ্র। তৎকালীন সামাজিক সঙ্কীর্ণতা ব্রজবাবুর সংসারে প্রবেশ করে নাই। তাঁহার উদার নৈতিক বনীয়াদি আবহাওয়া মাধবীর ঔদার্য্য বিকাশের সহায়তা করিয়াছিল। জামাতা নির্ব্বাচনেও ব্রজরাজবাবু সেই সংস্কৃত-রুচিরই পরিচয় দিয়াছিলেন,—ছেলেটির বিষয়-আশয় আছে কিনা খোঁজ লন নাই, শুধু দেখিয়াছিলেন, ছেলেটি লেখাপড়া করিতেছে, রূপবান্, সৎ ও সাধুচরিত্র।

সুরেন্দ্রনাথ বাঙলা সমাজের বাহিরে পশ্চিমের কোন প্রসিদ্ধ উকিলের পুত্র। পল্লীসমাজের সঙ্কীর্ণতা তাহার হৃদয়েও প্রবেশ করিবার সুযোগ পায় নাই। সমাজ-নীতির সহিত মাধবীর মত তাহারও পূর্ব্বে পরিচয় হয় নাই। তাহার বিলাত যাত্রার পথে সমাজ কি জাতিধর্ম্মের হিসাবে তাহার পিতা অন্তরায় হন নাই। সুরেন্দ্রনাথ সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর বাহিরে শিক্ষা ও উদারনৈতিক আবহাওয়ায় প্রতিপালিত। কিন্তু মাধবী ও সুরেন্দ্রনাথ বাঙলাদেশের সন্তান, তাই যেন স্বাভাবিক নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই, মাধবীকে পিতৃগৃহ ছাড়িয়া গ্রামে শ্বশুরের ভিটায় বাঙলা সমাজের আশ্রয়ে আসিতে হইল, এবং সুরেন্দ্রনাথও পশ্চিমের সহিত সম্পর্ক মিটাইয়া পল্লী জমীদার দাদা-মহাশয়ের জমিদারী ভোগ করিতে আসিল। সমাজ, জীবন বিকাশের

প্রধান সহায়ক, তাহার আবেষ্টন ও প্রেরণা ভিন্ন জীবনের পরিণতি হয় না। চরিত্র দুইটি যদি শিশুকাল হইতে সমাজের কোলে প্রতি-পালিত হইত, তাহা হইলে তাহাদের জীবনে এই সংঘাতের কল্পনা কখনও আসিতে পারিত কিনা সন্দেহ। তাহারাও সমাজের প্রাণহীন পঞ্জরের মত হয়ত আর একজন বিন্দু ঝি কিম্বা চাটুয্যে মহাশয় অথবা নায়েবের মত হইত। কেন না, প্রাণহীনের সহিত প্রাণহীনের কোন সংঘাত হইবার সম্ভাবনা নাই। সংঘাত সংঘটিত হয় জীবন্তের সহিত জীবন্তের, কিম্বা প্রাণহীনের সহিত প্রাণবন্তের। সমাজের বাহিরে বর্দ্ধিত দুইটি প্রাণবন্ত চরিত্রের অবিচ্ছিন্ন গতিধারা স্বাভাবিক স্রোতে ছুটিয়া তাই সমাজের প্রাণহীন লৌহ-দেউলে সজোরে আঘাত করিল। উদার ছন্দময়ী ও সাবলীল সেই স্রোতধারা সমাজের জীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ দেউলে আঘাত পাইয়া আহত হইল, কিন্তু প্রাণবন্তের মরণান্তিক আঘাতের বেগ জীর্ণ প্রাচীর সহ্য করিতে পারিল না,—তাহাও ভাঙ্গিয়া পড়িল। আখ্যায়িকা শেষে সমাজকর্ত্তা ব্রাহ্মণ ও জমিদারের প্রতি পাঠকের তীব্র বিতৃষ্ণা জাগিয়া উঠিল।

চাটুয্যে মহাশয় ও নায়েবের চরিত্রে মাত্র দুই চারিটি শক্তিশালী তুলিকাঙ্কনে লেখক তখনকার সমাজের ও তাহার আশ্রিত হিন্দু বিধবাদের দুঃস্থ অবস্থা সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। সমাজের দুইটি প্রধান শাসনকর্ত্তা—জমীদার ও ব্রাহ্মণ—নায়েব ও চাটুয্যে মহাশয়ের ক্ষুদ্র চরিত্রে ভাস্বর করিয়া তুলিয়াছেন। চরিত্রবান্, শিক্ষিত ও উদার সুরেন্দ্রনাথের আত্মনির্ভরশূন্যতা অবলম্বন করিয়া নায়েব তাহাকে অত্যাচারী, ব্যভিচারী ও হৃদয়হীনের অভিনয় করাইলেন। তাহারই হৃদয়ের উপাস্যা দেবী অজানিতে তাহারই হাতে নিরাশ্রয়ে বহিস্কৃতা!

মাধবীরও শ্বশুরের বন্ধু সমাজকর্ত্তা ব্রাহ্মণ, চাটুয্যে মহাশয়, শুভানুধ্যায়ীর ভূমিকায় কুচক্রান্তে, ও নায়েবের কূটনীতির আশ্রয়ে তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিল।

এই দুইটি চরিত্র অঙ্কনের পরে, সামাজিক অবস্থা স্ফূটতর করিয়া তুলিবার জন্য আর তুলিকাক্ষেপের বোধ হয় প্রয়োজন ছিল না। 'বড়দিদি' আখ্যায়িকাটির মূল বিষয়বস্তুর স্বাভাবিক পরিস্ফূরণ ও পরিণতিতে যে মানসিক ও বাহ্যিক আবেষ্টন ও অন্যান্য চরিত্র কল্পনার আবশ্যক ছিল তাহা যেন পূর্ব্বোক্ত উপাদান সমূহে শেষ হইল বলিয়া মনে হয়। সারাল জমিতে যে বীজরোপন করা হয়—উপযুক্ত আলো বাতাসে সে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া পূর্ণাবয়ব বৃক্ষে পরিণত হয়। সমানুপাতিক আলো ও বাতাস বৃক্ষের পরিবর্দ্ধনের সহায়ক। উহার পরিমাণ কম বা বেশি হইলেও সুফল হয় না। অত্যধিক রৌদ্র বা বৃষ্টি পুষ্টির অনুকূল না হইয়া বরং প্রতিকূল হয়। চিত্রশিল্পেও শিল্পীর ভাব প্রকাশের জন্য যে স্থানে যতটুকু রেখাঙ্কন বা তুলিকাপাত আবশ্যক ঠিক ততটুকুর অতিরিক্ত রং ও তুলিকাক্ষেপ শিল্পীর কাঁচা হাতের প্রমাণ দেয়। চিত্রশিল্পে রেখাঙ্কন প্রভৃতির দ্বারায় যে কল্পনা ও ভাব ফুটাইয়া তোলা হয়, রচনাশিল্পে চরিত্র অবলম্বনে তাহাই সম্পাদিত হয়। মূল কল্পনার অভিব্যক্তি, প্রধান চরিত্রে ফুটাইয়া তুলিতে ইতরেতর চরিত্রের যতটুকু প্রয়োজন হয়, কেবল ততটুকু মাত্র চরিত্র অঙ্কনে শেষ করা রচনা কৌশল ও প্রতিভার পরিচায়ক। দেখা যাউক যে 'বড়দিদি'তে শরৎচন্দ্র যে মনোরমা ও তাহার স্বামীর চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তাহার কতদূর প্রয়োজন ছিল। মনোরমাকে মাধবীর বন্ধু হিসাবে আখ্যায়িকাটিতে উল্লেখ করা হইয়াছে। যতদূর দেখা যায় মাধবীর

অন্তরের গোপন কথার সহিত পাঠকবর্গকে পরিচিত করানই হয়ত লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। 'তিনি যদি না বাঁচতেন, বোধ হয় পাগল হ'য়ে যেতাম', কথাটিতে আমরা মাধবীর মনের পরিচয় পাই সন্দেহ নাই। কিন্তু ও কথা না শুনিয়াও কি আমরা মাধবীর অন্তরের কথা সম্পূর্ণ বুঝিতে পরি না? বরং ঐ কথাটি মনোরমার মুখে না শুনিলে হয়ত কল্পনার সাহায্যে উহা আরও মনোহর হইয়া আমাদের প্রাণে ভাসিয়া উঠিত। যেরূপ সরল নির্ভরে ও বন্ধুত্বের সহজ বিশ্বাসে মাধবী মনোরমার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিল, মনোরমার হৃদয়ে সেই বিশ্বাস ও নির্ভর আনুপাতিক স্নেহ ও সহানুভূতি জাগাইল না। সধবার অধিকারের গণ্ডীতে বিধবা মাধবীর প্রবেশাধিকার মনোরমা দিতে চাহিল না। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, মাধবীর অন্তরের কথা স্পষ্টতর করিয়া শুনাইবার জন্য মনোরমার সৃষ্টি হয় নাই। কেবল সমাজে এবং প্রেমের রাজ্যে যে বিধবার কোনই স্থান নাই তাহাই আরও বিশেষ করিয়া দেখাইবার জন্যই মনোরমা ও তাহার স্বামীর চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাও অত্যুক্তি বলিয়া মনে হয়। কারণ রচনার প্রতি স্তর উন্মোচনে অতি স্বাভাবিক ভাবে ইহাই মাত্র দেখান হইয়াছে যে, বিধবার বাঁচিবার অধিকার নাই,—যদি তাহাকে বাঁচিতে হয় সে শুধু জীবন্মৃত অবস্থায়। তাহার জীবনবৃক্ষে ফুল কখনও ফুটিবে না, রসাহার বঞ্চিত হইয়া উহা তিলে তিলে শুকাইয়াই মরিবে। জগতে সর্ব্বত্রই নারীকে রক্ষণশীলারূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সে পুরাতনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়, কেননা তাহা সুপরিচিত; নূতনকে সে কখনই সহজে আশ্রয় দিতে চায় না। তাই বোধ হয় শিল্পীর লেখনীতে বন্ধুর প্রতি সহানুভূতির প্রভাবে সমাজ

সংস্কারকে মনোরমা দূরে ঠেলিয়া ফেলিতে পারে নাই। সমাজ যে অধিকার শুধু সধবাকেই দিয়া আসিয়াছে, সেই অধিকারে বিধবা মাধবীর ছায়া পড়িতে দেখিয়া মনোরমার নারী-মন বিদ্রোহী হইল। ,সে মাধবীকে দোষ দিল না, বলিল, "সমস্ত স্ত্রীজাতিকেই দোষ দিই।" কারণ নারীর হৃদয় কোমলতা এবং সহজ ও তরল ভালবাসা দিয়াই গঠিত। বৈধব্যের সহিত সে হৃদয়ের পরিবর্ত্তন হয় না। অতএব দোষ জাতিগত, মাধবীর নয়।

পুরুষ কিন্তু স্বভাবতঃ উদারপন্থী। প্রাচীন সংস্কারের অধীন হইয়াও সে নূতনের মধ্যে যে সহজ ও সরল সত্যটুকু চিনিতে পারে তাহাকে গ্রহণ করিতে চায়। নূতন তাহার অভিনব মোহে স্বভাবতঃ পুরুষের মন মুগ্ধ করে। সে চায় নূতনের বিশ্লেষণে তাহার আভ্যন্তর অপরিচিতের সহিত পরিচিত হইতে। মনোরমার স্বামী বলিল, "যাহার হৃদয়ে ভালবাসা আছে···সে ভালবাসিবেই, মাধবীলতা রসালবৃক্ষ অবলম্বন করে" ইহাই জগতের নীতি। মনোরমা ইহা অস্বীকার করিতে পারিল না। কিন্তু ইহার জন্য পুরাতনকে ছাড়িতেও চাহিল না। 'মাধবী পোড়ারমুখী, বিধবাকে যাহা করিতে নাই, সে তাহাই করিয়াছে—অন্যকে ভালবাসিয়াছে।' বিধবা মাধবীকে ভালবাসার জন্য দোষারোপ করিতে গিয়া সে বুঝিতে পারিল যে, সমস্ত নারীজীবনই ভালবাসার কোমল বৃত্তিতে গঠিত। সে ভালবাসিবেই, লতা বৃক্ষকে আশ্রয় করিবেই, হয়ত অনেক দূর গড়াইয়া গিয়াও। এবং বৃক্ষাশ্রিত লতা, ফল পুষ্প শোভিত হইবেই,—কারণ সে তাহার স্বভাব। ভালবাসার দোষ কেবল মাধবীর নয়, সমস্ত নারীজাতির স্বভাবগত দোষ। স্বাভাবিক নিয়ম ও স্বভাবের প্রেরণাতে সে চির অপ্রতিহত গতি থাকে। তাহাতে

বড়দিদি

অনুশাসন, সংস্কার প্রভৃতি যত রকম বাধারই পরিকল্পনা করা যাক না কেন, স্বাভাবিক শক্তিতে সকলই ব্যর্থ হইয়া যায়। শিক্ষা ও সংস্কার এই স্বভাব-গতিকেই আশ্রয় করিয়া গড়িয়া উঠে। ইহাই সব সমাজের চিরন্তন পদ্ধতি। যেখানে সংস্কার, শিক্ষা এই গতির অনুবর্ত্তী হয় নাই, সেখানেই সংঘাতের সৃষ্টি হইয়াছে এবং সর্ব্বত্রই শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়াছে। 'বড়দিদি' আখ্যায়িকাটি এইরূপ একটি সংঘাতের স্বতঃস্ফূরণের উপর পরিকল্পিত। নারীর জীবন স্নেহ ও ভালবাসাময়, পালন তাহার ধর্ম্ম। সমাজ-অনুশাসন এই স্বভাবধর্ম্মের প্রতিকূল ও বিরোধী হওয়ায় সংঘাতের সৃষ্টি হইল ও আখ্যায়িকাটি দুঃখান্ত হইল।

* *
*

গৃহদাহ

জীবনের অন্তঃসারিণী শক্তি মানবের চিন্তা, ভাব ও কর্ম্মধারায় প্রকাশিত হয়। শিল্পীর চক্ষে সেই শক্তি তাহার সৃষ্টির রসধারায় নব নব রূপ ও সৌন্দর্য্য লইয়া ফুটিয়া ওঠে। বিশ্বমানবের এই জীবনী-শক্তি যখন শিল্পীর রসধারায় সিঞ্চিত হইয়া নিত্য নবতর রূপ লইয়া আত্ম-প্রকাশ করে, তখন তাহার বিচিত্র সৌন্দর্য্য আমাদের মনে এক অভিনব আনন্দের সৃষ্টি করে। শিল্পীর যে অঙ্কন আমাদের মনে যত বেশি আনন্দ উৎসারিত করিতে পারে তাহার মূল্যও তত অধিক! এই প্রচ্ছন্ন আনন্দধারাকে আমরা সাহিত্যরস বলি। পাশ্চাত্য ঋষি Emerson বলিয়াছেন, "সাহিত্য মানব জীবনের প্রকৃষ্ট চিন্তাধারার লিপিবদ্ধ ইতিহাস।"* মানুষের দৈনন্দিন সকল চিন্তাধারায় আনন্দের সৃষ্টি করে না। যাহাতে সৃষ্টি রসের আস্বাদ নাই তাহা সাহিত্য নয়। অতএব সাহিত্যের স্বরূপ বুঝিতে হইলে জীবনীশক্তির যে ধারা বিশ্বচিত্তে আনন্দের হিল্লোল তোলে, তাহারও একটা ধারণা করিয়া লইতে হইবে।

মনীষী Arnold বলিয়াছেন যে, মানবজীবন ভাল মন্দ প্রবৃত্তি-গুলির একটি অবিরত দ্বন্দ্ব। ইহাতে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলি নিকৃষ্ট ও হীন-বল বৃত্তিগুলিকে ধ্বংস করিয়া সামাজিক মনের প্রতিষ্ঠা করে। অনাদি যুগ হইতে এই সত্য সংস্কৃতি ও কৃষ্টির রূপ লইয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া আসিতেছে। আবার ব্যক্তিগত মনও পরস্পরের সহিত এবং সামাজিক মনের সহিত প্রতিনিয়ত এইরূপ দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত থাকে। চিরন্তন দ্বন্দ্বের ফলে ব্যক্তির এবং সমাজের যেখানে যতটুকু গলদ থাকে তাহা

* Literature is a record of best thoughts.

নষ্ট হইয়া যায়, এবং হীনকে উন্নত ও উন্নতকে উন্নততর করিয়া তোলে। প্রকৃতির এই শাশ্বত নিয়মে ব্যক্তি ও সমাজ চির প্রগতিশীল হইয়া আসিতেছে।*

প্রতিভাশালী শিল্পী, মানবজীবনের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের ঘাত-প্রতিঘাতে যে জীবন সমস্যার উদ্ভব হয় তাহার স্বাভাবিক গতি ও পরিণতির উপর তাহার শিল্প-সৌধ গড়িয়া তোলেন। তাঁহার যে শিল্পে আমাদের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক রূপ ফুটিয়া উঠিতে দেখি, তাহাতে আমরা আন্তরিক সত্যের সন্ধান পাইয়া আকৃষ্ট হই। অজ্ঞাত এই আকর্ষণ আমাদের মনে এক অভিনব আনন্দের সৃষ্টি করে এবং সাহিত্য তাহার রসধারার মধ্য দিয়া এই চির সত্যের রসামৃত পরিবেশন করে। বৈজ্ঞানিক যাহা বিশ্লেষণ দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করেন, দার্শনিক যাহা যুক্তির দ্বারা বুঝাইতে চান, সাহিত্যিক তাহা ভাবাপ্লুত করিয়া প্রকাশ করেন। প্রতিভাবান্ সাহিত্যিকের চক্ষে জীবন দ্বন্দ্বের স্বরূপ আপনি ধরা পড়ে। তিনি দেখেন যে ব্যক্তির চরিত্রশক্তি স্বাভাবিক পরিণতিতে পৌঁছাইবার পূর্ব্বে অনেক বিরোধী শক্তির সংঘাতে প্রতিহত হয়, কিন্তু অন্তর্নিহিত চরিত্র শক্তি ঔৎকর্ষ্যে সেই সকল বিরোধী শক্তিকে পরাভূত করিয়া, আবেষ্টনকে আত্মশক্তিতে অনুপ্রাণিত ও অনুকূল করিয়া তোলে। দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক পরিণতিতে কথাসাহিত্য সুখান্ত বা দুঃখান্ত হয়। চরিত্র মাধুর্য্য যত প্রতিভাত হয় এবং দ্বন্দ্বের পরিণাম যত স্বাভাবিক হয়, পাঠকের মনও শিল্পের প্রতি তত আকৃষ্ট হয়। প্রকৃত কথা-শিল্পীর স্বাভাবিক শিল্পচাতুর্য্য এই সূত্র অবলম্বনে প্রস্ফুটিত হয়। ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র এই কথাই

* Stopford A. Brooke

রূপান্তরিত করিয়া বলিয়াছেন, "সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়ম হইতে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়।...তেমনি সাহিত্যেও দেশ ভেদে, দেশের অবস্থা ভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়।"*

শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' পড়িয়া মনে হয় যে গুটিকয়েক বিশিষ্ট বিশিষ্ট চরিত্র অবলম্বনে তিনি ঐরূপে আখ্যায়িকাটি অতি সহজ ও সরল ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন। বিভিন্ন আবেষ্টন ও শিক্ষায় বর্দ্ধিত ভিন্ন-ধর্ম্মী চরিত্রগুলির স্বাভাবিক শক্তি প্রকাশে, স্বাভাবিক নিয়মেরই বশবর্ত্তী হইয়া যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হইয়াছে তাহারই সহজ পরিণতিতে চরিত্র সমূহের দুর্ব্বলতা সকল অতি সহজে পরাভূত হইয়া উৎকৃষ্ট শক্তির প্রতিষ্ঠাতে আখ্যায়িকাটির পরিসমাপ্তি হইয়াছে।

গল্পটিতে অচলাকে মুখ্য চরিত্র রূপে গ্রহণ করিয়া তাহার সম্যক্ বিকাশে অন্যান্য চরিত্রের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। নায়িকার চরিত্র অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তি এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংস্পর্শে আসাতে যে সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, লেখক তাহার সমাধান ও স্বাভাবিক পরিণতি দেখাইয়াছেন। একটি জীবন-যাত্রার পথে কি কি সম্বল অপরিহার্য্য এবং নিঃসম্বল যাত্রায় কি কি বাধা ও বিপত্তি আসিতে পারে ও তাহার কি অবশ্যম্ভাবী পরিণতি প্রতিভাবান লেখক তাহার সুন্দর পরিকল্পনা করিয়াছেন।

সমাজ-সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার বাহিরে সহরতলীতে প্রগতি-অভিমানী এক পরিবারে তরুণী অচলাকে আধুনিক শিক্ষিতার বেশে লেখক

---

* বিবিধ প্রবন্ধ—বিদ্যাপতি ও জয়দেব।

পাঠকের নিকট পরিচিত করাইলেন। অচলা সংযত, ধীর, মিষ্টভাষিণী ও কোমলস্বভাবা। তাহার স্থির বিচার-বুদ্ধি, সুমার্জ্জিত রুচি, স্বাধীন ও সংযত ব্যবহার আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। সংস্কৃত ও উদারনৈতিক আবেষ্টনের কোলে এইরূপ চরিত্রের বিকাশ সম্ভব। কিন্তু যে সংসার-মরুতে সে বাড়িয়াছে তাহার শিক্ষা ও সংস্কার সবল-চরিত্র বিকাশের অনুকূল ছিল না। জন্মগতভাবে মায়ের সংস্কারের ও চরিত্রের অধিকারী হইলেও অচলা মাতৃস্নেহরসে বাড়িবার সুযোগ পায় নাই। সে শৈশবে মাতৃহীনা। বিপত্নীক পিতার স্নেহকোলে সে প্রতিপালিত। সমাজের বাহ্যিক সঙ্কীর্ণতায় বীতশ্রদ্ধ ও প্রগতিমুগ্ধ পিতা অতি সাবধানে সে সমাজ হইতে নিজেকে দূরে রাখিয়াছিলেন। ক্ষণিক আরাম স্বাচ্ছন্দ্য ও ব্যক্তিগত সুবিধার মোহে সকল বিধি-নিষেধের বাহিরে তিনি নিজ সুবিধামত জীবন যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার একক নিবাসে সাংসারিক ও সামাজিক শিক্ষার কোন সুযোগ ছিল না। ধনীর প্রাসাদে সুযত্ন বর্দ্ধিত জাত-ফুলের গাছ যেমন কাননে রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝায় বর্দ্ধিত গাছের মত পুষ্ট ও শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে না, তেমনই সাংসারিক ও সামাজিক শিক্ষা ও সংস্কারের বাহিরে প্রতিপালিত অচলা বাড়িল বটে কিন্তু আবেষ্টনের ও পারিপার্শ্বিক সহজ প্রতিযোগিতার অভাবে ও মাতৃস্নেহরসে বঞ্চিত হইয়া চরিত্রের দৃঢ়তা লাভ করিতে পারিল না। একটা আভ্যন্তরীণ দুর্ব্বলতা তাহার রহিয়া গেল। সামাজিক পরিবেশের স্বতঃ-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় চরিত্রে যে দৃঢ়তা আসে, মাতার স্নেহশাসন ও চরিত্র প্রভাবে যাহা সুদৃঢ় হয়, তাহা লাভ করিবার কোন সুযোগই অচলার ছিল না। কিন্তু শত শতাব্দীর সঞ্চিত সংস্কারের ধারা সে মাতৃস্তন্যের সহিত পান করিয়াছিল। কি ভয়ানক ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি ও ভূকম্পনের তীব্র

আলোড়নে যে এই চরিত্র অসহায়ে শিথিল হইতেছিল, লেখক তাহাই কর্ম্মসংঘাতের মধ্য দিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

প্রত্যেক মানুষের চরিত্র কতকগুলি স্বাভাবিক শক্তি আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া ওঠে। চরিত্রের স্বতঃ-বন্ধনগুলিকে তাই ধর্ম্ম বলে। বন্ধনগুলি জীবনতরীকে বিক্ষুব্ধ সাগরের মধ্য দিয়া নিরাপদে কূলে পৌঁছাইয়া দেয়। অচলার জীবনে ধর্ম্মের বন্ধন সুদৃঢ় ছিল না। ধর্ম্ম ও সংস্কারে যে অটল বিশ্বাস থাকিলে চরিত্র শক্তিমান্ হয় সে বিশ্বাসও অচলার ছিল না। 'কেদাররবাবু সংসারে সাধারণ দশজনের মত দোষেগুণে মানুষ। তিনি ভালবাসার সূক্ষ্ম তত্ত্বের বড় একটা ধার ধারিতেন না।' অর্থের পণ্যে, কন্যার ভালবাসা বিক্রয় করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। পাশ্চাত্ত্যের আদর্শে তিনি ধনের খোলসকে মানের আবরণ বলিয়া মানিয়া লইতেন। অক্লেশে তিনি সুরেশকে বলিলেন, "মত সে (অচলা) কোন মতেই দেবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দু'জনের মধ্যে এমন একটা কিছু—বুঝলে না…?" ধর্ম্ম ছিল তাঁহার হেঁয়ালির পুতুল। উন্নতপন্থী অভিমানী কেদারবাবু যখন জানিতে পারিলেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্মে সুরেশের শ্রদ্ধা নাই, তখন তাহাকে জামাতারূপে পাইবার লোভে অনায়াসে বলিলেন, "সে আমাদের ব্রাহ্মগিরিটিরি একেবারেই পছন্দ করে না।" সুরেশকে তিনি পছন্দ করিয়াছিলেন, তাহার অর্থ, 'রবার-টায়ারের' গাড়ী ও ঐশ্বর্য্যের খাতিরে। তাঁহার কাছে জগতের এমন কোন পদার্থ ছিল না যাহা তিনি ঐশ্বর্য্যের পায়ে বলি দিতে না পারিতেন। 'সুরেশের টাকা ফেরত দেওয়ার প্রশ্নটা যদিও মনের মধ্যে উঠিল বটে, কিন্তু উত্তরটা তেমনি ঝাপ্সা হইয়া রহিল।' এইরূপ সঙ্কীর্ণ মন, অথচ তথাকথিত শিক্ষা সংস্কার মোহগ্রস্থ পিতার গৃহে অচলা বাড়িয়া উঠিতেছিল। মার্জ্জিত রুচি

অচলা মহিমের বাগদত্তা। মহিমকে জীবন-সঙ্গী নির্ব্বাচনে আমরা তাহার ধীর বিচারবুদ্ধি ও স্থিরচরিত্রের পরিচয় পাই। চরিত্রের স্বাভাবিক আকর্ষণ তদনুরূপ চরিত্রের উপরই হইয়া থাকে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। মহিম বুদ্ধিমান্, বিদ্যানুরাগী, ধীরবিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন ও স্বল্পভাষী। তাহার নিকট আত্মসমর্পণ করাই অচলার পক্ষে স্বাভাবিক। বিচারে ভুল ছিল না। এই দুইটী সমধর্ম্মী চরিত্রের মিলন বড় চিত্তাকর্ষক। প্রতিকূল আবর্ত্তে বিচ্ছিন্ন না হইলে তাহাদের মিলন সহজ ও প্রেমাত্মক হইত।

বিশ্বজীবনে প্রকৃতির স্বাভাবিক আকর্ষণ ও বিকর্ষণের প্রভাব দেখা যায়। ইহাতে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিগুলির যেরূপ বিকাশ ও পরিণতি হয়, জীবনধারা সেইভাবে প্রবাহিত হয়। বাগানে ফোটা গোলাপ সকলের মনে আনন্দ জাগায়। কিন্তু প্রবৃত্তির প্রেরণায় কেহ ফুলটিকে তুলিয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিতে চায়, আবার কেহ বা তাহা গাছেই পূর্ণ বিকশিত দেখিবার আশায়, মূলে জলসেচন করিয়া তৃপ্তি পায়। জীবন-প্রবাহ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির সংগ্রামের ফল।* যাত্রা-পথে কেবলমাত্র অনুকূল ও সমধর্ম্মী শক্তির সাহচর্য্য অসম্ভব; বিরুদ্ধধর্ম্মী ও প্রতিকূল চরিত্র সমূহের সংস্পর্শেও আসিতে হইবে। মানবচরিত্র সম ও বিরোধী প্রকৃতির সংঘাতে গড়িয়া ওঠে। সংগ্রামে চরিত্রগত দোষ ও গুণরাজির প্রতিক্রিয়ায় বলবত্তর শক্তি দুর্ব্বলতরকে পরাভূত করিয়া অগ্রসর হয়। অনাদিকাল হইতে এই দ্বন্দ্বের ফলে জীবনগতি ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া আসিতেছে।

* Dr. Arnold: Life is a conflict between higher and lower-selves.

যাত্রার প্রথম মুহূর্ত্তে অচলার জীবন-তরীখানি একটি বেগবান্ বিরোধী চরিত্রের আঘাতে প্রতিহত হইতে লাগিল। প্রলয়ের মূর্ত্তিতে সুরেশ তাহার যাত্রাপথে উদিত হইল। সে নাস্তিক, প্রবৃত্তির দাস। অনুশাসন মানিয়া চলিতে সে জানে না। একবার সে যাহা ধরে, ভালই হোক আর মন্দই হোক, তাহার শেষ সে আপ্রাণ চেষ্টায় করিবেই। প্রবৃত্তির ক্ষিপ্র-তাড়নে সে অনায়াসে নিজেকে বিসর্জ্জন দিতে পারে। সে মহিমকে ভালবাসিয়াছিল এবং বন্ধুর প্রাণরক্ষা করিতে একাধিকবার সে নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিল। একমুখী ঝঞ্ঝার বেগ যতই প্রবল হোক না কেন, তাহার প্রকৃতি তত ভয়ঙ্কর নয়। তাহার গতির ধারা বুঝিয়া আমরা আত্মরক্ষায় সতর্ক হইতে পারি। কিন্তু যে ঝঞ্ঝার আবেগ বক্ষে ঘূর্ণাবর্ত্ত প্রচ্ছন্ন থাকে তাহা হইতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব নয়। কোন্ অতর্কিত মুহূর্ত্তে যে উহা আমাদের ধ্বংস করিবে, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। সুরেশ যদি শুধু শয়তান হইত তাহা হইলে অচলা হয়ত সতর্ক হইতে পারিত; কিন্তু তাহার পঙ্কিল আবর্ত্তে স্নেহকোমল প্রাণ, সুন্দর ও শক্তিমান্ স্বাস্থ্য ও অপরিসীম আত্মত্যাগের চোরাবালি ছিল। 'যাহাকে ভালবাসিত, তাহার জন্য যে কি করিয়া কি করিবে তাহা ভাবিয়া পাইত না, তাহার অন্তরের উদার ও দুর্দ্দমনীয় শক্তি বাধা পাইলে সাগর তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত তুচ্ছ ঢেলার মত অনায়াসে তাহা কবলিত করিয়া অগ্রসর হইত। 'মানুষকে আমি পূজা করি। মানুষের সেবা করাই মানুষের চরম সার্থকতা', এ কথা শুধু তাহার মুখের নয়, তাহার অন্তরতম অন্তরের, ইহা তাহার প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। চরিত্রের এই ঔৎকর্ষ সকল সময়েই তাহার পাশবিক প্রবৃত্তিকে মার্জ্জনীয় করিয়া তুলিতেছিল। এই মায়ামরীচিকা সুরেশের চরিত্রে

অনুক্ষণ এক অস্বাভাবিক মোহ ও আকর্ষণের উৎস খুলিয়া রাখিত। অচলাও ইহাতে মুগ্ধ হইয়া অতর্কিতে প্রলয়কে জীবনে আহ্বান করিয়া বসিল। শুধু তাই নয়। সুরেশ ছিল বিত্তশালী, বিলাসের যাবতীয় উপকরণের অভাব তাহার কিছুই ছিল না। অচলার পিতা কেদারবাবুর অর্থ ছিল নীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাপকাঠি। সুতরাং কেদারবাবুর দুর্ব্বলতাকে আশ্রয় করিয়াও সুরেশ অচলাকে অস্থির করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইল। ঋণগ্রস্থ কেদারবাবুর কন্যার প্রণয়-পণ্যে ঋণমুক্ত হইতে কিঞ্চিন্মাত্র দ্বিধা ছিল না।

কিন্তু অচলার রুচি মার্জ্জিত ও বিচারশক্তি ধীর থাকায় তাহার পিতার সঙ্কীর্ণতা ও সুরেশের নীচতা তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মন তাহার সেই শান্ত, স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ মহিমের হৃদয়-সায়রেই ডুবিয়া রহিল। দুই তিনটি সুনিপুণ তুলিকাপাতে লেখক জানাইয়া দিলেন যে, অচলা একান্তে মহিমেরই—"তোমার এত গরমে চা খেয়ে কাজ নেই, তা' ছাড়া এ বেলা ত তোমার চা খাওয়া সহ্য হয় না", বলিয়া অচলা মহিমের জন্য লাইম-জুসের সরবৎ আনিতে গেল। 'সুরেশের চা তিক্ত হইয়া উঠিল।'

অচলা বুঝিয়াছিল যে, তরী যতই সুদৃঢ় হোক না কেন, উপযুক্ত নাবিক ব্যতীত সাগরপথে প্রতিকূল আবহাওয়া ও বাত্যার হাত হইতে তাহাকে রক্ষা পাওয়া শক্ত। কেবল তাহাই নয়, সাগরপথের সমুদয় বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে উপযুক্ত নোঙর এবং নাবিকের উপকূলের ও আশ্রয়-বন্দরের দিশা জানা চাই। নারীচরিত্রের গূঢ় রহস্য হইল এই যে, তাহার আভ্যন্তরীণ শক্তি ও সৌন্দর্য্য বন্যলতার মত কোন বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া বিকশিত হয়। সে নির্ভরশীলা। ভূমিতে

কিছু দূর গড়াইয়া গেলেও, কোন না কোন গাছকে অবলম্বন করিয়া সে বাড়িয়া ওঠে। তাহার পূর্ণ অভিব্যক্তি এই আশ্রয়ের শক্তি সামর্থ্য ও ছায়াদানের উপর নির্ভর করে। তাই জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল মহিমকে অবলম্বন করিয়া সে নিরাপদ হইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। "তুমি কি তোমার কসাই-বন্ধুর হাতে আমাকে জবাই করবার জন্য রেখে গেলে ?" বলিয়া অচলা, "ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।" নিজের আংটিটি মহিমের আঙুলে পরাইয়া দিয়া প্রণাম করিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িল। অচলার প্রতি স্নেহে, প্রেমে কৃতজ্ঞতায় মহিমের হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিবাহ বন্ধনে মহিমকে সম্পূর্ণভাবে আশ্রয় করিয়া অচলা নিশ্চিন্ত হইল—'প্রভু, আর আমি ভয় করি না, তোমার সঙ্গে যে অবস্থায় থাকি না কেন সে আমার স্বর্গ'। নারী-চরিত্র সুলভ নির্ভরতায় তাহার সকল আশঙ্কা দূরে গেল। যত বড় ঝড়ই মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাক না কেন, গাছ যদি শক্ত হয়, মূল যদি তাহার সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রোথিত থাকে তবে তাহাকে বেড়িয়া ওঠা লতাটিও নিরাপদে থাকে। প্রবল বাত্যায় গাছের শাখা বিপর্য্যস্ত হইতে পারে, কিন্তু তবুও সে আশ্রিতাকে সমানভাবে রক্ষা করিয়া মাথা উঁচু করিয়াই দাঁড়াইয়া থাকে। আবার অনুকূল হাওয়ার স্পর্শে, পল্লবগুলির মৃদু হিল্লোলে ও শিহরণে লতাটিও পুলকিত হইয়া ওঠে। এইরূপে শক্তিমান্ গাছ আশ্রিত লতাটিকে সুখদুঃখের অংশীদার করিয়া রাখে। এখন দেখিতে হইবে, অচলার নির্ভর-আশ্রয় মহিম অচলাকে সংসারের আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিতে কতদূর সক্ষম ছিল। স্ত্রীকে শুধু ঝঞ্ঝা ও আবর্ত্তের বিপদ হইতে রক্ষা করা স্বামীর একমাত্র কর্ত্তব্য নয়। তাহার সকল কোমল বৃত্তিগুলির যাহাতে সুপরিণতি হয় তাহার বিধানও

স্বামীকে করিতে হইবে। নারীর কোমল হৃদয়, স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া গঠিত। স্নেহবিগলিতহৃদয় সে তাহার জীবনদেবতার পায়ে নিঃশেষে ঢালিয়া দেয়। অচলা মহিমের ধীর ও শান্ত চরিত্রে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি, স্থির সঙ্কল্প ও সংযত স্বভাবের আকর্ষণ অচলাকে সম্পূর্ণরূপে মোহিত করিয়াছিল,—জীবনে সে মহিমকেই একমাত্র দেবতারূপে বরণ করিয়াছিল। কিন্তু নারীর জীবনদেবতা তাহার অন্তরের অতি গোপনতম প্রদেশে সমস্ত প্রাণ জুড়িয়া নিদ্রিত থাকে। প্রভাতের অরুণ যেমন আঁধারের বক্ষে হাসি ফুটাইয়া তোলে, তেমনি একমাত্র স্বামীপ্রেমের স্নিগ্ধ উত্তাপ সে নিদ্রিত দেবতাকে জাগ্রত করিতে পারে। ধীর ও মৌন প্রকৃতি মহিমের স্নেহ-ফল্গু ছিল অন্তঃসলিলা। ফল্গুধারা তাহার প্রাণের ভিতর দিয়া নিঃশব্দে অবিরোধে প্রবাহিত হইয়া তাহার অন্তরকে চিরশ্যামল করিয়া রাখিত। কিন্তু সেই স্রোতের কল্লোল, তাহার আবেগ-প্রবাহ, কখনও বাহিরে প্রকাশ পাইত না। 'মহিম চিরদিনই নিঃশব্দ প্রকৃতির লোক, আবেগ উচ্ছ্বাস কোনদিনই প্রকাশ করিতে পারিত না।' 'অচলার প্রতি স্নেহে, প্রেমে, কৃতজ্ঞতায় তাহার সমস্ত হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল' বটে, কিন্তু তাহা মুখে প্রকাশ করিলে লোকের চক্ষে যেন নিতান্ত অসংলগ্ন, অপ্রত্যাশিত বলিয়া মনে হইত। কেননা উহা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। "সংসারে অতি বড় দুর্ঘটনাও তাহাকে তিলমাত্র বিচলিত করিতে পারিত না। * * * তাহার সহ্যগুণ ছিল অপরিসীম ও সংযমের বাঁধ দুর্ভেদ্য।"

অচলার নারী-প্রাণ তাই অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। মহিমের নির্ব্বিকার স্থৈর্য্যের আবরণ ভেদ করিতে গিয়া যেন অচলার ভালবাসার

ঢেউগুলি কঠিন লৌহ-দেউলে আঘাত পাইয়া প্রতিহত হইতেছিল,—ভিতরে প্রবেশের পথ পাইতেছিল না। মহিমের সহিত মৃণালের সহাস্য ও নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার ও আন্তরিকতার উচ্ছ্বাসে যেন অচলা একটা কারণ খুঁজিয়া পাইল। সে ভাবিল, মহিমের স্নেহ ও ভালবাসা মৃণাল উজাড় করিয়া লইয়া গিয়াছে। সেই জন্য সে বক্ষমরুতে এখন অচলার জন্য শুধু শুষ্ক বালুরাশি ছাড়া আর কিছু সঞ্চিত নাই। নারী-জীবনের সর্ব্বপ্রধান ভিত্তি—স্বামীর ভালবাসায় বিশ্বাস—এইরূপে অচলার শিথিল হইয়া আসিতেছিল। তাহার শিক্ষা দীক্ষায় পল্লী-বাসীদের অনুদার মন্তব্য আত্মসম্মানে আঘাত করিয়া তাহাতে ইন্ধন যোগাইল। যেন এই অবমাননায় মহিম দুঃখিত নয়। তাহার জন্য মহিমের হৃদয়ে ভালবাসা না থাকাই ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া অচলা মনে করিল। সে তাহার স্থৈর্য্য ও বিচারশক্তি হারাইতে বসিল। যে বিশ্বাস ও দৃঢ়তা লইয়া পিতার ইচ্ছারও বিরুদ্ধে সে সুরেশের ধন, ঐশ্বর্য্য, ও প্রেমের উদ্দাম নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, মহিমের ভালবাসায় সন্দিহান হওয়ায় সে দৃঢ়তা আর রহিল না। মানবচরিত্র সর্ব্ব বন্ধন শূন্য না হওয়া পর্য্যন্ত আত্মধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। কারণ আত্মিক ধর্ম্ম সত্যের বেদীতে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। বন্ধন মুক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহার পতন হইতে পারে না। লেখক তাই পতনের পূর্ব্বে অচলার চরিত্রে বন্ধন শিথিল করিয়া তুলিলেন। অচলার পতন স্বাভাবিক হইয়া উঠিল।

চিত্তের অস্থির সন্ধিক্ষণে, দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে, তাহার স্বামীর পল্লীভবনে আবার সুরেশ দুষ্টগ্রহের মত আসিয়া জুটিল। মহিম অবিচলিত ভাবে তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। 'সংযম, চিত্তস্থৈর্য্য ও ধৈর্য্যের নিগড় মহিমের

চরিত্র প্রাণহীন করিয়া তুলিয়াছে। সুরেশ তাহার প্রাণ একাধিকবার রক্ষা করিয়াছে সত্য, সুরেশের ঋণ অপরিমেয় তাহাও ঠিক। কিন্তু এক সময় সুরেশ তাহাকে বাঁচাইয়াছিল বলিয়া এখন যে মহিমকে খুন করিবার অধিকার তাহার নাই, একথা অচলা বুঝিয়াছিল, মহিম বুঝিল না। অচলা সুরেশের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মহিমের শরণ লইয়াছিল ; কিন্তু অচলাকে রক্ষা করিতে মহিম তিলমাত্র চেষ্টা করিল না। তাহার এই দুর্ব্বলতা সুস্পষ্ট। উপকারের প্রতিদানে সে নিজের জীবন সুরেশের জন্য দান করিতে পারিত, কিন্তু অচলাকে রক্ষা করা তাহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল। তাহা হইলে অচলার জীবন ক্ষতাহত হইত না। মহিমকেও তাহার বেদনা সহ্য করিতে হইত না।

চরিত্রের এই দুর্ব্বলতা অবলম্বন করিয়াই আখ্যায়িকায় দ্বন্দ্ব ও দুঃখের ধারা বহিয়া আসিল। অন্যতম প্রধান চরিত্রের গুণরাজির অন্তরালে প্রচ্ছন্ন এই দোষটিকে অবলম্বন করিয়া নিপুণ লেখক আখ্যায়িকাটিতে দুঃখের অবতারণা করিলেন। মহিমের গুণরাশি এবং আবেষ্টনের সাহায্যে লেখক পাঠকের সহানুভূতি তাহার প্রতি নিবদ্ধ রাখিলেন। মহিমের দুর্ব্বলতা পাঠকের চক্ষু এড়াইয়া গেল। ইহা লেখকের নিপুণতার পরিচায়ক। স্বামীঅনুরাগ স্পর্শ না পাইয়া, অচলার চরিত্র শিথিল হইয়া আসিতেছিল, আজ তাহার ভালবাসায় সন্দিহান হইয়া, ছিন্ন হইল। সুরেশ বলিয়াছিল, "পাষাণকে নিয়ে আমি কখনও সুখ পাইনি।" অচলাও মনে করিল যে ঐ পাষাণের ভিতর তাহার জন্য কোন ভালবাসা নাই। হয়ত অনুদার পল্লীবাসীদের মত সেও তাহাকে উপেক্ষা করে। পিতার সাংঘাতিক অসুখের সংবাদেও

মহিমের কোন সহানুভূতি সে দেখিতে পাইল না। স্বামীর মধ্যে ভালবাসার কোন সন্ধান না পাইয়া মন তাহার বিদ্রোহী হইল। সে কলিকাতা যাইবার প্রস্তাব করিল।

কিন্তু গৃহদাহে স্বামীর অবিচলিত ধৈর্য্য ও দুঃখসহিষ্ণুতায় তাহার প্রতি আবার করুণায় অচলার মন ভরিয়া উঠিল। যে আন্তরিক আত্মীয়তার জোরে সে মহিমকে প্লেগ রোগীর সেবা করিতে যাইতে দেয় নাই, যাহার প্রভাবে সে সুরেশের চা তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল, প্রাণের সেই স্বতঃস্ফূর্ত্ত আত্মীয়তায় সে আবার মহিমকে স্নেহনীড়ে বাঁধিতে চাহিল। নিজের গহনা বেচা টাকায় মহিমের দুরবস্থায় সাহায্য করিবার প্রস্তাব করিল। কিন্তু বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মহিম সে আত্মীয়তা গ্রহণ করিতে পারিল না। মনে করিল যে, অচলা তাহার দুর্দ্দশায় দয়া করিয়া করুণার দান করিতে চাহিতেছে,—দানের সেই ইচ্ছায় মহিম আত্মীয়তার গন্ধ খুঁজিয়া পাইল না। কারণ, পল্লীগৃহে আসার পর হইতে অচলার ব্যবহারে এতটুকুও আত্মীয়তা কোনদিনই সে পায় নাই। তাই অচলার দান গ্রহণে মহিম ভিক্ষার ঝুলি পাতিতে পারিল না। স্ত্রীর যে সাহায্য সে নিজ অধিকারে দাবী করিতে পারে না, উন্নত চরিত্র মহিম অভিমানে, ক্ষোভে, সে দান প্রত্যাখান করিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অচলার চরিত্র শান্ত, সংযত ও স্থির ছিল। সেই চরিত্র বিচলিত করিতে প্রতিকূল শক্তিসমূহ প্রতিনিয়ত আঘাতের পর আঘাত করিতেছিল। সাময়িক দুর্ব্বলতায় টলায়মান চরিত্র স্বাভাবিক শক্তি প্রভাবে আবার নিজস্বে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। পিতার সঙ্কীর্ণ নীতি, সুরেশের উন্মত্ত ও উদ্দাম ভালবাসার বন্যা, মহিমের জড় পাষাণের মত নিশ্চল প্রাণ, স্বামীর ভালবাসায় অবিশ্বাস, স্বামীকে আপন করিয়া

পাইবার নিষ্ফল প্রয়াস, স্বামীর উপেক্ষা, পল্লী পড়শীদের অনুদার মন্তব্য সকল একে একে আঘাত করিলেও তাহাকে অধঃপতিত করিতে পারিল না। মহিমের অসুখের সংবাদে আবার তাহার নারীপ্রাণ স্বামীর সেবায় নিয়োজিত হইল।

শিক্ষা, সংস্কার ও বিচারবুদ্ধি মানুষের স্বাধীন বৃত্তিগুলিকে পরিমার্জ্জিত ও সুশ্রী করিয়া তোলে। আমাদের বেশবিন্যাস, আদব-কায়দা, চালচলন ও ব্যবহার আমরা এই শিক্ষা সংস্কৃতির ফলে পাইয়া থাকি। দেহের নগ্নতার সহিত আমাদের মনের নগ্নতাও ঐ সংস্কৃতির বেশবিন্যাসে পরিশোভিত হইয়া থাকে। কিন্তু যখন কোন দৈব বিড়ম্বনা, রোগ, শোক কিংবা ব্যাধিতে আমাদের চিত্তবৃত্তি সকল দুর্ব্বল হইয়া পড়ে তখন সংস্কৃতির আবরণকে দূরে ঠেলিয়া অনেক সময় চিত্তের নগ্নবৃত্তি আত্মপ্রকাশ করে। অসুস্থতার দুর্ব্বলতায় এবং অচলার স্বতঃস্নিগ্ধ সেবা পরিচর্য্যায় মহিমের অন্তঃসলিলা ভালবাসার ফল্গু ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া বাহিরে আত্মপ্রকাশ করিল। 'নার্সের হাতে ওষুধ পর্য্যন্ত খেতে আমার প্রবৃত্তি হবে না।..... ওকে সাহায্য করবার জন্য একজন লোক দাও। কাল পরশু দুটো রাত্রিই ওকে জাগতে হয়েছে'। এই নির্ভর ভরা উক্তি অচলার চক্ষে অশ্রু টানিয়া আনিল। 'সে স্নান আহারের সময়টুকু ব্যতীত দিবারাত্র এতটুকুকাল স্বামীর কাছ ছাড়া হইতে সাহস করিল না।' মহিম বলিল, "আমাকে বাঁচিয়ে তোলা যেন তোমার নিজেরই গরজ", শুনিয়া অচলার প্রাণের উৎস চোখের জলে ভাসিয়া উঠিল। এমনি ধারা সরল প্রাণের সহজ বিনিময়ে অচলা আবার বাঁধা পড়িল। সে মহিমকে একান্তে পাইবার জন্য গহনা বিক্রয়লব্ধ অর্থে পশ্চিম যাত্রা স্থির করিল। বন্ধনহীন যে

চরিত্র একদিন অস্থির হইয়াছিল, ভালবাসার সন্ধান পাইয়া তাহা আবার সুস্থির হইল। স্বামীর প্রাণে ভালবাসার সন্ধানে অচলার প্রাণে যে শক্তির সঞ্চার হইল, সঙ্কীর্ণতা মুক্ত ও পরিবর্ত্তিত রুচি পিতৃস্নেহে তাহা আরও দৃঢ় হইল।

কেদারবাবুর ব্যক্তিগত 'সুবিধাবাদ' মত, পিসীমার স্বতঃস্নেহ-নির্ঝরে ধৌত এবং মৃণালের নিঃস্বার্থ সেবাব্রতে অনুপ্রাণিত হইয়া ধীরে ধীরে সর্ব্বমঙ্গল আদর্শবাদে পরিবর্ত্তিত হইতেছিল। তিনি বুঝিলেন, শত যুগের শিক্ষায় যে সত্য উপলব্ধি করা যায় না, জলচর পক্ষীশাবকের সন্তরণ শিক্ষার মত সমাজের কোলে প্রতিপালিত মৃণাল জন্মগত সূত্রে তাহা লাভ করিয়াছে। যে সমাজের বাহ্যিক সঙ্কীর্ণতায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া কেদারবাবু সুবিধার মোহে তাহা ত্যাগ করিয়াছিলেন সেই সমাজের অন্তঃসারিণী শক্তির সংস্পর্শে আসিয়া আবার তাহাকেই জীবনে বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার আত্মসম্মান বোধ জন্মিল। 'কাল থেকে অনেক অপমান আমি নিঃশব্দে সহ্য করেছি, কিন্তু আমার মেয়েকে আমার চোখের সামনে টাকা দিয়ে যাবে সে আমার কিছুতেই সহ্য হবে না—বলে দিচ্ছি।······টাকা ছড়িয়ে বাপের চোখকে অন্ধ করা যায় না, পাষণ্ড এ কথা যেন মনে রাখে। এ বাড়ী আমি নিজে বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করে যেখানে ইচ্ছা চলে যাবো।' উন্নতমতি ও পরিবর্ত্তিত রুচি পিতার স্নেহে আবার অচলার হৃদয় আপ্লুত হইল।

ভালবাসা, স্নেহ, সেবা, ভক্তি ও বিশ্বাস প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ধর্ম্মগুলি যে চরিত্র স্থিরতার যথার্থ বন্ধন, লেখক আবার তাহা সুস্পষ্টে প্রকাশ করিলেন। অচলার যাত্রাপথে যত প্রকার অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তি-সমূহ স্বাভাবিক নিয়মে তাহার জীবনে ঘাত ও প্রতিঘাত করিতেছিল

লেখক তাঁহার সুনিপুণ তুলিকায় অতি সহজ ভাবে সেইগুলিকে পাঠকের চোখে প্রতিভাত করিলেন। বিরোধী শক্তি সংঘাতে মজ্জমানপ্রায় জীবনতরী আবার অনুকূল হাওয়ায় ও অন্তর্নিহিত শক্তিতে কি প্রকারে যে আত্মরক্ষা করিতেছিল শরৎচন্দ্রের লেখনীতে তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিক শক্তিসম্পন্ন অচলার চরিত্র সমুদ্রবক্ষে উদ্বেলিত তরণীর মত তরঙ্গের আঘাতে মজ্জমানপ্রায় হইয়াও আবার সেই বিপদ-লহরীর বক্ষ-ভেদ করিয়াই যেন আপদমুক্ত হইতেছিল। গৃহদাহের পর সে ঘূর্ণাবর্ত্তে তৃণের মত তীরের সন্ধান না পাইয়া দগ্ধ গৃহ পরিত্যাগ করিল বটে, কিন্তু প্রথম অনুকূল সুযোগেই সে আবার সেবায় মহিমকে আপন করিয়া ফিরিয়া পাইল। জীবনদ্বন্দ্বের ঘাতপ্রতিঘাতে তাহার আত্মিক উৎকর্ষতা চরিত্রের দুর্ব্বলতাকে পরাজয় করিয়া চলিল। সংগ্রামসাগরে যখন সে এইরূপে পথহারা হইতেছিল, তখন তীরস্থ আলোকবর্ত্তিকার মত মৃণাল ও পিসীমার ভাস্বর চরিত্রের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ তাহার প্রাণে বল-সঞ্চার করিতেছিল। মৃণালের আপ্রাণ ও আত্মহারা সেবাধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় সে বুঝিতে পারিল, জীবনের চরম সার্থকতা কোথায়। মৃণালের চরিত্র তাহাকে পথ নির্দ্দেশ করিয়া দিল। চরিত্র ধর্ম্মের উজ্জ্বল প্রভার সম্মুখে মানবের বীভৎস পাশবিক বৃত্তিও যে সম্ভ্রমে আপনি মাথা নোয়ায়, ইহা অচলা সুরেশের নিজ মুখে শুনিতে পাইল। মৃণালের আবার বিবাহ প্রস্তাবে, সুরেশ বলিল, "সহমরণের দিনে কোন কোন সতী হাসতে হাসতে পুড়ে মরতো, মৃণাল তাদেরই জাত।......একটা একটা ক'রে হাত পা কাটতে থাকলেও আর একবার বিয়ে ক'রতে রাজী করানো যাবে না।......আমাকে 'দাদা' ব'লে ডেকেছে, তার কাছে আমি এই সম্মানটুকু বজায় রাখতে চাই।" কথার শেষে অচলা মুখ

গুঁজিয়া কাঁদিতে লাগিল,—সতীত্ব সম্পদের পূর্ণ মহিমা আজ তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতে লাগিল। অচলা বুঝিল যে, এই সম্পদের স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে ঘৃণ্য পশু ও কসাইয়ের হৃদয়েও ভক্তির উৎস জাগাইয়া তোলে। 'হাতের নোয়া অক্ষয় হোক্ মা', পিসীমার এই আশীর্ব্বাদ অচলা জীবনের সব চাইতে বড় সম্পদ বলিয়া মানিয়া লইল।

সুরেশ প্রবৃত্তির দাস। প্রবৃত্তিকে শাসন করিতে সে কোনদিনই শেখে নাই। একবার সে যাহা ধরে, তাহা না পাইয়া সে ক্ষান্ত হয় না। অচলার জীবনে, সে ছিল দুষ্ট গ্রহ। যখনই অচলার প্রাণ মহিমকে একান্ত আপনার করিয়া লইতে চাহিয়াছে, সুরেশ সহসা প্রচণ্ড আবেগে তাহাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া, অকূল সমুদ্রে ভাসাইয়া দিযাছে। পাশবিকতার নির্লজ্জ তাড়নায়, পশ্চিম যাত্রার পথে, মিলনের পূর্ব্বক্ষণেই, অচলার অজ্ঞাতে, সে তাহাকে মহিমের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইল। ঘাতকের গুপ্ত ছুরিকা এইরূপে নিষ্ঠুর আঘাতে, দুইটী প্রাণের বন্ধন ছিন্ন করিল। অচলা চরিত্রগত স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায় ও নিরুপায়ে, সুরেশের করায়ত্ত হইল। কিন্তু সত্যের যে সুন্দর মূর্ত্তি অচলার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহা অম্লান রহিল। প্রতিনিয়ত তীব্র অনুশোচনায় তাহার প্রাণ বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছিল। আবেষ্টনের প্রাচীর সুরেশ এতই দুর্ভেদ্য করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিল যে, তাহা ভেদ করিবার শক্তি অচলার ছিল না। মনের বিদ্রোহ সে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। অচলার চরিত্রের যে দুর্ব্বলতার ছায়া অবলম্বন করিয়া সুরেশ তাহার জীবন-আকাশে প্রথম হইতে দুষ্ট গ্রহের মত উদিত হইয়াছিল, আজ সেই দুর্ব্বলতা অবলম্বন করিয়াই, সুরেশ অচলার দেহ অধিকার করিয়া লইল।

শরৎচন্দ্রের শিল্প-চাতুর্য্য

আখ্যায়িকার প্রথমে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বুদ্ধির অতীত কোন এক নীরব দুর্ব্বলতার প্রভাবে, অচলা সুরেশের অত্যাচারে কোনদিনই তীব্র প্রতিবাদ করে নাই,—করিবার ক্ষমতাও ছিল না। তাহার আত্মিক শক্তি প্রবল চেষ্টায় এতদিন পর্য্যন্ত সুরেশের হাত হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু তাহার অন্তরের সুপ্ত দুর্ব্বলতায় সে শক্তি পরাজিত হইল। নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে দুর্ব্বল চরিত্র তাহাকে বিপথে পরিচালিত করিল। কিন্তু আত্মপরাভবের সঙ্গে সঙ্গেই পরাভবের গ্লানি তাহার মন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। সে অশান্ত হইয়া উঠিল।

দেহ আর মন কখনও পৃথক পথে চলিতে পারে না। সুরেশ পাশবিকতার উন্মাদনায়, প্রবল শক্তিতে, উপায়হীন আবেষ্টনের মধ্যে, অচলার নারীদেহখানি করায়ত্ত করিল। নৈতিক মৃত্যুর সহিত অচলার আত্মিক মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। রামবাবু, 'ঐ অর্দ্ধমৃত নারী দেহের প্রতি চাহিয়া রহিলেন······।' লেখক, বৃদ্ধ রামবাবুর স্বতঃস্ফূর্ত্ত স্নেহ-নির্ঝরের অমৃতধারা পান করাইয়া, অচলার আত্মাকে সে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়া রাখিলেন। অচলার প্রাণের গোপন ব্যথা তাহাকে পীড়িত করিতে লাগিল। 'আবার সব হইবে, সব ফিরিয়া পাইবে······ আমার এ আশীর্ব্বাদ কখনও নিষ্ফল হইবে না।' এই প্রকার ছদ্মবাণীর মধ্য দিয়া, সত্যের অমৃত সঞ্জীবনী অচলার হৃদয় স্পর্শ করিতে লাগিল, এবং আবেষ্টন পাপের পঙ্কিলতায় অচলার দেহকে বিষাইয়া তুলিল। 'এই যে মহা পাপিষ্ঠ, যে ভগবান মানে না, পাপপুণ্য মানে না, যে একমাত্র বন্ধু ও তাহার নিরপরাধা স্ত্রীর এতবড় সর্ব্বনাশ সাধিয়া বসিল, কোন বাধা মানিল না—তাহার মুখের প্রতি যখনই সে

চাহিয়াছে, তখনই সমস্ত মন বিতৃষ্ণায় বিষ হইয়া গেছে।' সুরেশের নিশ্বাস পর্য্যন্ত অচলার নিকট বিষাক্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সুরেশ কহিল, "এতদিন তোমার কাছে যা কিছু পেয়েছি, ডাকাতের মত ক'রেই পেয়েছি।" তাহার প্রাণ অচলা নির্ব্বিশেষে স্বামীর পায়েই দান করিয়াছিল—অতএব সুরেশকে দেবার মত তাহার আর কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। তাই সে দিবার কিছু নাই বলিয়াই সুরেশকে বলিল, "আমার কাছে আর তুমি কি চাও? আমার আর কি আছে?" সুরেশ বলিল, "মন ছাড়া যে দেহ, তার বোঝা যে এমন অসহ্য ভারী, এ আমি স্বপ্নেও ভাবি নি * * * তোমার ভার আমি আর বইতে পারি না।" রিক্তদেহের বিষের দহনে সুরেশ অস্থির হইয়া উঠিল। সে মরিল; 'লোভে নয়, ক্ষোভে নয়, দুঃখে নয়,—কেবল মরণটা আসিয়াছিল বলিয়াই সে মরিল।' রামবাবু ও তাহার পারিবারিক পরিবেশের মধ্য দিয়া লেখক যে সত্যের বহ্নি প্রজ্বলিত রাখিয়াছিলেন, সেই বহ্নিই, পাশবিকতার সহিত সুরেশকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিল, —সে মরিল। প্রভাতের শিশির-বিন্দুর সৌন্দর্য্যের মত নারীর দৈহিক রূপে আকৃষ্ট হইয়া মুগ্ধের মত যখন সেই শিশির-বিন্দুকে সুরেশ মুঠার মধ্যে পাইল, দেখিল এক ফোঁটা জলের মত, সে সমস্ত সৌন্দর্য্য নিমিষে গলিয়া গেল। 'তাহার আকাশস্পর্শী ভুলের প্রাসাদ এক মুহূর্ত্তে চূর্ণ হইয়া গেল। * * * হায় রে! পল্লব-প্রান্তটুকুই যাহার ভগবানের দেওয়া স্থান, ঐশ্বর্য্যের এই মরুভূমিতে আনিয়া তাহাকে বাঁচাইয়া রাখিবে সে কি করিয়া?' সৌন্দর্য্যকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করিয়া পাইতে গিয়া মরীচিকাভ্রম ঘুচিল। তাহার ভুলের জীবন, ভুল ভাঙ্গার সঙ্গেই নিঃশেষ হইল। Professor Winchester

বলিয়াছেন, "Human life is always a struggle to force circumstances into some unity or plan and shape it to some end, and it is only in this struggle that the power and charm of character, its pathos, its sublimity are revealed.········ Great plot is that only which shows how circumstances is bent to personality or character."

বিরোধী শক্তি-সম্পন্ন দুইটি বিশিষ্ট চরিত্রের স্বতঃ সংঘাতের ফলে দুর্ব্বলতর চরিত্রের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সংঘাতের ফলে চরিত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি আত্মপ্রকাশ করে। অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির আকর্ষণ ও বিকর্ষণের দ্বন্দ্বে, সাধারণ দোষ-গুণ মিশ্রিত অচলার চরিত্রে, জীবনপ্রবাহের অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। বীজের অন্তর্নিহিত শক্তিতে যে সুপুষ্ট বৃক্ষের সুপ্ত সম্ভাবনা থাকে, তাহা অনুকূল জমি ও আবহাওয়াতে উপ্ত হয়। প্রধান চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত শক্তির পরিস্ফূরণে আখ্যায়িকাটি সুসম্পন্ন হইয়াছে। সংগ্রামে চরিত্রের সুপ্ত সম্ভাবনাগুলি রূপ ধরিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে। শক্তির সংঘাতে আবেষ্টন রূপান্তরিত হইয়া অনুকূল হইল।

২

কথা-সাহিত্যের আলোচনা প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়:—(১) আখ্যান বস্তু ও (২) রচনা পরিবেশন। রচনাটি সাহিত্য-সম্পদে কতখানি পরিপুষ্ট তাহা বিচার করিতে হইলে প্রথমতঃ গল্পাংশটি স্বতঃস্ফূর্ত্ত চরিত্র সকলের পারস্পরিক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় পরিবর্দ্ধিত কিনা, দ্বিতীয়তঃ, কি ভাবে লেখক আখ্যানবস্তু পাঠকের

নিকট পরিবেশন করিয়াছেন—তাহাই বিশেষ দ্রষ্টব্য। লেখকের পরিবেশন-চাতুর্য্য প্রকৃতপক্ষে আখ্যানবস্তুকে পাঠকের নিকট রুচিকর করিয়া তোলে এবং তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দেয়। কোন বিধিবদ্ধ নিয়মে এ শিল্পের বিচার সম্ভব নয় কেন না, শিল্প-চাতুর্য্য শিল্পীর একান্ত বিশিষ্ট সম্পদ। প্রত্যেক লেখকেরই পরিবেশনকৌশল বিভিন্ন। লেখকের প্রতিভার বলে তাঁহার সৃষ্ট শিল্পটী অভিনব ভাবে বিকশিত হয়। প্রতিভা জন্মগত বস্তু,—ইহা কেহই অর্জ্জন করিতে পারেন না। প্রতিভাবান্ বিখ্যাত শিল্পীদের সৃষ্টি তাই চিরদিনই নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

বর্ত্তমান যুগে একদল কথাশিল্পী চরিত্রের নগ্নতার ধারাবাহিক বিশ্লেষণকে শিল্পের চরম পরিণতি মনে করেন। তাঁহারা বলেন যে, সাহিত্য জীবনের নিখুঁত প্রতিচ্ছবি। দৈনন্দিন জীবনে আমাদের কর্ম্ম ও চিন্তাধারা যেমন স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হয় তাহাকে তেমনিভাবে ফুটাইয়া তোলাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। শিল্পে গল্পের স্থান তাঁহারা দিতে চান না, বলেন—গল্প সর্ব্বদাই কল্পিত—সত্য নয়। ('Stories, in fact, do not happen. Human life does not run into plots.') কিন্তু জীবনের নিখুঁত চিত্র অঙ্কনই সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য কিনা, এ বিষয়ে বিশিষ্ট মতদ্বৈধ ও সন্দেহ আছে। জীবনে যখন সংঘাত অবশ্যম্ভাবী, তাহার পরিণতির কল্পনাও সেস্থলে সুনিশ্চিত,—সমস্যার সৃষ্টি হইবেই। যে কল্পনায় জীবনের সম্ভাব্য সমস্যার স্থান নাই, সেস্থলে জীবনের পূর্ণতার পরিকল্পনা করা হয় না,—কেবল আংশিক বিকাশ চিত্রিত করা হয় মাত্র। জীবন-ছবি অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। কল্পনায় জীবনের সম্ভাব্য সমস্যার

স্থান না দিলে, কেবলমাত্র ঘটনা পরম্পরার তালিকা গাঁথিলে, তাহা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃতি হইতে পারে,—সাহিত্যের রূপ তাহাতে থাকে না। বাস্তবের মধ্যে আদর্শের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করাই সাহিত্যের উদ্দেশ্য—'True art has for its highest function to present the ideal in the real.'* যাহা জীবন্ত চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সমাবেশে ও স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় অবশ্যম্ভাবী সমস্যার সৃষ্টি করে, তাহাই প্রকৃত সাহিত্য। বিশ্লেষণপন্থী আধুনিক সাহিত্যিকদের সাহিত্য-রস পরিবেশনের সাফল্য এখনও ভবিষ্যতের অন্ধকারে নিহিত। উক্ত সাফল্যের উপরই বিশ্লেষণপন্থী সাহিত্যের আয়ুষ্কাল নির্ভর করিবে। যে কোন পন্থা অবলম্বনে হোক্ না কেন, সাহিত্যিক আমাদের কল্পনাকে, গভীর ভাবকে, কতটা উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং ঐ ভাবটি কতদূর সম্প্রসারক, তাহার উপরে তাঁহার নিত্যকালের সাহিত্যিক-সমাজে স্থান নির্ভর করিবে।

গৃহদাহে আমরা দেখিতে পাই যে, শরৎচন্দ্র জীবন্তের সংগ্রামে সমস্যার সৃষ্টি করিয়া, তাহার স্বাভাবিক পরিণতির কল্পনা করিয়াছেন। তাহার কাল্পনিক সমস্যার ভিত্তি তিনি সর্ব্বত্রই চরিত্রের প্রাকৃতিক ধর্ম্মের উপর স্থাপন করিয়াছেন। অচলা, মহিম, সুরেশ প্রভৃতি সকল চরিত্রগুলিই পাঠকের কাছে জীবন্ত প্রতীয়মান হয়। এইরূপ চরিত্রের সহিত যেন আমাদের সকলেরই বাস্তব জগতে কিছু-না-কিছু পরিচয় আছে। কল্পনার চিত্রগুলিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করিবার এই স্বাভাবিক ক্ষমতা শরৎচন্দ্রকে অমর করিয়া রাখিবে। সাহিত্য-রস আমাদিগকে ভাবাপ্লুত করে—আমরা আনন্দ পাই।

* Hamlin Garland.

আখ্যায়িকা পড়িতে পড়িতে আমরা যতই অগ্রসর হই, ততই যেন চরিত্রগুলির সহজ বিকাশ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে। ইহাই হইল সাহিত্যের অমর রূপ।

শরৎচন্দ্রের শিল্পকলায় আমরা দেখিতে পাই যে, রচনার অধিকাংশে তিনি কর্ম্মধারা ও কথোপকথনের ভিতর দিয়া চরিত্র সকলের অন্তর্নিহিত মূল বৃত্তিগুলির বিকাশ করিয়াছেন। এই যে কর্ম্মধারায় চরিত্র ও আখ্যায়িকা গড়িয়া তোলা, ইহা সাহিত্যিকের বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচায়ক: কারণ এই পদ্ধতি চরিত্রের মূল শক্তিকে কর্ম্ম সংঘাতে পাঠকের কল্পনায় পরিস্ফুট করিয়া তোলে। বিশ্লেষণ এবং বিবৃতি পন্থায় পাঠকের কল্পনার কোন অবসর দেওয়া হয় না,—তাহাদিগকে সব কিছুই বলিয়া দেওয়া হয়। ফলে, পাঠকের হৃদয়ে আনন্দরসের উৎস সুপ্ত রহিয়া যায়, এবং ভাবাত্মক রসের অনাস্বাদে আখ্যায়িকা তেমন চিত্তাকর্ষক হয় না। "তোমার ওপর যে কত বড় শ্রদ্ধা ছিল, মহিম, তা বল্‌তে পারি না। * * * সে শ্রদ্ধা বুঝি আর থাকে না। শেষকালে কিনা একটা ব্রাহ্ম মেয়ের কাছে ধরা দিলে। * * * যখন তোমাকে ফাঁদে ফেলেছেন—নিতান্ত কচি হবেন না। * * * তোমাকে আমি যত ভালবেসেছি, তুমি তার অর্দ্ধেকও পার নাই।" এই কয়টি কথাতেই যেন সুরেশের নগ্ন চরিত্র আমাদের চক্ষে ভাসিয়া উঠে। সে যে কত শীঘ্র তাহার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারে, তাহা আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। যে মহিমের জীবনরক্ষার্থে সে নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়াছিল, তাহার ব্রাহ্ম পরিবারে বিবাহের সম্ভাবনায় সে বন্ধুত্ব বুঝি আর থাকে না! যে অচলাকে সে কখনও দেখে নাই, না

জানিয়াই তাহার সম্বন্ধে অতি হীন ধারণা করিয়া বসিল। তাহাকে 'শিকারী প্রাণী' পর্য্যন্ত বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিল না। সুরেশের অসংযত চরিত্রের প্রথম নিদর্শন লেখক দেখাইলেন। আবার অচলার সহিত প্রথম পরিচয়ে, সেই 'শিকারী প্রাণী'-কেই প্রাণের সমস্ত আবেগ দিয়া সুরেশ ভালবাসিয়া ফেলিল। মুহূর্ত্তে তাহার আজন্ম বন্ধু-প্রীতি বিদ্বেষে পরিণত হইল। "এখন দেখ্‌ছি তাকে (মহিমকে) বাঁচানোর চেয়ে আপনাকে (অচলাকে) বাঁচানো আমার ঢের বেশী কর্ত্তব্য। * * * কারণ আপনি ঝাঁপ দিচ্ছেন অন্ধকারে।" সুরেশের অসংযত চরিত্র নীচতার চরম মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইল। এই কয়টি রেখাঙ্কনের পরে, পাঠক নিঃসংশয়ে সুরেশের চরিত্রের সঠিক ধারণা করিতে পারিলেন। সুরেশের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে তাহার চরিত্রের এই মূল শক্তির স্বাভাবিক বিকাশই দেখিতে পাওয়া যায়।

প্রথম সাক্ষাতে সুরেশের উন্মত্ত প্রলাপ অচলা অপ্রতিবাদে শুনিয়া যাইতেছিল। মহিমের পল্লীবাস, কপটতা ও হীন আথিক অবস্থা প্রতিপন্ন করিতে যখন সুরেশ শতমুখে মহিমের নিন্দা করিতেছিল, অচলা নিঃশব্দে সমস্ত শুনিয়া গিয়া মাত্র দুই একটা কথায় বুঝাইয়া দিল যে, মহিম তাহার কাছে কিছুই গোপন করে নাই এবং অচলা তাহার চরিত্রে শ্রদ্ধাসম্পন্না ও আকৃষ্টা। "তিনি (মহিম) ত কখনই মিথ্যা বলেন না। * * * আপনি যা ব'ল্‌লেন আমিও ঐটুকু জানি। * * * তিনি শুন্‌লে কি দুঃখিত হবেন না?" ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত উক্তিতে অচলার স্নিগ্ধ, শান্ত ও মৃদু চরিত্র যে মহিমের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় ও ভালবাসায় আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা পাঠক স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মহিমের নিন্দাবাদ সে যে

বিনা প্রতিবাদে শুনিয়া গেল; তাহাতে অচলার চরিত্রের দুর্ব্বলতাও পাঠকের নিকট গোপন রহিল না। চরিত্রের পরবর্ত্তী বিকাশে এই দুর্ব্বলতার সূত্র অবলম্বন করিয়া দুঃখের বন্যা আসিল। অচলার আবেষ্টন যদি শক্তিশালী হইত, হয়ত দুর্ব্বলতার প্রায়শ্চিত্ত হইতে সে নিস্তার পাইত। কিন্তু সে সুযোগ তাহার ছিল না। পরিচয়ের প্রথম নমস্কারের পরেই সুরেশ কেদারবাবুকে, মহিমের স্ত্রী-পুত্র পালনের ক্ষমতা আছে কি না এবং "বিরুদ্ধ হিন্দু সমাজের মধ্যে ভাঙ্গা মেটে বাড়ীতে * * (অচলা) বাস করিতে পারিবে কিনা" জিজ্ঞাসা করিলে "উঃ! কি ভয়ানক, এমন লোকের মনের মধ্যেও এত বিষ ছিল! অ্যাঁ।" বলিয়া দারিদ্র্যের আভাসে বিনা অনুসন্ধানেই কেদারবাবু এক গাল হাঁ করিয়া ফেলিলেন। কেদারবাবুর চরিত্রের প্রথম অংশ পরিস্ফুরণে এই তুলিকাক্ষেপেই যথেষ্ট হইল। সঙ্কীর্ণমনা ও অস্থিরমতি পিতার স্নেহে প্রতিপালিতা অচলার মধ্যে যে স্থিরসঙ্কল্প ও আত্মরক্ষাশক্তি ছিল না, ইহা আর বিচিত্র কি?

স্থির, সংযত ও নিঃশব্দ চরিত্র মহিম পল্লীভবন হইতে ফিরিয়া আসিয়া হঠাৎ দেখিতে পাইল যে, তাহার ব্রাহ্মবিদ্বেষী বন্ধু সুরেশ, সযত্নে অচলার হাত ধরিয়া গাড়ী হইতে তাহাকে নামাইতেছে। অচলা বলিল, 'উনি বাবার চার হাজার টাকা দেনা শোধ ক'রে দিয়েছেন।' কিন্তু পরদিন যখন মহিমের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখিয়া অচলা কেবলমাত্র তাহার জন্য পাখার ব্যবস্থা করিল, তখন 'সেই বাতাসে তাহার (সুরেশের) সর্ব্বাঙ্গ পুড়িয়া যাইতে লাগিল।' এইরূপ পাখা খুলিয়া দেওয়া, মহিমকে চা-পান করিতে না দিয়া তাহার জন্য সরবতের ব্যবস্থা করা, মহিমকে ডাক্তার আনার অজুহাতে, প্লেগের রোগীর কাছে যাইতে না দেওয়া, 'যেখানে

বাধা দেবার আমার সম্পূর্ণ অধিকার, সেখানে আমি বাধা দেবই' 'যাকে এক সময় বাঁচানো যায়, আর এক সময় ইচ্ছা ক'র্‌লে বুঝি তাকে খুন করা যায়?' প্রভৃতি ছোটখাটো কার্য্যকলাপ ও কথায় অচলার স্বাভাবিক প্রাণ যে একান্তে মহিমকেই আশ্রয় করিয়াছিল, তাহা বুঝা যায়।

উত্তেজনার ও বিস্ময়ের এতগুলি কারণ বর্ত্তমান সত্ত্বেও 'মহিম ভাল-মন্দ কোন কথা কহিল না।' অচলার আংটিটি আঙ্গুলে পরিয়া এবং তাহার নির্ভর প্রণাম গ্রহণ করিয়া, 'ধীরে ধীরে নামিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল। * * * তাহার মুখ দেখিয়া কাহারও বলিবার সাধ্য ছিল না, যে ঠিক সেই সময়েই তাহার সমস্ত প্রাণটা, যন্ত্রণায় বাহিরে আসিবার জন্য তাহারই হৃদয়ের দেওয়ালে প্রাণপণে গহ্বর খনন করিতেছিল।' সংযমের কঠিন বাঁধ ভেদ করিয়া, মহিমের প্রাণের স্বতঃশক্তি কখনও আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। বিবাহের পরও প্রথম ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সময়, মহিমের চরিত্র তাই অচলার নিকট রহস্যময় হইয়াই রহিল। চরিত্রের প্রাণহীন স্থৈর্য্য জীবনে দুঃখের আবর্ত্ত গভীরতম করিয়া তুলিল।

উল্লিখিত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে দেখা যায় যে, চরিত্র সকলের কর্ম্মপন্থার দুই চারিটি তুলিকা-নির্দ্দেশে, লেখক অন্তর্নিহিত মূল শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, সংঘাতে যে ঐ সকল শক্তির স্বাভাবিক গতি ও পরিণতি কি হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "Great literature must exhibit the great possibilities and exertions of human nature, i.e. strong passion, strong will, depth and breadth of experience." 'মৃণাল লণ্ঠনের আলোকে, আর একবার অচলার মুখখানি দেখিয়া লইয়া বলিল,

"নাঃ—তুমিই জিতেছ সেজ্‌দা। আমাকে বিয়ে ক'র্‌লে ঠকে মরতে ভাই। * * * (অচলার প্রতি) মাইরি বলচি, ভাই, তামাসা নয়। আচ্ছা তোমার বরকেই জিজ্ঞেস কর,—আমাকে এক সময় উনি পছন্দ ক'রেছিলেন কি না!"

* * * *

'ওরে যদু (চাকর), ঘোষাল মশাই (মৃণালের স্বামী) গেলেন কোথায়?........অ্যাঁ, এই অন্ধকারে পুকুরে? মৃণালের হাসিমুখ এক মুহূর্ত্তে দুশ্চিন্তায় ম্লান হইয়া গেল।.. বুড়ো মানুষ এখুনি অন্ধকারে পিছ্‌লে প'ড়ে হাত-পা ভাঙ্গবে।...

'(অচলাকে) কি কপাল ক'রেছিলুম ভাই ঠান্‌দি, কোথাকার একটা বাহাত্তুরে বুড়ো ধ'রে আমাকে দিলে,—তার সেবা করতে করতে আর তাকে সামলাতে সামলাতেই প্রাণটা গেল!'

এই সংক্ষিপ্ত গুটিকয়েক রেখাপাতে, লেখক মৃণালের চরিত্র পাঠকের চক্ষে ভাস্বর করিয়া তুলিলেন। সরলতা ও আন্তরিকতার প্রতিচ্ছবি রূপে তাহাকে দেখা গেল। সংস্কার-বিশ্বাসী মৃণাল হাসিমুখে বৃদ্ধ স্বামীকে দৈবের দান বলিয়া মানিয়া লইয়া প্রফুল্ল মনে তাহারই সেবা ও মঙ্গল-কামনাকে আত্মধর্ম্ম বলিয়া জীবনে বরণ করিল। শুধু তাই নয়, আখ্যায়িকার মধ্যে মৃণালের চরিত্রে যে সেবাব্রত ও সংযম আমরা দেখিতে পাই, যাহার আকর্ষণে কেদারবাবু সম্পূর্ণ মোহিত হইয়া তাহাকে কন্যাস্থানে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহার প্রভাব অচলার হৃদয়ে সেবাব্রত ও নারীধর্ম্মের অমর শক্তি জাগাইয়া তুলিয়াছিল এবং যে শক্তির মহত্ত্বের সম্মুখে বন্যপ্রকৃতি সুরেশ পর্য্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধায় মাথা নত করিয়াছিল, সেই মহীয়সী শক্তির সহজ রূপও আমরা শিল্পীর প্রথম

অঙ্কনেই দেখিতে পাই। মৃণালের চরিত্রশক্তির উৎসে একাধারে কেদারবাবু, অচলা, এমন কি সুরেশ পর্য্যন্ত অমৃতের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

সমস্যার সৃষ্টি ও তাহার পরিণতিতেও লেখক ঐরূপ চরিত্র সকলের স্বাভাবিক গতি ও কর্ম্মধারার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। শান্ত, স্থির চরিত্রের অনাবিল গতিতে তিনি অকস্মাৎ বিরুদ্ধ শক্তির সংঘর্ষে প্রলয়ের তুফান সৃষ্টি করিয়াছেন, আবার ঝঞ্ঝা শেষে স্বাভাবিক নিয়মেই প্রলয়ের বক্ষে শান্তি ও স্থৈর্য্য স্থাপন করিয়াছেন। ভালবাসার উদ্দাম আবেগ লইয়া ব্রাহ্ম পরিবার হইতে মহিমকে উদ্ধার করিতে সুরেশ অচলার সম্মুখীন হইল। অচলার স্নিগ্ধ, শান্ত ও সংযত চরিত্রের সংস্পর্শে আসিয়া সহসা আবেগের গতি রূপান্তরিত হইল এবং প্রবল স্রোতে সেই অচলাকেই সে উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। সমস্যার সৃষ্টি হইল। মজ্জমান তরী তীরের নিশানা পাইয়া যেমন সমুদ্রের উদ্বেল বক্ষ হইতে নিরুদ্বেগে তীরে ফিরিয়া আসে, তেমনই অচলার প্রাণে মহিমের শান্ত, স্নিগ্ধ ও সংযত চরিত্রের আকর্ষণে পথের নির্দ্দেশ মিলিল ; সে মহিমকেই জীবনে বরণ করিয়া নির্ভরে স্থির হইতে চাহিল। বিবাহ হইয়া গেল।

পতিগৃহের আবেষ্টনে, পল্লীপড়শীদের অনুদার মন্তব্যে, স্বামীর প্রাণহীন স্থৈর্য্য ও অবিশ্বাসের ফলে আবার অচলার চরিত্রের বন্ধন শিথিল হইয়া আসিল,—মন তাহার অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। আবর্ত্তনের এই সন্ধিক্ষণে দুষ্টগ্রহের মত সুরেশ তাহার বিদ্রোহের প্রলয় বহ্নি লইয়া সেই পল্লীভবনে আসিয়া জুটিল। সে বহ্নির দহনে প্রথম প্রণয়-নীড় ভস্মীভূত হইল। সমস্যাও জটিলতর হইয়া উঠিল। সমাধান

দৃষ্টির বহির্ভূত। কিন্তু মহিমের কঠিন ব্যাধির করুণ সূত্র অবলম্বনে, পিসীমার স্নেহশীলতা ও মৃণালের আন্তরিক সেবামাধুর্য্যে আবার অচলার স্বাভাবিক নারীচরিত্র জাগিয়া উঠিল। দুর্ব্বলতার অবকাশে ও আন্তরিক পরিচর্য্যার প্রভাবে মহিমের অন্তঃসঞ্চারী ভালবাসার ফল্গুপ্রবাহ সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া আত্মপ্রকাশ করিল। দগ্ধ নীড়ের দুইটি প্রাণী আবার প্রণয়ের আকর্ষণে মিলিত হইল। বুঝিবা সমস্যার পুনরায় সমাধান হইল।

কিন্তু কালবৈশাখীর বক্ষে যে ঝঞ্ঝার উদ্দাম শক্তি অন্তর্নিহিত থাকে তাহা অতর্কিতে প্রলয়েব সৃষ্টি করে। একান্তে মিলনোন্মুখ দুইটী প্রাণ মিলনের পূর্ব্বক্ষণেই সুরেশের গুপ্ত আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সব যেন একেবারে নিঃশেষ হইয়া গেল। পুনরায় সমস্যা এতই ঘনীভূত হইয়া উঠিল যে, সমাধানের কোন আশাই রহিল না। মনে হইল, অধঃপাতের পথে যখন অতদূর পর্য্যন্ত অচলা নামিয়া গিয়াছে তখন সে পথের শেষ পর্য্যন্ত তাহাকে পৌছাইতেই হইবে।

লেখক আবেষ্টন এত সুদৃঢ় করিয়া সৃষ্টি করিলেন যে, অচলার মনের বিদ্রোহ সঙ্কল্পে পরিণত করিবার কোনই সুযোগ রহিল না। দুর্ব্বলতার প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সেই বিষময় পরিস্থিতি তাহাকে মানিয়া লইতে হইল। লেখকের শিল্প-চাতুর্য্যে, সুরেশের সাংঘাতিক রোগ ও নিঃসহায় অবস্থায় যেন অচলার পক্ষে এই মানিয়া লওয়াটা পাঠকের নিকট অস্বাভাবিক মনে হইল না।

ডিহিরীতে অবস্থান কালে অতি মধুর ও মর্ম্মস্পর্শী পরিহাস সৃষ্টি করিয়া অচলার স্বাভাবিক মনখানি পাঠকের নিকট লেখক উন্মুক্ত

রাখিলেন। তাহার অনুশোচনার তীব্র বেদনা পাঠকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিল। লোকচক্ষে সে সুরেশের বিবাহিতা স্ত্রী! রামবাবু ও 'রাক্ষুসী'র সহজ স্নেহ ও সারল্যে এই পরিহাসের বেদনা তীব্রতর হইয়া পাঠকের সহানুভূতি অচলার উপর নিবদ্ধ রাখিল। রামবাবু ও তাহার পরিবারের সকলে মনে করিতেছিলেন যে, অচলা ও সুরেশের স্বেচ্ছাপ্রণয়-মিলনে তাহারা আত্মীয় আশ্রয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। এই ধারণায় তাঁহারা আরও করুণা ও প্রীতিতে অচলার প্রাণে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু এই সরল স্নেহ ও বিশ্বাস অচলার প্রাণের মিথ্যা আবরণের গ্লানিকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছিল। এই ঘৃণিত আবরণের বিষাক্ত প্রলেপ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে জর্জ্জরিত করিলেও, চরিত্রগত স্বাভাবিক দুর্ব্বলতায় অচলার শক্তি ছিল না যে, আবরণ ছিন্ন করিয়া আত্মপ্রকাশ করে। মৃণালের সংস্পর্শে আসিয়া কেদারবাবু স্বীয় ভুল বুঝিতে পারিলেন। অনুশোচনায় অস্থির হইয়া তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, 'আমার বুক যে ফেটে গেল। আর যে আমি সহ্য করিতে পারি না, মা।' এই স্বীকারোক্তির সহিত যেন তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইল। তিনি যখন মৃত্যু ভিন্ন আর কোন উপায় দেখিতে পাইতেছিলেন না, তখন হাতের পার্শ্বেই মুক্তির পথ উন্মুক্ত দেখিলেন। ক্ষমায় তিনি শান্তি পাইলেন। কিন্তু অচলার প্রায়শ্চিত্তের শেষ ছিল না। তাহার নীরব বুকফাটা অনুশোচনা পাঠকের মনে গভীরতর সহানুভূতি জাগাইয়া তুলিতেছিল। অন্তরের তীব্র যাতনা তাহাকেই নীরবে সহ্য করিতে হইতেছিল। শুধু তাহাই নয়, মুখে সে যন্ত্রণা কণামাত্র প্রকাশ করিবার উপায়ও তাহার ছিল না। যাহার নিঃশ্বাসে তাহার সমস্ত শরীর বিষাইয়া উঠিত, সেই সুরেশের স্ত্রীর

ভূমিকা তাহাকে অভিনয় করিতে হইতেছিল। তাহার প্রায়শ্চিত্ত ও অনুশোচনার গভীরতা কল্পনার অতীত।

অভিনয় ও পরিহাসের এই চরম ক্ষণে অচলা বুঝিতে পারিল যে, তাহার প্রাণহীন দেহের তিক্ততায় সুরেশ বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিতেছিল। তাই অভিনয়কে সত্যের রূপে ফুটাইয়া তুলিবার শেষ চেষ্টায়—ধনী গৃহিণীর বেশে অচলা সুরেশের স্ত্রীর ভূমিকায় নূতন জুড়িতে তাহারই সহিত সেইদিনই প্রথম রামবাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে আসিল। পরিহাসের এই চরম মুহূর্ত্তে—সেই বেশে—মহিমের সহিত তাহার অপ্রত্যাশিত সাক্ষাৎ হইল। অভিনয় ও ছদ্মবেশ খসিয়া পড়িল,—সে মূর্চ্ছিতা হইল। মূর্চ্ছার সহিত কপট সুরমা মরিল, অনুশোচনার ও আত্মগ্লানির করুণ মূর্ত্তিতে নিপীড়িতা ও সর্ব্বহারার মত অচলা জাগিয়া উঠিল।

ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির যেমন আবরণ নিম্নে আত্মশক্তি লুক্কায়িত থাকে, লোপ হয় না; বায়ুর অনুকূল স্পর্শে আবার তাহার দাহিকাশক্তির বিকাশ হয়,—তেমনিই চরিত্রের অন্তর্নিহিত মূলশক্তি প্রতিকূল আবেষ্টনে মলিন ও মৃতপ্রায় হইলেও কখনও আত্মধর্ম্ম ত্যাগ করে না,—কারণ অগ্নির দাহিকাশক্তির মত উহা তাহার স্বধর্ম্ম। সুরেশ পাশবিকতায় অচলাকে অধিকার করিলেও আত্মিক ধর্ম্ম অচলাকে ত্যাগ করে নাই। পাপমেঘের অন্তরালে লুপ্ত চন্দ্রের মত বহিশ্চক্ষুতে সে শক্তি অস্তমিত বোধ হইল; কিন্তু রাক্ষুসীর আশ্রয়ে, রামবাবুব স্নেহ-নির্ঝরে, মৃণালের আদর্শে ও পিসীমার আশীর্ব্বাদে ম্রিয়মাণ শক্তি ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হইতেছিল। অনুকূল বাতাসের স্নিগ্ধ স্পর্শে ধীরে ধীরে মেঘ কাটিয়া গেল,—মেঘমুক্ত চন্দ্রের মত আবার সেই শক্তি অচলার ভিতর

জাগিয়া উঠিল। লেখকের সুনিপুণ অঙ্কনে, আলো ও ছায়ার মৃদু সন্নিপাতে, পাঠকের সহানুভূতি অচলার উপর ফিরিয়া আসিল। পাপ নিজের আগুনে পুড়িয়া ভস্ম হইল।

চরিত্র সংঘাতে যে সমস্যার সৃষ্টি, তাহার সমাধান ও পরিণতিতে, গৃহদাহ আখ্যায়িকাটি পরিসমাপ্ত হইল। চরিত্র শক্তির স্বতঃস্ফুরণ ও পরিণতিতে রচনাটি স্বাভাবিক অবয়বে পরিপুষ্ট; কিন্তু ব্যক্তিত্বের অনিবদ্ধ স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করা সম্ভব নয়। সামাজিক জীবনপ্রবাহে, ব্যক্তির যে বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়, সেই বৈশিষ্ট্যকে আমরা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য মনে করি। শুধু ঐ বৈশিষ্ট্যটুকু ভিন্ন ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনের যে একত্ব, তাহা আমাদের আপাতঃ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে চিরপ্রবাহমান সামাজিক জীবন হইতে ব্যক্তি-জীবনের কোন পৃথক্ সত্তা নাই। ঐ যে বৈশিষ্ট্য, উহাই আমাদের ব্যক্তি সম্বন্ধে একটা পৃথক্ সত্তার ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দেয়। শরৎচন্দ্রের গৃহদাহে আমরা দেখিতে পাই যে, ব্যক্তি বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতে উদ্ভূত জীবন-সমস্যার প্রতিক্রিয়া সামাজিক আদর্শে দেখা দিয়াছে। যে নিয়মে বক্ষঃস্থ লহরীগুলি সাগর বারি হইতে পৃথক্ নয় এবং বৃক্ষের শাখাগুলি কাণ্ড হইতে পৃথক্ নয়, সেই নিয়মেই সমাজবক্ষে সমুদ্ভূত ব্যক্তি সমাজ হইতে স্বতন্ত্র নয়। প্রতিভাশালী শরৎচন্দ্রের রচনায় তাই ব্যক্তিগত জীবন সমস্যার সৃষ্টিতে সামাজিক সমস্যা আপনা আপনি আসিয়া পড়িয়াছে।

আপাত দৃষ্টিতে আখ্যায়িকার শেষাংশে, রামবাবুর যুক্তিতর্ক এবং মৃণালের স্নেহনীড়ে কেদারবাবুর সামাজিক ও ধর্ম্মতত্ত্ব বিচার যেন কথা-সাহিত্যের রূপে বিকশিত না হইয়া দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা

রূপে প্রতীয়মান হয়। মনে হয়, যেন লেখক এই দুইটি চরিত্র অবলম্বন করিয়া সমাজতত্ত্বের দার্শনিক বক্তৃতা দিতেছেন। কিন্তু একটু মনঃসংযোগে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ব্যক্তিগত চরিত্রবৈশিষ্ট্যের সংঘর্ষে যে সমস্যার সৃষ্টি হয়, সে সমস্যার পরিণতি শুধু মাত্র ঐ কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রে নিবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়,—ব্যাপক সমাজে তাহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। তাই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে, ঐ কয়েকটি চরিত্রের আবেষ্টনেই তাহাকে নিবদ্ধ রাখিতে গেলে সমাধান অসমাপ্ত ও অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। চরিত্র সকলের স্বতঃস্ফূরণ ও পরিণতিতে সামাজিক মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হইল এবং সামাজিক জীবন প্রবাহে ঐ সকল চরিত্রধারা নির্ব্বিশেষে মিলিত হইল কিনা, তাহা দেখিতে হইবে। কারণ, এই মিলন স্বাভাবিক না হইলে, জীবন অপরিপূর্ণ রহিয়া যায়। কাণ্ডছিন্ন বৃক্ষশাখার মত চরিত্রে জীবন স্পন্দন থাকে না।

আপাত সুবিধার মোহে আকৃষ্ট হইয়া কেদারবাবু সমাজ ত্যাগ করিয়াছিলেন। মাতৃস্তন্যের মত সঞ্জীবনী সুধা পান করাইয়া, সমাজ যে ব্যক্তিগত জীবনকে পরিপুষ্ট ও সবল রাখে, এ সত্যের উপলব্ধি তখন তিনি করিতে পারেন নাই। জীবনের শেষভাগে, দুঃখের চরম মুহূর্ত্তে, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, টবের গাছটি যতই সুযত্ন-বর্দ্ধিত হোক্ না কেন, প্রতিযোগিতায় সে কখনও উদ্যানস্থ বৃক্ষের সমকক্ষ হইতে পারে না,—একটা স্বাভাবিক দৌর্ব্বল্য তাহার থাকিয়াই যায়। বিশেষতঃ, ‘কোন বস্তুকেই পরিত্যাগ আমরা প্রীতির ভিতর দিয়া, প্রেমের ভিতর দিয়া করি না।’ অতএব যে সমাজকে তিনি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যবশতঃ তাহার ভাল করিবার

ক্ষমতাটুকু তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছিল। 'জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে' তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, যে-সকল যুক্তিতর্ক অবলম্বনে তিনি ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই যুক্তিসকলের মধ্যে প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসা ছিল না। সেইজন্যই তাহাকে 'মস্ত কৈফিয়তের দায়ে ঠেকিতে হইল।' তিনি আজ বুঝিতে পারিলেন যে, সমাজের দোষ ত্রুটি থাকিলেও, তাহার যে ভাল করিবার ক্ষমতা আছে, তাহার সুযোগ 'মাথা খুঁড়ে ম'লেও অন্যত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না'! সহস্রাধিক যুগের শিক্ষা, দীক্ষা, 'আপনা-আপনি অতি সহজেই জলচর পাখীর জন্মেই সাঁতার দেওয়ার মত, সমাজের ক্রোড়ে প্রতিপালিত ব্যক্তি সহজেই পাইয়া থাকে। স্বভাবতঃই সে যাহা পাইয়া থাকে, সমাজের বাহিরে বৰ্দ্ধিত ব্যক্তির সে শিক্ষা জন্মজন্মান্তরেও হয় না। শিক্ষার এই অভাব তাহার চরিত্রে যে দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করে, 'কোন-না-কোন আকারে সে দুঃখ তাহাকে বহিতেই হইবে।' সত্যের এই স্বরূপ আজ দুঃখের চরম বেদনায় কেদারবাবু অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন। তাহার প্রায়শ্চিত্ত আসিল ; শুধু তাহা নিজের অনুশোচনায় নহে, স্নেহের নিধি একমাত্র কন্যার দুঃখের তীব্র পীড়নে সে অনুশোচনা মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিল।

দুর্ব্বলতাকে অবলম্বন করিয়া স্নেহান্ধ পিতৃবক্ষের একমাত্র অবলম্বন অচলার চরিত্রে যে দুঃখের বন্যা আসিয়াছিল, আশ্রয়স্থল সেই পিতারই অনুশোচনায়, যেন সে দুর্ব্বলতা পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। পিতার প্রায়শ্চিত্তের সঙ্গে, ঠিক একই সময়ে কন্যারও অনুরূপ অনুশোচনায় চরিত্র দৌর্ব্বল্য দগ্ধ হইতেছিল। অনুশোচনার করুণ-সূত্র ধরিয়া, লেখক নায়িকার প্রতি পাঠকের সহানুভূতির পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিলেন,—নায়িকাকে ক্ষমার্হ করিয়া তুলিলেন। কেদারবাবুর অতীত ভুলভ্রান্তি-

গুলি, খামখেয়ালী শিশুর মাতৃনিষেধ না মানিয়া অগ্নিতে হাত দিয়া দহন যন্ত্রণার চীৎকারের মত। যন্ত্রণায় রোরুদ্যমান শিশুর আকৃতিতে, মায়ের যেমন আর সন্তানের অবাধ্যতার কথা মনে থাকে না, তেমনই দুঃখক্লিষ্ট কেদারবাবুর অনুশোচনায়, পাঠকের মন তাঁহার এবং অচলার প্রতি সমবেদনাপ্লুত হইল। অপরাধের কথা পাঠকের আর মনে রহিল না। কারণ, অচলার যে চারিত্রিক দুর্ব্বলতা অবলম্বনে দুঃখের ঝড় উঠিয়াছিল, তাহার জন্য 'যে সমাজ ও সংস্কারের মধ্যে শিশুকাল হইতে সে মানুষ হইয়াছে' সেই সমাজই দায়ী। 'সর্ব্বদিক্ সর্ব্বকাল ব্যাপিয়া মানব চরিত্রে পাশবিক মত্ততা চিরদিন অনন্ত ও অক্ষয় হইয়া রহিবে;' সামাজিক ও নৈতিক আদর্শই তাহাকে নীতিসূত্রে বাঁধিয়া সুস্থির ও মঙ্গল আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে পারে। কিন্তু যে সমাজে অচলা বাড়িয়াছে, তাহাতে ত্যাগের আদর্শ ছিল না। 'বিলাসের প্রতি বিরাগ নয়, অনুরাগকেই উত্তরোত্তর প্রচণ্ড হইতে দেখিয়াছে। সে দেখিয়াছে, শুধু পরের অনুকরণে গঠিত ঘরের সমাজটাকে।' কিন্তু উহাতে জাতীয় বৈশিষ্ট্য না থাকায়, তাহা অচলার প্রাণ স্পর্শ করিতে পারে নাই,—সে ভোগকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া মানিয়া লইতে পারিতেছিল না। অচলার চরিত্রে স্বাভাবিক স্থৈর্য্য, ধীর বিচারবুদ্ধি ও শান্তশীলতা সত্ত্বেও বিজাতীয় অনুকরণে গঠিত সমাজে বাস করায় সঙ্কল্পের দৃঢ়তা তাহাতে জন্মায় নাই,—চিত্ত তাহার দুর্ব্বল রহিয়া গেল। যাত্রাপথে জাতীয় সমাজবাসী পিসীমা, রামবাবু, রাক্ষুসীর নিকট-সংস্পর্শে আসিয়া তাহার চরিত্র দৃঢ়তর হইতেছিল। লেখকের শিল্প-কৌশলে প্রতিভাত হইল যে, সে দুর্ব্বলতা যেন অচলার নিজের নয়, তাহার পিতা কেদার-বাবু ও তাঁহার সামাজিক শিক্ষা-দীক্ষাই ইহার জন্য দায়ী।[৮]

সাগরবক্ষে কূলহারা তরীর মত, ধর্ম্মহীন চরিত্র যতই সবল ও সুন্দর হউক না কেন, প্রতিকূল ও উদ্দাম সমুদ্রের ঘাত-প্রতিঘাতের হাত হইতে তাহার নিস্তার থাকে না,—কূলে ফিরিয়া আসিয়া সুস্থির হইতে হইলে, জীবন-তরীতে শক্ত নোঙর ও আশ্রয়-কূল অবলম্বন প্রয়োজন। আজন্ম সামাজিক শিক্ষায়, মৃণাল বিবাহকে জীবন-ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। যাহাদের কাছে বৈবাহিক সম্বন্ধটা একটা সামাজিক বিধান মাত্র, তাহারা যুক্তিতর্কে ও মতামতে সেই বিধানের অদল-বদল করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দু নারী শিশুকাল হইতেই এই বন্ধনকে আত্মিক ধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া চলেন। তাই, স্বামী তাহাদের নিকট 'নিত্য'—'জীবনেও নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য'। সুবিধাবাদে বা স্বেচ্ছা-মতামতে, উহার কোন পরিবর্ত্তনের কল্পনা আসিতে পারে না। এই বিধানকে যাহারা ধর্ম্ম বলিয়া অন্তরের সহিত স্বীকার করিতে পারেন নাই, তাহাদের শিক্ষা-দীক্ষা, বিচার-বুদ্ধি যতই উৎকৃষ্ট হউক না কেন, কূলহারা তরীর মত, আবর্ত্ত-বিপাকে একদিন-না-একদিন তাহাদিগকে বিপর্য্যস্ত হইতেই হইবে। কারণ, প্রতিকূল আবেষ্টনের সহিত যুঝিবার মত শক্তি এইরূপ চরিত্রে থাকিতে পারে না।

দুর্ব্বলতার সুযোগে সুরেশের যে পাশবিকতা অচলাকে সম্পূর্ণ গ্রাস করিল, তাহার হাত হইতে একমাত্র অত্যাজ্য সতীধর্ম্ম তাহাকে রক্ষা করিতে পারিত। 'বাহাত্তুরে বুড়ো'র হাতে পড়িয়া দারিদ্র্যের মর্ম্মান্তিক নিপীড়ন ও মুমূর্ষু বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা ও শুশ্রূষার ভার মৃণাল বিবাহসূত্রে পাইয়াছিল। আর্থিক, দৈহিক সুখ ও বিলাসের লেশমাত্র স্থান সে বিবাহে ছিল না, কিন্তু মৃণাল জানিত যে, জীবনে ও মরণে উহাই তাহার 'অদ্বিতীয় নিত্য'। সেই বিধানে তাহার মতামতের

কোন স্থান ছিল না। কারণ, ইহা তাহার ধর্ম্ম। ধর্ম্মে এই অটল বিশ্বাস, মৃণালের চরিত্রভিত্তি এতই সুদৃঢ় করিয়া গাঁথিয়াছিল যে, সুরেশের পাশবিকতাও সম্ভ্রমে তাহার সম্মুখে মাথা নত করিয়াছিল। কিন্তু অচলার সে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না, কেন না, বিবাহটা তাহার নিকট একটা বিধান মাত্র। ধর্ম্মে এই স্বতঃ বিশ্বাসের অভাবই অচলার অস্থির সঙ্কল্পের কারণ। মহিমকে সে স্বেচ্ছায় পতিত্বে বরণ করিয়াছিল ; কিন্তু জীবনে নিত্যবস্তু-রূপে তাহাকে গ্রহণ করিতে পারে নাই। যে স্বেচ্ছা-অনুপ্রেরণায় তাহাকে বরণ করিয়াছিল, তাহারই তাড়নে আবার তাহাকে ত্যাগ করিতেও বিশেষ কোন বাধা ছিল না। স্বামীকে অত্যাজ্য নিত্য ধর্ম্মরূপে জানিবার শিক্ষা সে পায় নাই। যে আসুরিক শক্তি মৃণালের নিকট সম্ভ্রমে মাথা নোয়াইয়াছিল, দুর্ব্বলতার সুযোগে তাহাই আবার অচলাকে গ্রাস করিল।

কিন্তু অচলার নারী-স্বভাব মহিমের পায়ে নিঃশেষে তার সর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়াছিল। অন্তরের স্বাভাবিক দান, নারীর প্রতিগ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকে না। পিতার কুশ্রী সন্তানটিকেও তিনি ভালবাসেন —পিতার ইহা আত্মিক ধর্ম্ম। অপরের সুশ্রী ছেলেটিকে দেখিয়া তিনি হয়ত ক্ষণিক মুগ্ধ হইতে পারেন, কিন্তু তাহা ঐ ক্ষণিকের জন্যই। নিজ সন্তানের স্নেহে কখনও তাহাকে ভালবাসিতে পারেন না। তেমনই নারীর স্বাভাবিক প্রাণ একবার যাহাকে ভালবাসে, কোনও বৃহত্তর আকর্ষণে ক্ষণিকের তরে তাহা বিচলিত হইলেও, পর মুহূর্ত্তে তাহার নিজের প্রাণের দেবতাকেই গাঢ়তর প্রেমে আঁকড়াইয়া ধরে। নারী-ধর্ম্মের এই স্বাভাবিক প্রেরণায় অচলার প্রাণ একান্তে মহিমের প্রতিই আকৃষ্ট ছিল। এইজন্য পাশবিক উন্মাদনায় অচলাকে পথভ্রষ্ট করিয়া

তাহার মনশূন্য দেহটা সুরেশ যখন পাইল, সে পাওয়াতে তৃপ্তির সাধ মিলিল না; বরং বিরক্তি ও বিতৃষ্ণায় সুরেশের মন তিক্ত হইয়া উঠিল। সুরেশ বুঝিল, ঐ পাওয়াটা 'রবিকরে পল্লবপ্রান্তে শিশিরবিন্দুটুকুর' সৌন্দর্য্য আপ্রাণ উপভোগ করিবার জন্য, যেন হাতের মুঠার ভিতর তাহাকে লওয়ার মত। যখনই করায়ত্ত হইল, তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য নিমেষে অন্তর্হিত হইল, শুধু রাখিয়া গেল শৈত্যটুকু। তাহার প্রাণ বিতৃষ্ণায় ভরিয়া উঠিল। তাহার এই বিতৃষ্ণা অচলার মনে করুণার সঞ্চার করিল। 'তাহার মুখের প্রতি সে (অচলা) যখনই চাহিয়াছে, তখনই সমস্ত মনটি বিতৃষ্ণায় বিষ হইয়া গেছে।' কিন্তু ভোগে নিস্পৃহতায় তাহার প্রতি আবার অচলার করুণার সঞ্চার হইল। 'তুমি আমার যাই কেন না ক'রে থাক, আমার জন্য তোমাকে আমি মরতে দেবো না'। আখ্যায়িকার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় যে, যখনই অচলার মন সুরেশের প্রতি ক্ষণিক আকৃষ্ট হইয়াছে, সে শুধু তাহার পাশবিকতার মধ্যে দেবত্বটুক অবলম্বন করিয়া। মহিমের জন্য আত্মত্যাগে, অপরিচিত সুরেশের প্রতি সর্ব্বপ্রথম তাহার সম্ভ্রম জাগিয়াছিল, প্লেগ মহামারীর ক্ষেত্রে নিজপ্রাণ তুচ্ছ করিয়া, দগ্ধ গৃহ হইতে অপরকে রক্ষা করিবার চেষ্টায় জীবন বিপন্ন করায়, সে সম্ভ্রমের পুনরুদ্রেক হইয়াছিল। আবার দুঃখের এই চরম সীমায় যখন ভোগের তিক্ততায় সুরেশের মনে বিতৃষ্ণা আসিল, অচলা করুণায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। অচলার মধ্যে সাড়া না পাইয়া সুরেশের পাশবিকতা দিন দিন শক্তিহীন হইয়া পড়িতেছিল। নেশার তাড়নায় মদিরা ভ্রমে অচলার মধ্যে সে যাহা পাইল, তাহাতে মাদকতা আনিল না। তাহার পাশবিকতা তাই স্বাভাবিক নিয়মেই মৃত্যুমুখে অগ্রসর হইতেছিল।

প্রবৃত্তির সহিত সুরেশের মৃত্যু তাই অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িল। সুরেশের প্রণয় সম্ভাষণে অচলার দেহ অসাড় হওয়াও যেমন স্বাভাবিক, তেমনই মাদকতার তৃপ্তি না পাইয়া সুরেশের পশুত্বের মৃত্যুও অবশ্যম্ভাবী। সুরেশের অত্যাচার, অচলা দুর্ব্বলতা ও নিরুপায়ে সহ্য করিয়া আসিতেছিল,—নিয়তির অভিশাপরূপেই সে তাহা মানিয়া লইয়াছিল। তাই অত্যাচার সত্ত্বেও, অচলার সুরেশের প্রতি ঘৃণা, ক্ষোভ, দুঃখ কিছুই ছিল না। কোন কিছুর আশাও সে সুরেশের নিকট কোনদিনই করে নাই। সুরেশ মরিল,—পাশবিক প্রবৃত্তি লইয়া বাঁচিয়া থাকিবার কোন অবলম্বন না পাইয়াই সে মরিল। 'সুরেশ মরিয়াছে, লোভে নয়, ক্ষোভে নয়, দুঃখে নয়, ঘৃণায় নয়—ইহকালের পরকালের কোন কিছুর আশাতেই সে প্রাণ দেয় নাই, 'সে মরিয়াছে কেবল মরণটা আসিয়াছিল বলিয়াই।' চরিত্র শক্তির সহজ বিকাশ ও পরিণতিতে, দুর্ব্বলতার প্রায়শ্চিত্তে এবং অসত্যের বিনাশ শেষে, সত্যের প্রতিষ্ঠায় রচনাটি পরিসমাপ্ত হইল।

বিশ্বজীবন-প্রবাহে মানবত্ব দেব ও দানবের সম্মিলিত এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি। মানুষ একান্ত ভাবে দেবতা নয়, দানবও নয়। তাই ঘৃণিত পাশবিক চরিত্রে যদি দেবত্বের প্রভাব লক্ষিত হয়, তাহা অস্বাভাবিক নয়। আবার দেবচরিত্রেও পাশবিকতার ক্ষণিক প্রভাব তেমনই স্বাভাবিক। দেবদানবের এই চিরন্তন যুদ্ধে সত্যের বিকাশে অসত্যের তিরোধান—প্রকৃতির এক রহস্যময় বিধান। এই দ্বন্দ্বের পরিণাম চির প্রগতিশীল। অতএব মানুষ যদি পাশবিকতার প্রেরণায় কখনও অধঃপাতের শেষ স্তরেও উপনীত হয়,—সে করুণার পাত্র সন্দেহ নাই, কিন্তু ঘৃণার বস্তু নয়। কারণ, অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক দৈবশক্তির ঔৎকর্ষে নিতান্ত পাপিষ্ঠেরও আবার দেবত্বলাভের সম্ভাবনা থাকে;

করুণা ও ক্ষমার অমৃতধারায় সঞ্জীবিত হইয়া, সে পুনরায় অধঃপাতের নিম্নস্তর হইতে উন্নত হইতে ও দেবত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। মানব চরিত্রের এই স্বাভাবিক দ্বন্দ্বকে Stopford Brooke 'Struggle between higher and lower self' অর্থাৎ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব বলিয়াছেন। শরৎচন্দ্রও এই সত্য অবলম্বন করিয়া সমাজ-মনে পতিতার জন্য ক্ষমার উৎস খুলিয়া রাখিলেন। তাঁহার সাহিত্য-শিল্প অনুপ্রেরক ও সম্প্রসারক হইল।

* *
*

বিন্দু

নারীর হৃদয় ভালবাসার তারল্যে গঠিত। ভালবাসাই তাহার স্বভাব ধর্ম্ম। তাহার এই বিশিষ্ট আন্তর-ধর্ম্ম বিভিন্ন রূপ লইয়া, কর্ম্ম ও চিন্তাধারায় প্রকাশ পায়।

তাহার ভালবাসার বস্তুটিতে, স্বভাবতারল্যে, ভালবাসায় নির্ভর করিয়াই সে বাড়িয়া উঠিতে চায়। তাই আমরা দেখিতে পাই যে, নারীহৃদয়ের ভালবাসার প্রবাহটি মিলনের অনিরুদ্ধ আকাঙ্ক্ষায় সকল বাধাবিপত্তিকে উপেক্ষা করিয়া ছুটিয়া চলে। এই চলার পথ যতই সরল ও সুগম হয়, মিলন যত অনায়াস হয় ও স্নেহের আশ্রয় যত শক্তিমান্ হয়, নারীর জীবনধারাও তত সাবলীল-মাধুর্য্যে, স্নেহপ্রবাহে, বিশ্বের সৌন্দর্য্য লইয়া বিকশিত হয়। তাহাতে আমরা তাহার সহজ-শ্রী দেখিতে পাই। ভালবাসার পাত্রটিকে অবলম্বন করিয়া স্নেহামৃতে জীবনলতাটিকে বাড়াইয়া তোলা এবং প্রয়োজন হইলে ভূমে লুটাইয়া বহুদূর গড়াইয়া গিয়াও একমাত্র তাহাকেই আশ্রয় করা নারীর জীবন ধর্ম্ম।

তাহার সহজাত প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে নিঃসংশয়ে ও একান্তে যাহাকে নারী আপন বলিয়া আশ্রয় করে, জীবনের পূর্ণ আবেগ যাহার পায়ে নিঃশেষে বিলাইয়া দেয় তাহাতে যদি কোনরূপে প্রতারিত হয়, ধারণক্ষম শক্তির সন্ধান যদি তাহাতে না পায়, নারীর চিত্তবৃত্তি বিকৃত হইয়া তার বর্দ্ধন উন্মুখ সব আন্তর ভাবগুলিকে পঙ্গু করিয়া দেয়, স্বভাব সারল্যে আঘাত পাইয়া সে তাহার কোমল চিত্তে দৃঢ় বিশ্বাসের প্রলেপটুকু হারাইয়া ফেলে। ব্যর্থতার বিক্ষোভে, আবেষ্টনের প্রতিকূলতায়, দিশাহারা তরীর মত সে প্রতিকূলধর্ম্মী ও বিকৃতরূপী হইয়া পড়ে। ইহা

নারীর স্বরূপ নয়, বিকৃত রূপ। * কেননা, এই বিকৃত রূপেও আবার প্রথম অনুকূল সুযোগে আমরা নারীকে তাহারই স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিতে পাই।

নারীর সহজ রূপ দুইটি বিশিষ্ট ভাবে—চিন্তায় ও কর্ম্মধারায় প্রকাশিত হয়। প্রথমটি হইল তাহার প্রিয়ার রমণীয় মূর্ত্তি। প্রকৃতির বসন্ত ঋতুর মত যৌবনের রূপ গন্ধ ও সৌন্দর্য্যপূর্ণ হইয়া সৃষ্টির প্রচ্ছন্ন প্রেরণা লইয়া আকর্ষণের মূর্ত্তিতে নারী আত্মপ্রকাশ করে। নিজ শক্তির উন্মাদনায় সমস্ত বিশ্বকে যেন আপনার মাঝে ধরিয়া রাখিতে চায়। আপন যৌবন ও সুবিকশিত রূপের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চায়। তাহার অন্তর-ঘন উপচাইয়া পড়া প্রেমের রূপটি প্রিয়ার চরিত্র মাধুর্য্য সৃষ্টি করে।

নারীর সুপ্ত সৃষ্টির মূর্ত্তিটি যেমন বসন্তের স্নিগ্ধ প্রেরণা লইয়া প্রিয়ার রূপে আত্মপ্রকাশ করে, তেমনই রক্ষা ও পালনের অনিরুদ্ধ প্রবাহে স্নেহ-মন্দাকিনীরূপে নিঃশেষে আপনাকে বিলাইয়া দিয়া নারী তাহার দ্বিতীয় রূপ মাতার মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। এই মাতৃরূপ হইল নারীর বর্ষাপুষ্ট ধরিত্রীর কল্যাণময়ী শস্যদায়িনী মূর্ত্তি। রক্ষণ, সেবা ও পালনই তাহার এই রূপের বৈশিষ্ট্য। জীবন-বসন্তে নারীর যে অন্তর আকর্ষণ তাহাতে কেন্দ্রীভূত দেখিতে পাওয়া যায়, জীবন-বর্ষায় সুবিকশিত মাতৃস্নেহে সেই কেন্দ্রীভূত আকর্ষণ আপন অন্তর হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া বহির্মুখী প্রবাহে, সমস্ত জগৎ প্লাবিত করে, সারা বিশ্বকে অপত্য স্নেহে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। তাহার সহজ স্ফুরিত প্রিয়া

---

* Her vices are not vices in their origin but only becomes so when certain vital principles within her get out of hand or find expression in a way they were not intended to adopt. —Ludovici, 'Woman'.

রূপটির সহজ সুপরিণতি হইল মাতৃস্নেহের স্বাচ্ছন্দ্য প্রবাহে। তাই দেখিতে পাওয়া যায় সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে ব্যাপকভাবে নারী প্রিয়া ও মাতার সংমিশ্রণ। জীবন আরম্ভের প্রথম স্বাধীনতায়, যখন সে হাত পা নাড়িতে চলিতে শেখে, যখন খেলার আসরে তাহার কর্ম্মের বাসর সাজাইয়া তোলে, নির্বুদ্ধি সহজমতি সেই বালিকার খেলাঘরের বিষয়বস্তুও প্রিয়া ও জননীর রূপ লইয়া প্রকাশিত হয়। তাহার ভবিষ্যৎ জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রের পরিচয় আমরা এই ক্ষুদ্র বাসরে পাই। ক্রমবিকাশে কুমারী, যুবতী ও জননীতে অন্তর্নিহিত এই সুপ্ত ধর্ম্মের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাই। তাহার খেলাঘরের পুতুলের বাসরে বালিকা যে অজানার সন্ধানের তৃপ্তি পায়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এক প্রচ্ছন্ন রহস্যে সেই অনুসন্ধিৎসা তীব্রতর হইয়া ওঠে। সমস্ত ইন্দ্রিয় মন ও প্রাণ ঐ অজানা অতিথির অভ্যর্থনায় সতত উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকে। সহজাত বৃত্তির নির্দ্দেশে অকস্মাৎ যখন সে সেই অতিথির সন্ধান পায়, তাহার আজন্মসঞ্চিত স্নেহ ও ভালবাসা অমৃতধারায় প্রবাহিত হইয়া সেই অতিথিতে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু যেখানে অতিথির সন্ধান সহজে মেলে না, উৎকণ্ঠার তীব্রতা ও আবেগের আবর্ত্তনে উপলখণ্ডে বাধা প্রাপ্ত স্রোতঃস্বতীর মত তাহার অন্তরের স্নিগ্ধ প্রবাহ বিদ্রোহে উৎক্ষিপ্ত হইয়া ওঠে। তাহাকে আমরা বিকৃত রূপে দেখিতে পাই। নারীর নিজস্ব স্বভাব চির স্নেহশীল ও প্রেমময়। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া যদি ভুলপথে সে কখনও চালিত হয়, ও ক্ষণিক মোহে নিজের প্রাণের দেবতা বলিয়া অন্যকে আশ্রয় করে,—তাহার সমস্ত জীবন বিড়ম্বনায় বিষ হইয়া যায়। ভালবাসায় জীবন দেবতাকে যেমন সে একান্তে আশ্রয় করে, সেইরূপ মাতৃস্নেহেও সন্তানকে একান্তে অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হয়। নারী

একজনকেই তাহার প্রেমের দেবতারূপে বরণ করিতে পারে; একমাত্র অপত্যতুল্যকেই নিজ সন্তানরূপে গ্রহণ করিতে পারে।

প্রতিভাবান্ শিল্পী শরৎচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টিতে নারী-জীবনের এই সহজ বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িয়াছে। তাই তাঁহার শিল্পে নারী তাহার স্বভাবধর্ম্মে জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে।

ধনীর ললনা বিন্দু যখন রূপ, যৌবন ও অর্থের দাম্ভিকতা লইয়া শ্বশুর বাড়ীতে আসিল, মন তাহার ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কারে পরিপূর্ণ ছিল। দারিদ্র্যের প্রতি অবজ্ঞা তাহার চরিত্রগত ছিল। দরিদ্র যাদবের পর্ণ-কুটিরে সে মন লইয়া বিন্দু তৃপ্তির কোন অবলম্বন পাইতেছিল না। যাদব গৃহিণী অন্নপূর্ণা, 'দুইদিনেই টের পাইলেন, ছোট-বৌ যে ওজনে রূপ ও টাকা আনিয়াছে তাহার চতুর্গুণ অহঙ্কার—অভিমানও সঙ্গে আনিয়াছে।' এই একটি তুলিকাক্ষেপেই অবলম্বন ও নির্ভরশূন্য নারীর সত্যকার রূপ শরৎচন্দ্র ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নারীকে স্নেহ বা ভালবাসার স্বর্ণ সূত্রে না বাঁধিতে পারিলে তাহার গতি চির অস্থির থাকিয়া যায়— অন্তর্নিহিত সুপ্ত আকাঙ্ক্ষার তীব্র তাড়নায় সে অসন্তোষের মূর্ত্তিতে দেখা দেয়। ভালবাসা ও স্নেহের যাদুতে তাহাকে বশ করিতে পারা যায়। হইলও তাই। অন্নপূর্ণা তাঁহার দেড় বছরের ঘুমন্ত ছেলে অমূল্যচরণকে টানিয়া বিন্দুর কোলের উপর নিক্ষেপ করিয়াই, 'পলাইয়া গেলেন।' অমূল্যর ঘুমভাঙা নিঃসহায় চীৎকারে বিন্দুর জীবনে এই প্রথম স্নেহের স্পন্দন মিলিল, 'সে ছেলে বুকে করিয়া ঘরে চলিয়া গেল।'... 'অন্নপূর্ণা অমোঘ দৈব ঔষধ আবিষ্কার করিয়া পুলকিত হইলেন।' অকস্মাৎ এই দুধের শিশু কি এক অপূর্ব্ব রহস্যময় শক্তিতে বিন্দুর সকল প্রাণ জুড়িয়া বসিল। তাহার সমস্ত কামনা, বাসনা ও

ভবিষ্যৎ ঐ ক্ষুদ্র শিশুটিকে কেন্দ্র করিয়া দিন দিন প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। স্নেহের অভিনব শিহরণ বিন্দুর সমস্ত প্রাণে তৃপ্তির এক নবীন আনন্দরস সৃষ্টি করিল। অজানা কোন্ চিরবাঞ্ছিতের প্রাপ্তিতে তাহার জীবনের শূন্য স্থানটি পূর্ণ হইয়া উঠিল, সে একান্তে শিশুটিকে অধিকার করিয়া বসিল। লেখক নারীচরিত্রের স্বাভাবিক স্ফুরণ অতি সহজ রেখাপাতে সম্পন্ন করিলেন।

পরীক্ষা ভিন্ন চরিত্রের শক্তি বুঝিবার সুবিধা হয় না। এই যে বিন্দু পরের ছেলেটিকে আপন করিয়া জুড়িয়া বসিল, ইহা তাহার আন্তর-ধর্ম্মের স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক অধিকার তাহা পরীক্ষণীয়। শত প্রতিকূলতায়ও মাতা সন্তানকে ত্যাগ করিতে পারে না, কারণ ইহা মাতৃধর্ম্ম। বিন্দুর বাৎসল্য পরের ছেলে অমূল্যচরণকে অবলম্বন করিয়া সহজ মাতৃভাবে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে কিনা তাহা বিচার করিতে হইলে স্নেহের পরীক্ষার প্রয়োজন। লেখক তাই প্রতিকূল বিরোধী শক্তির ও আবেষ্টনের সাহায্যে সেই পরীক্ষা সুসম্পন্ন করিলেন।

একনিষ্ঠা বিন্দুর চরিত্রের বিশিষ্ট লক্ষণ। চরিত্র ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসে যে আত্মনির্ভরতা জন্মায়, বিন্দুর চরিত্রে সেই স্বাভাবিক আত্মনির্ভরতা আপাত দৃষ্টিতে অহঙ্কার বলিয়া মনে হইলেও, প্রকৃতপক্ষে উহা চরিত্রের ঔৎকর্ষ্যে স্বতঃ বিশ্বাসের ফল। অন্নপূর্ণা ও ভাশুর যাদবের প্রাণে তাহার স্নেহের আসন যে কতদূর সুদৃঢ় ছিল, তাহা সে জানিত। আবদারের শত অত্যাচারেও যে সে আসন কখনও টলিবে না, এই বিশ্বাসে এবং তাহাদের উপর নিজের অন্তরের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমের উপর নির্ভর করিয়াই তাহার আবদারের জোর খাটাইতে চাহিত। 'এমন দেবতার মত ভাশুর পাওয়া অনেক জন্মজন্মান্তরের ফল।' 'দিদি, তুমি সত্যযুগের মানুষ,

কেন মরতে এ যুগে এসেছিলে বলিয়া সহসা···অন্নপূর্ণার গলা জড়াইয়া বলিল, একটা গল্প বল না, দিদি।' 'ঐ রকম (অন্নপূর্ণার মত) ছিট যেন সকলের থাকে ঠাকুরঝি' প্রভৃতি কথায় আমরা বিন্দুর আন্তর সত্যের প্রকৃত পরিচয় পাই। ভাশুর এবং ভাজের উপর তাহার স্নেহ ও ভক্তি এত গভীর ছিল যে, কোন প্রতিকূল আবর্ত্তনে তাহা বিচলিত হইতে পারে, ইহা বিন্দুর কল্পনারও অতীত ছিল। এইরূপ শ্রদ্ধাপ্রণোদিত বিশ্বাসে নির্ভরশীল ছিল বলিয়া সে অন্নপূর্ণার দান অমূল্যচরণকে একান্ত আপন করিয়া লইতে পারিয়াছিল। কিন্তু এলোকেশী শত চেষ্টা ও কৌশল সত্ত্বেও নরেনকে অমূল্যের স্থানে বসাইতে পারে নাই। চরিত্রগত একনিষ্ঠায় সে অমূল্যচরণকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিয়া অন্নপূর্ণার যে সে ছেলের উপর কোন দাবী থাকিতে পারে, তাহা মনেই করিল না। 'সেই একদিন হাসতে হাসতে ব'লেছিলাম অমূল্যকে তুই নে, ছোট-বৌ সেই জোরে আজ আমাকেও দিব্যি দিয়ে গেল।' অন্নপূর্ণার এই উক্তিতে বিন্দুর মাতৃত্ব স্বাভাবিকরূপে ফুটিয়া উঠিল।

এই যে মাতৃস্নেহের দাবী, যাহা সে নিজ অধিকারে রাখিতে চায়, এই একান্ত-দাবীর ভিত্তি লইয়া স্নেহের প্রকৃত পরীক্ষা আরম্ভ হইল। নারীর ভালবাসা বা স্নেহ একবার যাহাকে আশ্রয় করে সমস্ত জীবনে তাহাকে নির্ভর করিয়া চলিতে চায়, কোন বাধা মানে না। মাতৃ-জীবনের সমস্ত আনন্দ, আশা ও আকাঙ্ক্ষার পূর্ণ তৃপ্তিতে বিন্দু এই অমূল্যচরণকে অবলম্বন করিয়া চলিতেছিল। 'দিদি, যদি বেঁচে থাকি ত দেখতে পাবে লোকে বলবে ঐ অমূল্যর মা।···বলিতে বলিতে তাহার চোখ দুটি সজল হইয়া উঠিল।···ঐ একটি আশা নিয়ে আমি বেঁচে আছি, দিদি।··· ও আশায় যদি কোন ঘা পড়ে ত আমি পাগল হ'য়ে

যাব।' মাতৃজীবনে ইহা হইতে গভীরতম তৃপ্তির আস্বাদ ও সার্থকতার আনন্দ কল্পনার বহির্ভূত। তাহার মাতৃধর্ম্মের একমাত্র অবলম্বন অমূল্যচরণের উপর, তাই সে অন্য কাহারও দাবী স্বীকার করিতে পারে না, গর্ভধারিণী অন্নপূর্ণাও নয়।

অমূল্যের ভবিষ্যৎ ও মঙ্গলের পথে বিন্দু কোন বাধা আসিতে দিতে চায় না। নরেন্দ্রর কুশিক্ষা ও সংসর্গের বাহিরে অমূল্যকে রাখা বিন্দু একান্ত আবশ্যক মনে করিল। অন্নপূর্ণাকে বলিল, 'দিদি, তুমি আত্মীয়-কুটুম নিয়ে মনের সুখে ঘর কর, আমি এখান থেকে ছেলে নিয়ে পালাই।' স্নেহের এই দাবীতে অমূল্যচরণের নিরঙ্কুশ মঙ্গলকামনায় নরেন্দ্র ও এলোকেশীর সংস্রব এক বিরোধী পরিবেশের সৃষ্টি করিয়াছিল। কি করিয়া অমূল্যচরণকে নরেন্দ্রের অনভিপ্রেত সংসর্গ হইতে দূরে রাখা যায় এবং নরেন্দ্রের কুশিক্ষা ও দৃষ্টান্ত যাহাতে সুকোমল অমূল্যচরণের চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করিতে না পারে, তাহার বিধান করিতে বিন্দু সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিতা থাকিত। এই সময় বিন্দুর বিধি-ব্যবস্থায় অন্নপূর্ণা গোপনে হস্তক্ষেপ করায় অবস্থা জটিলতর হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা নিতান্ত অতর্কিতে ও একান্ত স্নেহ-দৌর্ব্বল্যেই বিন্দুর অজ্ঞাতে, গোপনে অমূল্যকে স্কুলের জরিমানার টাকা দিয়াছিলেন। ইহাতে যে বিশেষ কিছু অপরাধ হইতে পারে তাহা তিনি ধারণা করেন নাই। কিন্তু বিন্দু নিজ-অধিকারে অন্নপূর্ণার হস্তক্ষেপণ দেখিয়া 'বারুদের মত জ্বলিয়া উঠিল'। বলিল, 'আজ থেকে চিরকালের জন্য মাপ করলাম, আর বলব না।...সে যে এমনি ক'রে চোখের সামনে একটু একটু ক'রে উচ্ছন্ন যাবে তা' সইতে পারব না। তার চেয়ে একেবারে যাক্।' পরীক্ষার বহ্নি প্রজ্বলিত হইল; 'নূতন বাড়ীতে যাদব, অন্নপূর্ণা ও অমূল্য ব্যতীত আর সকলেই গেল'।

শরৎচন্দ্রের শিল্প-চাতুর্য্য

স্রোতের জল নদীর বুক বহিয়া কলস্বরে আপন মনে প্রবাহিত হয়। সে যেন একটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের ধারা, চিরকাল এইরূপে বহিয়া যাওয়াই তাহার স্বভাব-ধর্ম্ম। যেদিন সে তাহার স্বতঃ প্রবাহে বাধা পায়, এবং সেই বাধা অতিক্রম করিয়া নিজেকে তাহার স্বভাবগতিতে প্রধাবিত না করিতে পারে সেদিন তাহার জীবনে মৃত্যু আসে। স্রোত-বিহীন নদীর বুক স্নেহ সলিলে বঞ্চিত হইয়া শুষ্ক বালুর চরায় পরিণত হয়। বিন্দুর জীবনধারা অমূল্যচরণের প্রতি স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া প্রবাহিত হইতেছিল। অমূল্যর প্রতি বিন্দুর আকর্ষণ যদি স্বাভাবিক না হইত, যদি উহা স্বতঃ উৎসারিত অপত্যস্নেহ না হইত, যদি সে অমূল্যকে এই স্নেহের আসনে একান্তে বসাইতে না পারিত, তাহা হইলে এই বিচ্ছেদের সহিত দিন দিন অমূল্য, ভাশুর ও জায়ের প্রতি তাহার বীতরাগ ক্রমেই বাড়িয়া হিংসা দ্বেষে পরিণত হইত। অস্বাভাবিক স্নেহের অভিনয় যখন স্বাভাবিক ভাবে শেষ হয় তখন তাহা বিদ্বেষের রূপ লইয়া আত্মপ্রকাশ করে। যতই দিন যায় বীতস্পৃহায় দিন দিন মন ভরিয়া ওঠে, আর তাহাকে ফিরিয়া পাইবার কোন আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ থাকে না। অতীত স্নেহের বিনিময় না পাইয়া শুধু অকৃতজ্ঞতার কথাই মনে পড়ে, অন্তর ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। সে স্নেহ যেন ধারে বিক্রয় হইয়াছিল, সময়মত উচিৎ মূল্য আদায় না হওয়ায় তাহার যেন আর দামই রহিল না। ব্যবসার লোকসানে মন ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে। শুধু ব্যবসায়ের দেনা-পাওনা হিসাবে ঐ স্নেহের মূল্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। যখন স্নেহের বস্তু চক্ষুর অন্তরাল হয় তখন তাহার দোষ-ত্রুটির আলোচনায় মনের শান্তি বিধান করা হয়। কিন্তু স্বাভাবিক স্নেহ যখন অভিমানে আঘাত করে তখন সে অভিমান ভরে প্রথমতঃ বিচ্ছেদের

আন্তরিক দুঃখ অবলম্বন করিয়া আমাদের মন ক্ষুব্ধ হইতে থাকে। কিন্তু যতই দিন যায় বিক্ষুব্ধ মন সহজ অবস্থা পায় ততই স্নেহের স্বতঃআকর্ষণে সমস্ত মন বিরহাশ্রুতে পূর্ণ হয়। প্রতিনিয়ত স্নেহের বস্তুকে আবার একান্তে আত্মীয় রূপে নিকটে পাইতে মন উদ্বেলিত হইয়া ওঠে। স্নেহশূন্য অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিবার কোন অবলম্বন সে পায় না।

হইলও তাই। একান্ত নিজস্ব অধিকারে অপরের হস্তক্ষেপ বিন্দু সহিতে পারিল না। অভিমানে চিত্ত তাহার বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। প্রথম উচ্ছ্বাসে সে বলিল, 'আর বোলব না,......সে একেবারে যাক্।' কিন্তু প্রাণের সকল তন্ত্রীতে যে একান্ত আত্মীয়রূপে মিশিয়া থাকে, অভিমানে দূরে ঠেলিতে চাহিলেই তাহাকে দূর করা যায় না। সে আবার প্রতি অণু পরমাণুতে বিরহের এক অজানা শিহরণ জাগাইয়া বিচ্ছেদের দুঃখ তীব্রতর করিয়া তোলে। সমস্ত প্রাণ, যুক্তির সকল নিষেধ সত্ত্বেও তাহাকে পুনরায় পাইবার জন্য অনুক্ষণ কাঁদিতে থাকে। ইহাই হইল স্নেহের স্বভাবিক ধর্ম্ম। নূতন বাড়ীতে আসিবার পর মুহূর্ত্ত হইতেই বিন্দুর নিকট এই নূতন আবেষ্টন প্রাণহীন বলিয়া মনে হইতেছিল। ভাশুর, জা ও অমূল্যচরণের প্রতি তাহার সহজ ভক্তি, সম্ভ্রম ও স্নেহের দাবী সে অক্ষুন্ন মনে করিত। তাহাদের কাছে তাহার যে কোন অপরাধ হইতে পারে ইহা সে মনে আনিতে পারিত না। এতদিন যেমন তাঁহারা বিন্দুর সকল স্নেহের অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া আনন্দ পাইতেন এবং আনন্দের অমৃত আস্বাদে বিন্দুর স্নেহের জোর আরও বাড়িয়া চলিত, এবারও সেই রকম না হওয়ায়, বিন্দুর অভিমান দিন দিন গভীরতর হইতে লাগিল। মাতৃশাসনে ক্ষুব্ধ বালক যেমন নিজেকে দুঃখপীড়িত করিয়া, ভয় দেখাইয়া, মাতাকে শাসন করিতে চায়

তেমনই গাঢ় অভিমানে দুঃখের কষ্ট নিজে বহিয়া তিলে তিলে শুকাইয়া মরিয়া বিন্দু অন্নপূর্ণাকে শাসন করিতে চাহিল। তাহার নিঃসঙ্গ মন উহাদের অদর্শনে যে দুঃখের পীড়নে মুমূর্ষু হইয়াছিল, শুধু সেই মর্ম্মান্তিক যাতনায় স্নেহের বহ্নি পুনর্দীপ্ত করিয়া তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে যাইতেছিল। প্রত্যাবর্ত্তনে যত দেরী হইতেছিল স্নেহ-অভিমানের টান ও দুঃখ ততই তীব্র ও উজ্জ্বল হইতেছিল।

মনের অবস্থা যখন ভাঙিয়া পড়িবার মত—আর বুঝি সহ্য করা যায় না, ঠিক সেই সন্ধিক্ষণে লেখক বিন্দুকে শুনাইলেন, যে তাহার ভক্তির পাত্র দেবতুল্য ভাশুর বুড়া বয়সে মাসিক বারটাকা বেতনে বার মাইল দূরে কোন জমীদারের সরকারে কাজ লইয়াছেন। এবং সারাদিন উপবাসী থাকিয়া উদরান্ন সংস্থানের জন্য সেই চাকুরী করিতেছেন। স্নেহময়ী সেই 'সত্যযুগের মানুষ' জা অনাহারে, অর্দ্ধাহারে ঐ সামান্য আয়ে সংসার চালাইতেছেন। শুধু তাই নয়, খোঁজ করিয়া বিন্দু নরেনের কাছে জানিতে পারিল যে, তাহার একমাত্র স্নেহের ধন অমূল্য স্কুলে তাহারই প্রেরিত নরেনের খাবার দেখিতে ছুটিয়া আসে, ও নরেনের মা বলে, 'অমূল্য নজর দেয়।' অমূল্যের খাবার লইয়া কেহ যায় না, 'গরীব মানুষ, সে পকেটে করিয়া দুটি ছোলাভাজা নিয়ে যায়, তাই টিফিনের সময় ওদিকের গাছতলায় লুকিয়ে ব'সে খায়।' 'বিন্দুর চোখের উপর সমস্ত ঘরবাড়ী সংসার দুলিতে লাগিল,—সে সেইখানে বসিয়া পড়িল।' ঐ মর্ম্মান্তিক কথা শুনিবার পর বিন্দুর আর আহারে রুচি রহিল না। অভিমানে স্তব্ধ প্রাণ দিন দিন অনাহারে শুকাইয়া মরিতে বসিল। স্নেহের যে অটল ভিত্তির উপর বিন্দু তাহার আবদারের দাবী গড়িয়া তুলিয়াছিল, দাবীর

সেই শুভ্র সৌধ আশ্রয় করিয়া সে মরিতে বসিল। ঔষধ, পথ্য, এমন কি জলটুকু পর্য্যন্ত সে গ্রহণ করিতে চাহিল না।

সত্যকার দাবীর অধিকার মানবধর্ম্ম কখনও অস্বীকার করিতে পারে না। স্নেহের আকর্ষণ প্রতিক্রিয়াশীল। যখন স্নেহের দহনে বিরহের তীব্রতায় বিন্দু মৃত্যুবরণ করিয়া লইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে, একই ভাবে তাহারই অদর্শনে তাহার জা ও ভাসুরের হৃদয়ও স্নেহের পীড়নে আকুল হইয়া উঠিতেছিল। স্নেহের প্রবল আতিশয্যে, অভিমানের বাঁধ দুইদিকেই শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। স্বপ্নে বিন্দুর অমঙ্গল দর্শন করিয়া যাদব যখন অস্থির হইয়া পড়িতেছিলেন এবং অমঙ্গল আশঙ্কায় অন্নপূর্ণা যখন শিহরিতেছিলেন, ঠিক তখনই 'বাহিরে মাধবের কণ্ঠস্বর শুনা গেল,···বোধ করি (বিন্দুর) শেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে'। বন্যার উন্মত্ত-উদ্দামে, খরধার নদীর মত তিনটি স্নেহস্রোতা নদী একই মুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া, অভিমানের সকল বাঁধ নিমেষে চূর্ণ করিয়া একান্তে স্নেহ-সাগরে মিলিত হইল। স্নেহ অধিকারে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আবার বিন্দু শুধু মাত্র স্নেহের জোরেই সকলকে ফিরিয়া পাইল। অনশনে মুমূর্ষু 'বিন্দু মুখ ফিরাইয়া বলিল, দাও দিদি, কি খেতে দেবে। আর অমূল্যকে আমার কাছে শুইয়ে তোমরা সব বাইরে গিয়ে বিশ্রাম করগে। আর ভয় নাই, আমি মরবো না।' পরীক্ষার তীব্র হুতাশনে পুড়িয়া ভাস্বর ও স্নিগ্ধ মূর্ত্তিতে স্নেহের দাবী সত্যস্বরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিল। লেখক নারীর জীবনসত্য অবলম্বন করিয়া তাহার একনিষ্ঠ স্নেহধর্ম্ম যে তাহার স্বভাবধর্ম্ম তাহা দেখাইলেন।

*

*

নারায়ণী

বিন্দুর চরিত্রে মাতৃশক্তির উজ্জ্বলবিকাশের পর শরৎচন্দ্রের অন্যতম সৃষ্টি নারায়ণী স্নেহনির্ঝরের স্নিগ্ধ মূর্ত্তিতে আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিন্দু নিঃসন্তান ছিল। ভাশুরের ছেলে অমূল্যচরণকে বসাইয়া নারী-হৃদয়ের মাতৃবাসনার শূন্য আসন পূর্ণ করিল। পূর্ণতার তৃপ্তিতে তাহার সমস্ত প্রাণ ভরিয়া উঠিল। কিন্তু নারায়ণীর সে অভাব ছিল না। সে ছিল পুত্রবতী। বালিকা বধূ নারায়ণী মাত্র তের বৎসর বয়সে সৎশ্বাশুড়ীর কোলের ছেলে আড়াই বছরের শিশু রামের প্রতিপালনের ভার পাইল। তের বৎসর নারায়ণীর স্নেহছায়ায় ও আদরে বর্দ্ধিত রামকে একগুঁয়ে ও আবদারে ছেলের রূপে লেখক পাঠকের কাছে পরিচিত করিলেন। রাম দুর্দ্দান্ত বালক, সে নিজে যাহা ধরে তাহা করে, কাহারও মানা মানে না। 'রামলালের বয়স ছিল কম, কিন্তু দুষ্টামি কম ছিল না। গ্রামের লোকে তাহাকে ভয় করিত।'

মানবচরিত্রে সকল বৃত্তিগুলি কোন না কোন বিশিষ্ট ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া বিকশিত হয়। আদুরে শিশু মায়ের স্নেহে এক অজানা বিশ্বাসে তাহার শত আবদারের ও জবরদস্তির রাজত্ব সৃষ্টি করিয়া লয়। স্নেহের এই আশ্রয়ে যে তাহার সকল দাবী মিটিবে ও শত অপরাধ ক্ষমা পাইবে, এই আন্তর-বিশ্বাসে, এক অজ্ঞাত নির্ভরে শিশু তাহার মায়ের উপরে দিন দিন জোর বাড়াইয়া চলে। মানবের চরিত্রবৃত্তি স্নেহ, দয়া, মায়া প্রভৃতি সকলই ঐরূপ কোন না কোন নির্ভর-বিশ্বাসে অনুপ্রাণিত। এই বিশ্বাস যত ঘন ও দৃঢ় হয়, আত্মীয়তার দাবীও তত সুগভীর হয়। বিশ্বাস যতক্ষণ শিথিল না হয়, চরিত্রবৃত্তির দয়া, মায়া প্রভৃতির শক্তিও তত অপ্রতিহত থাকে। কিন্তু যদি কোন কারণে অন্তর্নিহিত বিশ্বাসে সন্দেহ আসে, সন্দেহ যত ঘনীভূত হয়, বিশ্বাসের বন্ধনও ততই শিথিল

হইয়া পড়ে। ফলে চরিত্রশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। নিতান্ত অবাধ্য শিশু তাহার স্নেহ-আশ্রয় গণ্ডীর মধ্যেই স্বীয় আবদারের স্থান নিবদ্ধ রাখে। তাহার বাহিরে কিন্তু তাহার দুষ্টামির পরিচয় সে দেয় না। তাই আমরা দেখি, নিজের ঘরের দুষ্ট ছেলেটি পরের ঘরে গেলে শান্ত ও সংযত হইয়া বসে। দুষ্ট রাম দৌরাত্ম্য করিত নারায়ণীর স্নেহের রাজ্যে। নারায়ণীর স্নেহ-সুধায় সে পুষ্ট হইতেছিল। তাহার দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতি তাই এক নারায়ণী ভিন্ন অন্য কাহারও শাসন মানিতে শেখে নাই। শাসন ও বাধ্যতা পারস্পরিক ও প্রতিক্রিয়াশীল। শাসন যেখানে স্নেহে অনুপ্রাণিত, বাধ্যতা সে স্থলে স্বেচ্ছায় আসিয়া থাকে। স্নেহের দণ্ডেই তাই শাসন বাধ্যতার দাবী করিতে পারে। আমরা যে শাসনে স্বীয় মঙ্গলের আভাস পাই, ও বুঝিতে পারি যে শাসন মানিলে আমাদের মঙ্গল হইবে, শুধু মাত্র সেই শাসনকে মানিয়া চলিতে আমাদের প্রবৃত্তি আসে, স্নেহহীন শাসন কখনও পালনের দাবী করিতে পারে না। হয় ত জোর করিয়া নিরুপায়ে সাময়িক পরাজয় স্বীকার করাইয়া লইতে পারা যায়, হয়ত বলবত্তর শক্তির ভয়ে ও পীড়নের আতঙ্কে আমরা সাময়িক ভাবে তাহাকে মানিয়া লই, কিন্তু মন আমাদের বিদ্রোহী হইয়াই থাকে। প্রথম অনুকূল সুযোগেই সে শাসনদণ্ডকে অবজ্ঞায় পদদলিত করিয়া বিদ্রোহে মন আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু শাসন যেখানে স্নেহ-মাঙ্গল্যে আদেশ ও নির্দ্দেশ জারী করে, মন আমাদের তাহার অন্তর্নিহিত মঙ্গলময় শক্তিতে প্রণোদিত হইয়া সম্ভ্রমে আপনি মাথা নোয়ায়। অনুশাসন কল্যাণময় বলিয়া প্রতীতি হয়। তাহাকে মানিয়া চলা নিজেরই মঙ্গলের জন্য, তাই মন স্বেচ্ছায় সে শাসন মানিয়া লয়।

নারায়ণী

দুর্দ্দান্ত রাম শুনিল, বেশি টাকা না পাইলে ডাক্তার নারায়ণীর চিকিৎসা করিতে আসিবে না। সে নিজে ডাক্তারকে ডাকিতে গেল। নারায়ণীর প্রশ্নের উত্তরে স্বামী শ্যামলাল বলিলেন, "(রাম) তোমার মানা শুনল না, আমার মানা শুনবে।" আত্মীয়তা সূত্রে রাম শ্যামলালেরই নিকটতর, কিন্তু স্নেহের গভীরতায় নারায়ণী তাহাকে সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। ডাক্তারের নিকট গিয়া সে সোজা জানাইল, "বৌদি, মাথার দিব্যি দিয়ে ফেলেচে, নইলে দাঁতগুলা তোমার সত্যই ভেঙে ঘরে যেতুম।...আজ যদি জ্বর না ছাড়ে, ঐ যে সামনের কলমের আমবাগান," উহার একটি চারাও থাকিবে না। 'সাঁতরাদের একমাচা শশা কেটে দিয়ে' যখন সে নারায়ণীর মুখে শুনিল যে 'অতটুকু শশা নিলেও চুরি করা হয়', নির্ব্বিবাদে বৌদির আদেশে সে তখন একপায়ে দাঁড়াইল। তাই দেখা যায়, সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে স্নেহের অনুশাসন মঙ্গলময় বলিয়া মানবচরিত্র স্বেচ্ছায় মানিয়া আসিতেছে। নারায়ণীর শাসন ও রামের নিঃশব্দে তাহাকে মানিয়া চলাটুকু অবলম্বন করিয়া লেখক দেখাইয়াছেন যে, নারীচরিত্রে স্নেহধর্ম্ম কিরূপ শক্তিতে ও প্রগাঢ় নিষ্ঠায় আত্মপ্রকাশ করে। যে দুরন্ত বালক সকলের মনে ত্রাস সঞ্চার করিত, স্নেহস্পর্শে সে নিতান্ত অসহায়ের মত নারায়ণীব আদেশ স্বেচ্ছায় পালন করিত।

নারী স্নেহনির্ঝরা। প্রাকৃতিক নিয়মে ও আত্মশক্তিতে তাহার স্নেহ-ধারা অনুকূল পথে আপনি প্রবাহিত হয়। তাহার স্বভাব ধর্ম্মের এই উৎস চির উন্মুক্ত ও প্রবাহমান থাকে। ঘুমন্ত শিশু অমূল্যচরণকে বিন্দুর কোলে ফেলিয়া দিয়া সেই শিশুর অসহায় ক্রন্দনে অন্নপূর্ণা বিন্দুর নারী-হৃদয়ে এই স্নেহের উৎস খুলিয়া দিয়াছিলেন। দুধের ছেলে রামকে

অসহায় ফেলিয়া যখন সৎশ্বাশুড়ী পরলোক গমন করিলেন, শিশুর অসহায় অবস্থা ও একান্ত নির্ভরতা অবলম্বন করিয়া নারায়ণীর স্নেহ অবাধে বহিয়া চলিল। স্নেহের অবলম্বন নারীজীবনে এক নিগূঢ়, অপরিহার্য্য আত্মিক সত্য। ইহাকে সে জীবনে নিত্যসত্য বলিয়া এক অজানা আকর্ষণে একান্তে গ্রহণ করে। এবং একবার যাহাকে গ্রহণ করে, জীবনে যাত্রাপথে শত প্রতিকূল শক্তিতে, ঝঞ্ঝাবাত্যার তাড়নেও তাহা ত্যাগ করিতে পারে না। এই মূল সত্যটি লেখক তাঁহার নারীচরিত্রে পূর্ণভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন যে, স্নেহবন্ধন নারীজীবনের একমাত্র সত্য, তাহার আত্মিক ধর্ম্ম। স্বাভাবিক অবস্থায় নারী এই ধর্ম্মচ্যুত হইতে পারে না। কেননা, অগ্নির দাহিকা-শক্তির মত ইহা তাহার স্বধর্ম্ম; ব্যতিক্রম নারীর বিকৃত রূপের পরিচায়ক।

আখ্যায়িকার পরিবর্দ্ধনে লেখক উল্লিখিত নারীশক্তির স্বাভাবিক গতি ও স্বরূপ সহজভাবে প্রকাশ করিয়াছেন; দেখাইয়াছেন যে, নারীর জীবন স্নেহ ও ভালবাসা দিয়া গড়া। আবেষ্টন ও বিরোধী শক্তির শত প্রতিকূলতায়ও নারী তাহার সহজ অবস্থায় এই ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। বিন্দুর চরিত্রে লেখক দেখাইয়াছেন অপত্য স্নেহের অবলম্বন অমূল্যচরণই তাহার জীবনীশক্তি ছিল, তাহার অভাবে বিন্দু মরিতে বসিয়াছিল। স্নেহের নিধিকে ফিরিয়া পাইয়া সে বাঁচিয়া উঠিল। নারায়ণীর চরিত্রে লেখক দেখাইলেন যে, নারীর পক্ষে তাহার এই স্নেহের অবলম্বনটি জীবনের সকল বন্ধন হইতে শ্রেষ্ঠ ও সুদৃঢ়। নারী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও এই অবলম্বনে নির্ভর করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়।

নারায়ণী

নারায়ণীর স্নেহে সহজভাবে প্রতিকূল আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া লেখক তাহার শক্তি ও দৃঢ়তা দেখাইলেন। রামের প্রতি সংসারের অন্য কাহারও আন্তরিক স্নেহ ছিল না; থাকিবার কারণও নাই। সে শ্যামলালের ছোট বৈমাত্রেয় ভাই, অৰ্দ্ধেক সম্পত্তির অধিকারী। সংসারে থাকায় সেই সম্পত্তির পূর্ণ ভোগদখলের সুযোগ তাহার ছিল। শ্যামলাল জানিতেন যে, নারায়ণীর স্নেহ-নীড়ে রাম বনীয়াদী বাসা বাঁধিয়াছিল। সহজে তাহাকে সে নীড়ভ্রষ্ট করা যাইবে না। এই সকল কারণে রামের দুরন্ত চরিত্রের কথা এতদিন শ্যামলালের স্মরণ হয় নাই। কিন্তু যখন শাশুড়ী রামের কথা নানারূপে রঙীন করিয়া একে একে শ্যামলালের কানে তুলিতে লাগিলেন, বৈমাত্রেয় ভাইয়ের উপর দিন দিন শ্যামলালের বিষদৃষ্টি পড়িতে লাগিল। নিতান্ত অনুগত জামাতার মত শাশুড়ীর নির্দ্দেশ তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে চাহিলেন।

শাশুড়ী দিগম্বরী দশ বছরের কন্যা সুরধুনীকে লইয়া নিরাশ্রয়ে কন্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে আসিলেন। প্রথম হইতে রামকে তিনি বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। বিদ্বেষের কারণ হয়ত নারায়ণীর সংসারের স্নেহ-আকর্ষণ কন্যা সুরধুনীর উপর নিবদ্ধ করিবার অজানা প্রয়াস। সঙ্কীর্ণ চিত্তে মাতৃস্নেহ শুধু নিজ সন্তানকেই কেন্দ্র করিয়া থাকে। স্নেহের বহির্মুখী কোনও গতি তাই এই প্রকৃতির মায়েরা বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতে থাকেন। অন্যকে ভালবাসিতে দেখিলে তাঁহারা মনে করেন বুঝি তাঁহাদের সন্তানের উপর স্নেহটুকু কমিয়া যাইবে। মেয়ের সংসারে আসিয়া দিগম্বরী লক্ষ্য করিলেন যে, রাম একান্তে নারায়ণীর সব স্নেহটুকু জুড়িয়া বসিয়া আছে। সে জায়গা হইতে তাহাকে নড়াইতে না পারিলে সংসারে সুরধুনীর স্থান সুদৃঢ় হইবে না। রামের প্রতি দিগম্বরীর

অকারণ বিদ্বেষের ইহাই হয়ত মূল কারণ। প্রতি খুঁটিনাটিতেই তিনি রামের দোষ ধরিতে লাগিলেন। রামের সহজ দুর্দ্দান্ত শিশু-চরিত্র এই বিদ্বেষের গন্ধে দিগম্বরীর প্রতি ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে লাগিল। স্নেহ-আবদারের একছত্র রাজত্বে এই প্রথম বাধা পাইয়া রাম ক্ষোভে ও রাগে দিগম্বরীর নাম শুনিলেই জ্বলিয়া উঠিত। নারায়ণী, দিগম্বরী ও রামকে লইয়া লেখক স্নেহের শক্তির অপূর্ব্ব স্ফুরণ দেখাইলেন। একদিকে যেমন নারায়ণী স্নেহের শাসনে রামের দুরন্ত-মনকে অধিকার করিয়াছিল, অন্যদিকে সেই শিশুমন স্নেহ-হীন বিদ্বেষে দিগম্বরীর প্রতি সহজেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তিতে, একই মনে কিরূপ বিভিন্ন ও বিরুদ্ধ শক্তি সমুদ্ভূত হয়, পাঠক তাহা দেখিতে পাইলেন। যে শিশুমন সহজাত নির্ভরে একান্তে নারায়ণীকে আশ্রয় করিল, তাহার সেই নির্ভর-সারল্য দিগম্বরীর বিদ্বেষে বিরূপ হইয়া উঠিল। 'বড় হ'লে গোবিন্দর জন্যে একটা দোলা টাঙিয়ে' দেওয়ার সুখের আশায় রাম উঠানে অশ্বত্থ গাছের ডাল পুঁতিতেছিল। দিগম্বরীর ইহা চক্ষুশূল হইল। বলিলেন, 'কেন, বাড়ী কি ওর একলার, যে মনে করলেই উঠোনের মাঝখানে অশথগাছ পুঁতে দেবে! তোরা কি কেউ নোস, আমার গোবিন্দ কি কেউ নয়।···আমার যদি বাড়ী হোত নারাণী, তা'হলে দেখাতুম ও কত বড় বজ্জাত।' এই সকল বাক্যবাণে ও নারায়ণীর নিজের ছেলের মঙ্গলের ছলে দিগম্বরী তাহার মন রামের প্রতি বিরূপ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু একনিষ্ঠ স্নেহ নারীর স্বভাব-ধর্ম্ম। স্বতঃ প্রবাহে, করুণায় একবার যাহাকে সে অন্তরে গ্রহণ করে, তাহা আর সে ত্যাগ করিতে পারে না, নিজ সন্তানের অমঙ্গল আশঙ্কাতেও নয়। দিগম্বরীর কথা নারায়ণী হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন।

কিন্তু দিগম্বরী সহজ পাত্রী নন, গোপনে তিনি গাছটি তুলিয়া, মুচড়াইয়া ভাঙিয়া রাখিয়া দিলেন। এবং নানা কৌশলে ও অছিলায় নারায়ণীর মন রামের প্রতি বিষাইয়া তুলিতে তিনি অশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

বিন্দুর চরিত্রে আমরা দেখিয়াছি যে, লেখক অভিমানের সুদৃঢ় অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া বিন্দুর স্নেহের গভীরতা পরীক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু সহজ মাতৃস্নেহের প্রবাহে বিন্দু সেই আবেষ্টনের বাঁধ ভাঙিয়া অমূল্যচরণকে নিজের করিয়া ফিরিয়া পাইয়াছিল। নারায়ণীর চরিত্রে এই প্রতিকূল আবেষ্টন লেখক আরও দুর্ভেদ্য করিয়া গড়িলেন। অমূল্যচরণ স্নেহের ভিখারী ছিল না, সে তাহার নিজের মা বাপের এমনকি কাকারও আদরের দুলাল ছিল। কিন্তু রামের স্নেহ-আশ্রয়স্থল ছিল একমাত্র নারায়ণী। তাহাকে অবলম্বন করিয়া সে নির্ভরে নিশ্চিন্ত ছিল। রাম সহজাত প্রবৃত্তিতে সেই স্নেহ আশ্রয়ে নির্ভর করিয়াছিল। যে সহজাত প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে শিশু ক্ষুধা পাইলে কাঁদে, এবং যাহার আকর্ষণে ক্ষুধা পাইলে মা শিশুর আহার জোগান, যাহার প্রেরণায় মাতা সকল আপদ-বিপদের হাত হইতে শিশুটিকে সতত রক্ষা করিতে সতর্ক থাকেন এবং যাহার প্রভাবে শিশুর মায়ের কোলে গিয়াই তাহার সকল কান্না ভুলিয়া যায়, সেই সহজাত বৃত্তির অজ্ঞাত আকর্ষণে রাম নারায়ণীকে আশ্রয় করিয়াছিল এবং নারায়ণীও রামকে বক্ষে ধারণ করিয়াছিল। মাতার স্নেহের দাবী, স্বামীর ভালবাসা ও অনুশাসন এমন কি একমাত্র পুত্র গোবিন্দের কল্যাণের মোহ পর্য্যন্ত নারায়ণী উপেক্ষা করিয়াই চলিল। নিজের অন্তরের স্নেহে অন্য কাহারও অধিকার দাবী সে স্বীকার করিতে পারিল না। ঝড়ের তাড়নে নীড়ের পক্ষীশাবকের মত, বিরোধী

শক্তির প্রকোপ হইতে সে রামকে একান্তে বুকে আঁকড়াইয়া রাখিল। অশ্বত্থগাছটি তুলিয়া ফেলার জন্য ক্ষুব্ধ রামকে সে হাসিয়া বলিল যে, উঠানে গাছ পুঁতিলে 'বাড়ীর বড় বৌ মরে যায়।' অপ্রতিভ রাম নারায়ণীর 'বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া' বলিল, 'কিন্তু ফেলে দিলে আর দোষ নেই, না বৌদি।' নারায়ণীর চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিল। লেখকের অপূর্ব্ব তুলিকায় স্নেহের বশীকরণ স্নেহামৃতে স্নিগ্ধতর হইয়া উঠিল। একনিষ্ঠ স্নেহ-সৌন্দর্য্যে নারী তাহার স্নিগ্ধ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইল।

কিন্তু দিগম্বরী ছাড়িবার পাত্রী নন। মাকে নারায়ণী ভক্তি ও শ্রদ্ধা করে। অসহায় মার প্রতি নিজের কর্ত্তব্য নারায়ণী ভুলিয়া যায় নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মাতার সঙ্কীর্ণতাটাও সে উপেক্ষা করিতে পারিতেছিল না। দিগম্বরী যে অকারণ বিদ্বেষে রামকে পীড়ন করিতে চান, নারায়ণী তাহা বুঝিল। যাহাতে দিগম্বরী রামের প্রতি প্রসন্ন হন, ও রামও তাঁহাকে সম্ভ্রম করে, তাহারই চেষ্টা নারায়ণী করিতে লাগিল। কিন্তু দিগম্বরী নারায়ণীর স্নেহের গতিরোধ করিতে না পারিয়া জামাতা শ্যামলালের মন রামের প্রতি বিরূপ করিতে চাহিলেন। বৈমাত্রেয় ভাই রামের প্রতি শ্যামলালের এমন কোন স্নেহ ছিল না। তাহার ভালমন্দেও শ্যামলালের বড় কিছু আসিয়া যাইত না। রামের সম্বন্ধে তিনি একরূপ উদাসীন ছিলেন। এই নিরপেক্ষ মনকে বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিতে দিগম্বরীর বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। শাশুড়ীর কপট কান্নায় রামের প্রতি বিরক্ত হইয়া তিনি নারায়ণীকে বলিলেন, 'আমার আর সহ্য হয় না। ওকে নিয়ে বাস করা চলে না।······তোমার মা আমাকে চার পাঁচদিন ক্রমাগত বলছেন, রাম ওঁকে নাহক অপমান

ক'রেচে।...ওকে আলাদা ক'রে দেব।' যে শক্তির প্রেরণায় নারায়ণী মায়ের কথায় রামকে ঠেলিতে পারে নাই, শক্তির সেই অপূর্ব্ব প্রেরণায় সে অনায়াসে বলিয়া দিল, 'সংসারের সমস্তই এই একটা মাথায় ব'য়ে ব'য়ে আজ ছাব্বিশ বছরের বুড়ো মাগী হয়েচি, এখন আমার ঘরকন্নার মধ্যে যদি হাত দিতে এসো, সত্যি বলচি তোমাকে আমি নদীতে ডুব দিয়ে মরব। তখন আর একটা বিয়ে ক'রে রামকে আলাদা ক'রে দিও।...কিন্তু এখন নয়।'

কি সুদৃঢ় এই স্নেহের ভিত্তি! শত ঝঞ্চা ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া শরৎচন্দ্র ইহাকে অটুট রাখিয়া আরও সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছেন। পৃথক হইবার কথা শুনিয়া 'রাম তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া এক গাল হাসিয়া বলিল, (আলাদা হ'য়ে থাকতে) পারব, বৌদি! তুমি, আমি, গোবিন্দ আর ভোলা।' একান্তে স্নেহ-নীড়ের স্নিগ্ধতা উপভোগ করিবার কি আপ্রাণ উৎসাহ! দিগম্বরীর বিষদাঁতের বাহিরে, বিদ্বেষ-বহ্নি হইতে দূরে, কেবল স্নেহের পাত্র কয়টিকে লইয়া নিশ্চিন্তে থাকিবার আশায়, আগ্রহ-আতিশয্যে রাম জিজ্ঞাসা করিল, 'কবে যাওয়া হবে বৌদি?' স্নেহ-প্রবাহের আবেগ নারায়ণীর কণ্ঠ রোধ করিল। সে 'নিরুত্তর হইয়া রহিল।' ইহার পর আর কি বলিবে সে। রামের মুখটা বুকের উপর টানিয়া লইয়া নারায়ণী জিজ্ঞাসা করিল, 'বৌদিকে ছেড়ে একলা কোথাও থাকতে পারবি নে···না?' স্নেহের বন্ধন ও নির্ভরশীলতার স্নিগ্ধ আকর্ষণ লেখক চরিত্রের কর্ম্মধারায় কথোপকথনে ফুটাইলেন। আকর্ষণের দৃঢ়তা দিগম্বরীর দ্বিতীয় প্রচেষ্টা বিফল করিল।

মানুষ কখনও আপন চারিত্রধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। কারণ ইহা মানুষের আত্মিক ধর্ম্ম। জলের স্বভাব-শৈত্য অবিচ্ছেদ্য। গরম

করিলে জলের উত্তাপ কিছুক্ষণের জন্য অনুভূত হয় বটে কিন্তু উষ্ণতার কারণ অবর্ত্তমানে আবার সে স্বভাবতঃ শীতল হইয়া থাকে। সেইরূপ সঙ্কীর্ণতা দিগম্বরীর চারিত্রধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রবৃত্তির সাধারণ প্রেরণায় দিগম্বরীর দ্বিতীয় চেষ্টা বিফল হইলেও তৃতীয় সুযোগের জন্য বেশীদিন অপেক্ষা করিতে হইল না। এবার তাঁহার নজর পড়িল রামের পালিত ও প্রিয় রুই মাছ কার্ত্তিক ও গণেশের প্রতি। দিগম্বরীর 'পিতার প্রেতাত্মা এতদিন দেশের বাড়ীতে চুপ করিয়াছিল, এখন নাত-জামায়ের বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিল; অবশ্য স্বপ্নে—তবুও তাহাকে সন্তুষ্ট করা চাই ত।' রামের 'কার্ত্তিক-গণেশে'র একটিকে উপহার দিয়া দিগম্বরী পিতার প্রেতাত্মাকে সন্তুষ্ট করিতে চাহিলেন। এইরূপ পীড়নে উত্যক্ত হইয়া রাম, পেয়ারা গাছে বসিয়া দিগম্বরীর বিদ্বেষপূর্ণ নানারূপ উক্তি শুনিতে পাইল। অসহ্যে তাহার হাতের বড় একটা কাঁচা পেয়ারা দিগম্বরীর প্রতি 'ধাঁ করিয়া ছুঁড়িয়া মারিল।' দৈবাৎ লক্ষ্যভ্রষ্টে তাহা নারায়ণীকে লাগিল। পূর্ব্ব হইতেই দিগম্বরী ধীরে ধীরে শ্যামলালের মন বিতৃষ্ণ করিয়া তুলিতেছিলেন। শুধু নারায়ণীর ভয়ে ও চক্ষুলজ্জায় শ্যামলাল তাহার মনের বিতৃষ্ণা কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। আজ নারায়ণীর এই আঘাতের অজুহাতে তাহার মনের ধূমায়িত বহ্নি হঠাৎ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি নারায়ণীকে দিব্যি দিলেন। 'যদি ওকে (রামকে) খেতে দাও, যদি কোনদিন কথা কও, যদি কোন কথায় থাকো, সেইদিনে যেন তুমি আমার মাথা খাও,…যেন তোমাকে আমার মরামুখ দেখতে হয়।'

নারীর জীবনে, তাহার স্নেহধর্ম্মে এবার শরৎচন্দ্র সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর পরীক্ষার সৃষ্টি করিলেন। সমাজ-সংস্কারে পালিতা হিন্দু নারী, লোক

ও ধর্ম্মের চক্ষে তাহার স্বামীকে জীবন-দেবতা বলিয়া মানিয়া লইতে শেখে। এই শিক্ষা ও সংস্কারের নির্দ্দেশে হিন্দু নারী পতির উদ্দেশ্যে অনায়াসে জীবন বিসর্জ্জন দিতে পারে। একদিকে জন্মগত সংস্কার ও অন্যদিকে স্নেহের প্রেরণা নারায়ণীর জীবনে এক মর্ম্মান্তিক সংগ্রামের সৃষ্টি করিল। স্নেহ যেমন নারীর আত্মিক ধর্ম্ম, তেমনই স্বামীর অনুশাসন ও কল্যাণও নারীজীবনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ধর্ম্ম। নারী ইহার কোনটিকেই অমান্য করিয়া চলিতে জানে না। করিবার ক্ষমতাও তাহার থাকে না। আখ্যায়িকার পরবর্ত্তী স্ফুরণে শরৎচন্দ্র তাহার সুনিপুণ তুলিকায় এই স্বভাব-দ্বন্দ্বের বিশিষ্ট গতি ও পরিণতি দেখাইয়াছেন। নারায়ণী স্বামীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া তাহা পালনে জীবন পণ করিলেন। রাম পৃথক্ হইয়া অনাহারে নিজের ঘরে শুইয়া রহিল।

নারীজীবনের সকল তৃপ্তি ও সার্থকতা তাহার স্নেহের পাত্রটিকে ভরিয়া উপচাইয়া পড়ে। স্বামীর নির্দ্দেশ পালনের আপ্রাণ চেষ্টায় সে রামকে চোখের আড়াল করিল বটে, কিন্তু তাহার অদর্শনে তাহারই চিন্তায় নারায়ণীর চক্ষে অবিরল অশ্রু বহিতে লাগিল। 'গোপনে কাঁদিয়া কাঁদিয়াই বোধ করি নারায়ণীর গত রাত্রে জ্বর আসিয়াছিল।' স্বভাব ও অনুশাসনের মনোহর দ্বন্দ্বে লেখক উত্তরোত্তর নারায়ণীর প্রতি পাঠকের সহানুভূতি ও সম্ভ্রম বাড়াইয়া তুলিতেছিলেন। দ্বন্দ্বের পরিণতি জানিবার আগ্রহে তিনি পাঠকবর্গকে উৎকর্ণ করিয়া তুলিলেন। অনাহারে তৃতীয় দিবসের পর নারায়ণী সংবাদ পাইল আজ আর 'রাম রাঁধিবার চেষ্টাও করিল না, পড়িতে গেল না, ঘরে শুইয়া রহিল। ...উদ্বেগে উঠিয়া বসিয়া নারায়ণী কাঁদিয়া ফেলিল।' সহজপ্রাণ, শিক্ষা

ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্বে, স্নেহের উৎসে অনুশাসনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া নারীর নগ্ন জীবন আত্মপ্রকাশ করিল। 'পরদিন প্রভাত হইতে না হইতেই (নারায়ণী) স্নান করিয়া রান্না চড়াইয়া দিল।'

স্বভাব-দুরন্ত বালক রাম বৌদির স্নেহবক্ষে আশ্রয় ফিরিয়া পাইবার চেষ্টায় তাহারই শেষ আদেশ 'এখানে থাকিতে নিষেধ করিয়াছিলেন' মনে পড়ায় 'স্থির করিল সে আর কোথাও চলিয়া গেলে বৌদি খুসী হইবে।' যাত্রার সম্বল, দুইটি অভাবে একটি টাকা ভোলার মারফৎ বৌদির নিকট ভিক্ষা চাহিল। স্নেহাশ্রুসিঞ্চিত নারীস্বভাব স্বাভাবিক কোমলতায় পূর্ব্ব হইতেই তরল হইয়া আসিতেছিল, এখন প্লাবনে সকল অনুশাসন ভাসাইয়া দিয়া স্নেহের নিধিটিকে ফিরাইয়া নিতে ছুটিয়া চলিল। 'যা, ভোলা, শীগ্‌গির (রামকে) ডেকে আন্, বল্ আমি ডাকছি।' নারায়ণী রামের হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে টানিয়া লইয়া গেল। দিগম্বরী দেখিলেন, 'সাজান থালার সুমুখে নারায়ণীর কোলের উপর বসিয়া রাম বুকের মধ্যে মুখ লুকাইয়া আছে, এবং তাহার মাথার উপর, পিঠের উপর আর এক জনের অশ্রুবৃষ্টি ধারার মত ঝরিয়া পড়িতেছে।' দিব্যির কথা উল্লেখ করায় নারায়ণী কঠিন হইয়া বলিলেন, 'যার মুখ আছে সে দিব্যি দিতে পারে, কিন্তু...যাকে বুকে ক'রে এতটুকুকে বড় ক'রে তুলতে হয়, সেই জানে হুকুম কোথা থেকে আসে।' আবেষ্টনের প্রতিকূলতায়ও স্বভাব তাহার ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারে না। স্নেহের অবলম্বনকে বাঁচান নারীর একনিষ্ঠ ধর্ম্ম। তাহার এই আন্তর শক্তি সংসারের সকল প্রভাবকেই একে একে পরাভূত করিয়া চলে। 'নারায়ণী আর একবার (রামের) মুখ তুলিয়া ধরিয়া ললাটে ওষ্ঠাধর স্পর্শ করিয়া চোখের জলের ভিতর দিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,

'তুই এখন ভাত খা।' দিগম্বরী কন্যার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

'Man's love is of man's life a thing apart ;

'Tis woman's whole existence'.

কবির এই উক্তির সত্যতা শরৎচন্দ্র জীবনধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। খ্যাতনামা তত্ত্ববিৎ Krafft Ebingও ইহারই সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, 'To woman love is life, to man it is the joy of life.'

*   *
*

হেমাঙ্গিনী

নারীর স্নেহ ও ভালবাসার প্রবাহের কোন নির্দ্দিষ্ট পথ নাই। প্রাণের সহজ প্রবাহে ও সহজাত প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে সে তাহার পথ খুঁজিয়া লয়। নিজ সন্তানের স্নেহে পরের ছেলেকেও সহজে একই গভীরতায় তাই সে স্নেহ করিতে পারে। এই নিয়মের অনুবর্ত্তনে আমরা দেখিতে পাই যে, নারীর স্নেহধারা সামাজিক ও সাংসারিক আত্মীয় বন্ধন ও গণ্ডীর মধ্যে নিবদ্ধ থাকে না। স্নেহের পাত্রটিকে সে আপনাপনি চিনিয়া লয়। যেখানে সে তাহার সন্ধান পায় স্বতঃই চিনিতে পারিয়া, অপ্রতিহত গতিতে সেই দিকে ছুটিয়া যায়। সহজাত বৃত্তিতে আত্মীয়ের সন্ধান পাওয়া নারীজীবনের এক অপূর্ব্ব ও রহস্যময় বৈশিষ্ট্য। শিল্পী শরৎচন্দ্রের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে নারীর এই রূপ ধরা পড়িয়াছে। বিন্দুর অমূল্যচরণ, নারায়ণীর রাম, সামাজিক আত্মীয়তার গণ্ডীর মধ্যে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু মেজদিদির স্নেহের ধন সামাজিক আত্মীয়তার গণ্ডীর সম্পূর্ণ বাহিরে বাড়িতেছিল। মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর স্নেহ-প্রবাহ নিরাবলম্ব ছিল না। তাঁহার নিজ সন্তানসন্ততিগণ মাতৃত্বের আসন অধিকার করিয়াছিল। বিন্দুর অপরিতৃপ্ত মাতৃত্বের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা অমূল্যচরণকে অবলম্বন করিয়া ব্যক্ত ও তৃপ্ত হইয়াছিল। অসহায় দুধের ছেলে রামকে আশৈশব লালনসূত্রে নারায়ণীর মাতৃস্নেহ জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু হেমাঙ্গিনীর স্নেহধারা এক অভিনব ও বিভিন্ন গতিতে আত্মীয়তার গণ্ডীর বাহিরে অকারণ বহিয়া গেল।

কেষ্টর অপরাধ অমার্জ্জনীয়। একে সে বিমাতার সন্তান, তাহার উপর সে মাতৃহীন ও অসহায়। এই অপরাধের বোঝা মাথায় লইয়া

এক অকস্মাৎ উৎপাতের মত সে তাহার বৈমাত্রেয় দিদি কাদম্বিনীর গৃহে উদরান্নের জন্য আসিয়া জুটিল। তাহাকে দেখিবামাত্র এক বিজাতীয় বিদ্বেষে কাদম্বিনী জ্বলিয়া উঠিলেন। মৃত বিমাতার প্রতি যে আন্তরিক আক্রোশ এতদিন তাঁহার মনে ধোঁয়াইতেছিল, বহুদিনের পুঞ্জীভূত সেই বিদ্বেষ আজ এই অসহায় ছেলেটিকে দেখিয়া সহসা জ্বলিয়া উঠিল। নিরপরাধ কেষ্ট শত অপরাধীর মত মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিয়া এই আশ্রয়ে নীরবে মাথা গুঁজিয়া রহিল। দিনের পর দিন অনাদর ও লাঞ্ছনার নিপীড়নে সে শুকাইয়া উঠিতেছিল। 'বস্তুতঃ, আসিয়া অবধি তিরস্কার ও অপমানের অবিশ্রান্ত আঘাতে তাহার মাথা বেঠিক হইয়া গিয়াছিল।'

কি এক অনির্ব্বচনীয় শক্তির প্রেরণায়, রহস্যময় আকর্ষণে, নারীর স্নেহ সম্পদ সজাগ হইয়া ওঠে, তাহার কারণ আমাদের বুদ্ধির বহির্ভূত। লাঞ্ছিত, পীড়িত ও ক্লিষ্টের যে করুণ মূর্ত্তি আত্মীয়ার প্রাণে দয়ার সঞ্চার করিতে পারিল না, বরং তাহার প্রতিহিংসা বৃত্তি আরও বাড়াইয়া তুলিল, কি এক অজ্ঞাত আকর্ষণে, অনাত্মীয়া হেমাঙ্গিনীর প্রাণে তাহা স্নেহ ও সহানুভূতির সঞ্চার করিল। 'তাহার সেই কুণ্ঠিত, ভীত, অসহায় মুখখানির প্রতি চাহিবামাত্রই হেমাঙ্গিনীর বুকের ভিতরটা যেন মুচড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল।' তিনি চাকর ডাকাইয়া, কেষ্ট যে ময়লা কাপড়গুলি কাচিতে বসিয়াছিল, তাহা কাচিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। এবং সন্ধ্যায় কাদম্বিনীর ছেলে পাঁচুগোপালের সহিত কেষ্টকে নিমন্ত্রণ করিলেন। 'ওর মত, আমিও তোমার দিদি হই, কেষ্ট, বলিয়া তাহাকে নিজেদের বাড়ী লইয়া গেলেন।'

নারী চরিত্রের সহজাত বৃত্তি ভালবাসা ও স্নেহের রূপ লইয়া ক্রমবিকশিত হয়। তাহার সমস্ত চেতনা চরিত্রের মূলশক্তি অবলম্বনে

বিভিন্ন রূপ ও ধারায় প্রেয়সী, গৃহিণী ও জননীরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে দেখা দেয়। স্নেহ, দয়া, প্রভৃতি চরিত্রবৃত্তিগুলি নারীর আত্মিক ধর্ম্মেরই বিকাশ। কেমন করিয়া কোন্ সূত্রে যে নারী তাহার স্নেহের পাত্রের সন্ধান পায়, তাহা রহস্যময়। কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যমনীষিগণ নারীর এই বৃত্তিকে সহজাত বৃত্তি বলিয়াছেন। অন্তর্নিহিত এক অব্যক্ত প্রেরণায় সে তাহার স্নেহের পাত্রটি বাছিয়া লয়; ভাল লাগে তাই। নারীর মাতৃত্ব শ্রদ্ধায়, ভালবাসায় ও স্নেহে বিভিন্ন রূপে উৎসারিত হইয়া স্নেহের পাত্রে সঞ্চারিত হয়। আত্মরক্ষা, ক্ষুধা, ঘ্রাণ, স্পর্শ প্রভৃতির মত এই স্নেহতারল্যও নারীর সহজাত। যে কালো রুগ্ন শিশুটি অন্যের প্রাণে কোনও আকর্ষণ সঞ্চার করে না; মায়ের প্রাণে কিন্তু সে সন্তানের প্রতি স্নেহ সদাজাগ্রত থাকে; কেন? তাহার উত্তর নাই। ভালবাসিবার বলিয়াই তাহাকে সে ভালবাসে। নিরাশ্রয়, মাতৃহীন কেষ্ট তাহার একমাত্র আত্মীয় বৈমাত্রেয় দিদি কাদম্বিনীর সহানুভূতি পাইল না। তাহাকে দেখিয়া কাদম্বিনীর মন বিষাইয়া উঠিল। কিন্তু তাহার এই অবস্থা ও লাঞ্ছনার করুণ মূর্ত্তি প্রথম দর্শনেই হেমাঙ্গিনীর প্রাণে স্নেহের সঞ্চার করিল। কোন কোন পরগাছা বৃক্ষের সহিত এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়াইয়া থাকে যে, বৃক্ষের কাণ্ডটি যতই বাড়িতে থাকে, পরগাছাটি ততই তাহাতে একাঙ্গী ভাবে মিশিয়া যায়। তখন সেই পরগাছাকে আর কাণ্ডচ্যুত করিতে পারা যায় না। নারী-চরিত্রও তেমনই স্নেহের অবলম্বনকে একান্তে আত্মীয় করিয়া লয়। আখ্যায়িকার পরিবর্দ্ধনে, চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশে লেখক এই সত্যের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

প্রতিকূল শক্তির সংঘাতে, সংস্কার ও আবেষ্টনের সাহায্যে লেখক

হেমাঙ্গিনীর স্নেহের শক্তি পরীক্ষা করিলেন। অনাত্মীয়, অপরিচিত ও অনাথা বালকটিকে তাঁহার স্নেহাশ্রয়ে রাখিতে জা, ভাশুর এমন কি স্বামীরও কত লাঞ্ছনা এবং উৎপীড়ন হেমাঙ্গিনী সহ্য করিলেন। হেমাঙ্গিনীর সত্যকার মাতৃস্নেহের উত্তাপে কেষ্ট একেবারে গলিয়া গেল। সহানুভূতি স্নেহকে সাবলীল করিয়া তোলে। কাদম্বিনী যতই কেষ্টকে পীড়ন করিতেছিলেন, কারুণ্যে ততই কেষ্টর প্রতি হেমাঙ্গিনীর স্নেহ গভীর হইয়া উঠিতেছিল। অন্যদিকে কাদম্বিনীর বিদ্বেষে দগ্ধ হইয়া যতই কেষ্ট হেমাঙ্গিনীর স্নেহামৃত উপভোগ করিতেছিল, ততই তাহার মন মেজদিদি হেমাঙ্গিনীর প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। সাগরবক্ষে ঝড় যত প্রচণ্ড হয়, বক্ষস্থিত তরীকে নোঙরের শক্তির উপর ততই নির্ভর করিতে হয়। কাদম্বিনীর অত্যাচার যতই বাড়িতে লাগিল, কেষ্ট ততই আত্মরক্ষার অনুপ্রেরণায় প্রাণের সকল শক্তিতে হেমাঙ্গিনীকে আঁকড়াইয়া ধরিল। মেজদিদিকে দেখিবার একটু সুযোগের আশায় সে উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত, কোন বাধা মানিতে চাহিত না। একদিকে স্নেহের আকর্ষণ, অন্যদিকে আবেষ্টনের প্রতিকূলতা হেমাঙ্গিনীকে নিরুপায় করিয়া তুলিল। "তোর (কেষ্টর) এই মেজদিদি যে তোর চেয়ে নিরুপায়। তোকে জোর করে বুকে টেনে আনবে সে ক্ষমতা যে তার নেই ভাই।" এই কয়টি কথার ভিতর দিয়া দ্বন্দ্ব-ক্লিষ্ট হেমাঙ্গিনীর মন পাঠকের কাছে উন্মুক্ত হইয়াছে। নিরুপায় হেমাঙ্গিনীর স্নেহাশ্রু চোখ ফাটিয়া বাহির হইল। সহানুভূতিতে পাঠকের মন ভরিয়া উঠিল।

শুধু যে কাদম্বিনীর নিকট হইতে সেই প্রতিকূলতা আসিতেছিল তাহা নয়, স্বামী বিপিনও বাঁকিয়া বসিলেন। হেমাঙ্গিনীর স্নেহাপ্লুত

করুণ প্রার্থনা, 'কেষ্টকে আমাকে দাও, ও বেচারী বড় দুঃখী, ওর মা বাপ নেই—ওকে ওরা মেরে ফেলচে; এ আর আমি চোখে দেখতে পারচি নে', স্বামী বিপিন, 'তা'হলে চোখ বুজে থাকলেই ত হয়' বলিয়া নিষ্ঠুরভাবে অগ্রাহ্য করিলেন। হেমাঙ্গিনী বুঝিলেন, স্বামীর প্রাণে অনাথা বালকটির প্রতি কোন করুণাই জাগিবে না।

স্নেহ, ভালবাসা, ক্ষমা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি মানব মনের ধর্ম্ম। আবার ক্রোধ, বিদ্বেষ, বীতরাগ প্রভৃতি হীনবৃত্তিগুলিও সে-মনের স্বভাব। আমাদের স্নেহাস্পদের গুণগুলি যেমন আমাদের অনুক্ষণ মনে পড়ে তাহার প্রতি স্নেহ আরও গভীর করিয়া তোলে, তেমনই যাহাকে আমরা বিদ্বেষের চক্ষে দেখি তাহার দোষ ক্রটিগুলি আমাদের চোখে বড় হইয়া ফুটিয়া ওঠে বিদ্বেষ ও বীতরাগ আরও বাড়াইয়া তোলে। রামের দুরন্তপণা নারায়ণীর কাছে তাহার বালসুলভ চাপল্য বলিয়া মনে হইত, কোন দোষ তিনি দেখিতে পাইতেন না। দিগম্বরীর সঙ্কীর্ণ মন কিন্তু উহাতে বিষাইয়া উঠিত। নারায়ণীর স্নেহে রাম দিগম্বরীর চক্ষুশূল হইয়া উঠিতেছিল। হেমাঙ্গিনীর স্নেহচ্ছায়ায় যদি কেষ্টর পীড়নের কিছু লাঘব হয় এই আক্রোশে তাহার প্রতি কাদম্বিনীর বিদ্বেষ আরও বাড়িয়া গেল। কেষ্টর নিরাশ্রয় অবস্থার সুযোগে কাদম্বিনী তাঁহার মৃত বিমাতার প্রতি জাতক্রোধের একটা প্রতিশোধ লইবার অবসর পাইয়াছিলেন কিন্তু হেমাঙ্গিনীর অকারণ স্নেহে সেই আক্রোশ চরিতার্থে বাধা পাইয়া কাদম্বিনী অধিকতর উগ্র হইয়া উঠিলেন। মানবচরিত্রের স্নেহ, ক্রোধ, করুণা ও নির্ভরতার এক মনোহর রূপ শরৎচন্দ্র ফুটাইয়া তুলিলেন। সংঘাতে বিভিন্ন চরিত্রের অন্তর্নিহিত শক্তি কিরূপে আত্মপ্রকাশ করে তাহাই স্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। চরিত্রের উৎকৃষ্ট শক্তিগুলি দ্বন্দ্বে

নিকৃষ্টকে পরাজিত করিয়া দৃঢ়তর হইয়া উঠিল। রামের প্রতি দিগম্বরীর বিদ্বেষ যতই তীব্র হইতেছিল তাহাকে রক্ষার সঙ্কল্প নারায়ণীর ততই সুদৃঢ় হইতেছিল। হেমাঙ্গিনীর স্নেহও কাদম্বিনীর বিদ্বেষে ও স্বামীর বিরূপতায় শক্তিশালী হইতেছিল। প্রার্থনা যখন স্বামী উপহাসে উড়াইয়া দিলেন, কেষ্টকে রক্ষা করিতে কোন স্থান হইতে কোনরূপ সাহায্যই পাইবেন না, ইহা যখন হেমাঙ্গিনী বুঝিতে পারিলেন, তখন কেবলমাত্র নিজ চারিত্রশক্তিতে নারায়ণীর মত তাহাকে রক্ষা করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন। একমাত্র কেষ্টকে সঙ্গে লইয়া, এমন কি নিজ সন্তান পর্য্যন্ত পতিগৃহে রাখিয়া, তিনি নিরাশ্রয়কে আশ্রয় করিয়া প্রতিকূল আবেষ্টনের গণ্ডী ত্যাগ করিলেন। স্বামীর জিজ্ঞাসায় জানাইলেন, "কখনও যদি কোথাও এর (কেষ্টর) আশ্রয় জোটে তবেই ত একা ফিরে আসতে পারব, না হয় একে নিয়েই থাকতে হবে।" স্বামী বিপিন বুঝিতে পারিলেন, জোর করিয়া নারীকে তাহার স্নেহব্রত হইতে বিমুখ করা যায় না। বাধাপ্রাপ্ত নদীর মত সে সকল প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করিয়া স্বভাবধর্ম্মে দ্বিগুণ বেগে ছুটিয়া চলে। বলিলেন, "মাপ কর, মেজবৌ, বাড়ী চল।" চরিত্রশক্তির পূর্ণ বিকাশে প্রতিকূল আবেষ্টন অনুকূল হইয়া উঠিল। * বিপিন শপথ করিয়া বলিলেন, "আমি বেঁচে থাকতে তোদের দুই ভাইবোনকে আজ থেকে কেউ পৃথক করতে পারবে না।" স্নেহব্রতে নারীত্বের পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় হেমাঙ্গিনী অবিরোধে কেষ্টকে ভ্রাতার আসনে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

* *
*

* Great plot is that only which shows how circumstance is bent on personality or character—Winchester.

গঙ্গামণি ও কুসুম

নারীর একনিষ্ঠ স্নেহ ও ভালবাসার মূর্ত্তি শরৎচন্দ্রের তুলিকাপাতে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে। তিনি দেখিয়াছেন যে, স্নেহধারা নারীচরিত্রের আকস্মিক সম্পদ নয়। ইহা তাহার অন্তর-নির্ঝরের স্বাভাবিক উৎস। স্নেহ ও ভালবাসার তারল্যে নারীর জীবন গঠিত। পার্ব্বত্য ঝরণার সহজ ধারার মত নারী এক অজানা অন্তর্নিহিত শক্তিতে তাহার স্নেহ প্রবাহিত করিয়া দেয়। যেখানে অবলম্বনের সন্ধান পায়, স্নেহের পাত্রটিতে নিজেকে সঞ্চারিত করিতে পথের শত বাধা বিঘ্ন সে অগ্রাহ্য করিয়া চলে। গতির সহজ-সারল্যে তাহার নারীত্ব স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছ হইয়া ওঠে। যদি বাধা পায়, উপলখণ্ডে বাধাপ্রাপ্ত নির্ঝরিণীর মত তাহা কল্লোলিয়া ওঠে। বাধা অতিক্রমণে, আবার স্বচ্ছ ও সহজ গতিতে অবলীলাক্রমে অগ্রসর হয়। পথের বিঘ্ন যতই প্রবল হয়, নারী বৃহত্তর শক্তিতে তাহা অতিক্রম করে। হয়ত সংগ্রামে, দ্বন্দ্বের তীব্রতায় সে বিকৃত হইয়া পড়ে, তাহার সাবলীল স্নেহময়ী রূপ পরিবর্ত্তিত হয়। স্বভাবতারল্যে নিঃশেষে নিজেকে নিঃস্ব করিয়া স্নেহের পাত্রটিকে পরিপূর্ণ করিয়া তোলে। স্বভাব গতির এই পরিণতিতে নারী তাহার জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করে। অবলম্বনের অভাবে তাহার তরল হৃদয়ে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়, সেই শূন্যতার হাহাকার লইয়া নারী বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। যতদিনে, যতদূরে হউক গড়াইয়া গিয়াও সে অবলম্বনে নির্ভর করে। যদি নারী জীবনে নির্ভরস্থল কখনও হারায়, শূন্যতার নিপীড়নে সে ছিন্নমূল বৃক্ষের আশ্রিত লতার মত বিকৃত রূপে বিবর্ণ হইয়া ওঠে। পতিতা নারীর বোধ হয় ইহাই জীবনেতিহাস।

অভিমানী বিন্দুর চরিত্রে এই স্বাভাবিক শক্তি জীবনপণে আবেষ্টনকে অনুকূল করিয়া স্নেহের দাবীতে অমূল্যচরণকে ফিরিয়া পাইল। আমরা দেখিলাম স্নেহের অবলম্বনই নারীর সঞ্জীবনী-শক্তি। পাঠক লেখকের তুলিকায় স্নেহবিচ্ছিন্ন নারীর জীবনে মৃত্যুর কালো ছায়া দেখিতে পাইলেন। সকল প্রতিকূলতাকে প্রতিহত করিয়া নারায়ণী রামকে বুকে ধরিয়া রাখিলেন। ঝঞ্চার তীব্রতায়, প্রলয়ের আশঙ্কায় যেমন নীড়ের পাখী তাহার শাবকটিকে পক্ষপুটে গাঢ়তর আলিঙ্গনে নিবদ্ধ রাখে ; ঝঞ্চার সকল তাড়ন নিজে বরণ করিয়া লয়, তেমনই মাতার ক্রোধ, এমন কি স্বামীর অনুশাসন পর্য্যন্ত অগ্রাহ্য করিয়া নারায়ণী রামকে তাঁহার স্নেহে ধরিয়া রাখিলেন। প্রতিকূলতায়, দ্বন্দ্বে আত্মশক্তি উজ্জ্বলতর রূপে প্রকাশিত হইল। নিঃসম্পর্কীয় পরের ছেলে কেষ্ট, নিরাশ্রয় ও নিপীড়নের করুণ মূর্ত্তিতে হেমাঙ্গিনীর স্নেহনীড়ে শিকড় গাড়িয়া বসিল। নিজ সংসারের প্রতিকূল আবেষ্টনকে আত্মশক্তির প্রবাহে অনুকূল করিয়া স্নেহ-দরদে তিনি কেষ্টকে আপন করিলেন। লেখকের অন্যতম সৃষ্টি 'দস্যি ছেলে গয়ারাম' (মামলার ফল) হয়ত বিমাতার অকরুণ আশ্রয়ের হাত হইতে নিস্তার পাইবার আগ্রহে জোর করিয়া জ্যেঠাইমা গঙ্গামণির স্নেহের রাজ্যে একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। তাহার স্নেহদৌরাত্ম্যের নিগূঢ় আকর্ষণে গঙ্গামণি সব ছাড়িয়া গয়ারামের পর্ণকুটিরে তাহাকে আগলাইয়া বসিলেন।

কুসুম (পণ্ডিতমশায়) স্বামীর গৃহসুখবঞ্চিতা ছিল। আত্ম-সম্মান বোধে সুযোগ পাইয়াও সে স্বামীর সংসার করিতে চায় নাই। সেই আঁধার হৃদয় কোন গবাক্ষপথে সপত্নীপুত্র চরণ প্রবেশ করিয়া একেবারে দখল করিয়া বসিল। এই দখল ছাড়িয়া যেদিন চরণ চলিয়া

গেল, 'তাহার ক্ষুদ্র দেহ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল' কুসুম স্বীকার করিল যে, চরণ যে-মন্ত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিয়া গিয়াছে, সে সেই দীক্ষাই জীবনে বরণ করিয়া লইবে। স্বামীর গাঁয়ে ওলাউঠার প্রাদুর্ভাবে চরণকে কুসুমের কাছে রাখিতে আনিলে রাগে ও অভিমানের ক্ষণিক মোহে কুসুম সে-আশ্রয় দানে স্বীকৃত হয় নাই, প্রতিশোধে যেন অভিমানভরে তাই চরণ সংসার ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আপন মৃত্যুতে চরণ কুসুমকে শিখাইল যে, স্নেহাস্পদকে যে নারী প্রত্যাখ্যান করে, তাহা যে-কোন কারণেই হউক না কেন, সংসারে সেই নারীর থাকিবার কোনই অবলম্বন থাকে না। তাহার পক্ষে সংসার পরিত্যাগই একমাত্র ও অপরিহার্য্য বিধান। এইরূপে প্রতি তুলিকাক্ষেপে, আলো ও ছায়ার সন্নিবেশে নারী-চরিত্রের অন্তর্গূঢ় শক্তি লেখকের চিত্রে নিখুঁতভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

*   *
*

পার্ব্বতী

সৃষ্টিতত্ত্বের মূলকথার দিকে তাকাইলে দেখিতে পাওয়া যায় প্রতি অণু পরমাণু নিরন্তর আপনাকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে চায়। দৃশ্যে-অদৃশ্যে, অন্তরে-বাহিরে প্রকৃতির তাই এই নিত্য পরিবর্ত্তন। এবং এইজন্যই পুরুষ-শক্তি জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, যেখানে সে আপনাকে আরও সুন্দর আরও সার্থক করিয়া তুলিতে পারিবে সে লোভ সে কখনও কোনক্রমে ছাড়িতে পারে না। ভালবাসা হইল সৃষ্টিলীলার রূপান্তর। লজ্জাগ্লানির অতিরিক্ত একটা বৃহত্তর সার্থকতার ইঙ্গিত একজনকে আর একজনের কাছে টানিয়া লইয়া যায়। বিশ্ব জুড়িয়া অবিচ্ছিন্ন সৃষ্টির ও রূপের খেলা চলিতেছে ; ইহাতে যুক্তির স্থান নাই। জীবের প্রতি অণু পরমাণু, প্রতি রক্তকণা উৎকৃষ্টতর পরিণতির মধ্যে আপনাকে সুবিকশিত করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারে না। জীবনের পরিপুষ্টির প্রারম্ভে, যখন এই সহজাত প্রেরণা নিজ দেহের নির্দ্দিষ্ট সীমা ছাড়াইয়া যায়, অধিকতর সার্থকতার প্রয়াসে সে অন্তরে এক দুর্দ্দমনীয় প্রেরণার সৃষ্টি করে, শিরায় শিরায় বিপ্লবের তাণ্ডব সুরু করে। (চরিত্রহীন)।

জন্মাবধি অন্তর্নিহিত শক্তির অনুপাতে প্রবৃত্তির অল্পবিস্তর তাড়না আমরা অনুভব করি। আমাদের শৈশব-সুলভ কর্ম্মধারা বিশ্লেষণ করিলে হয়ত এই তাড়নার নির্দ্দেশ আমরা দেখিতে পাই। সহজাত ধর্ম্মের অজ্ঞাত প্রেরণায় শৈশবকাল হইতেই এই লীলাপ্রবাহ আমাদের ভিতর আরম্ভ হয়। ক্রমশঃ যৌবনে এই প্রবাহের ধারা দুর্দ্দমনীয় হইয়া দাঁড়ায়। সমধর্ম্মী চরিত্র দেবদাসের খেলার সাথী অষ্টম বর্ষীয়া পার্ব্বতী খেলাধূলায় দেবদাসের সাথে বাড়িতেছিল। শিশুকাল হইতেই দেবদাসের দুরন্তপণা শক্তির এক অনুকূল প্রবাহে পার্ব্বতীর শিরায় শিরায়, অণু

পরমাণুতে তাহার সুপ্ত নারীত্ব বিকচোন্মুখ করিয়া তুলিতেছিল। দেবদাসের শাসন-তিরস্কার, সংসারের অনুশাসনে বিদ্রোহী এক অভিনব আকর্ষণ পার্ব্বতীর বালিকা হৃদয়ে ধীরে ধীরে অনুরাগের সৃষ্টি করিতেছিল। বালসুলভ চাপল্যে, দুরন্তপণায়, ভুলোকে দেবদাস চূণের গাদায় ফেলিয়া দিল। চূণমাখা অদ্ভুত আকৃতি ভুলোকে দেখিয়া পার্ব্বতীর হাসি আর থামে না। চপল হাসির মধ্যে শুধু যে ভুলোর প্রতি ব্যঙ্গ ছিল তাহা নয়; ব্যঙ্গের অন্তরালে দেবদাসের শক্তির প্রতি প্রচ্ছন্ন অনুরাগও রহিয়াছে। শক্তিমান্ চরিত্রের স্বাভাবিক আকর্ষণে তরল নারীশক্তি সহজে আকৃষ্ট হয়। চরিত্রশক্তির বলবত্তার উপর নির্ভর করিয়া নারী নির্ব্বিচারে নিজেকে বহাইয়া দেয়। তাই নির্ভরতায় সে তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় পায়। নির্ভর ও—আকর্ষণ যতই দৃঢ় হয়, নারী ততই অনুরাগী হইয়া ওঠে। নারী-চরিত্রের ইহা নিগূঢ় সত্য। * নারীর স্বাভাবিক মন এমন শক্তিমান্ সহচর চায় যে, দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে, বুদ্ধিতে তাহার অপেক্ষা বড়। সে চায় তাহার সকল হৃদয় জুড়িয়া শক্তিমানের সুদৃঢ় অস্তিত্ব অনুভব করিতে। এইরূপ এক শক্তির স্পর্শে, স্বভাব-ধর্ম্মে পার্ব্বতী দেবদাসের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছিল। যে শক্তির উৎস নারীর দেহ ও মনে তাহার বলবত্তার অভাবনীয় অনুরণন ও আনন্দের হিল্লোল

---

* Every man who becomes famous, either for good or evil, the fashionable actor, the celebrated tenor etc. has the power of exciting love in a woman Women without education or those of inferior mental quality are naturally more easily affected by bodily strength of man, and his external appearances in general.—Forel, 'The Sexual Question'.

জাগাইয়া তোলে—তাহার সুপ্ত নারীত্বকে সম্পূর্ণরূপে বিকশিত করিয়া তোলে, সেই শক্তিকে সঞ্জীবিত ও বলবত্তর করিয়া তুলিতে, দৃঢ়রূপে প্রকাশিত দেখিতে, নারী তাহার স্নেহের উৎস উজাড় করিয়া, অমৃত পান করাইয়া তাহাকে বাঁচাইতে ও বাড়াইতে চায়। ইহা হইল নারীর ভালবাসার স্বরূপ।

শাস্তির ভয়ে গৃহ হইতে পলাতক দেবদাসের ক্ষুন্নিবারণ করিতে পার্ব্বতী, 'আঁচলে মুড়ি বাঁধিয়া জমীদারের আমবাগানের ভিতর প্রবেশ করিল।' সন্দেশ ও জলের প্রলোভনে দেবদাসকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে চেষ্টা করিল। দেবদাস আর ঘরে ফিরিবে না, কোথাও চলিয়া যাইবে বলায়, 'তাহার চোখে জল আসিল, কহিল, "দেবদা, আমিও যাব। যাবই—।" ' এই কথাগুলিতে অনুরাগের প্রথম রূপ বিকচোন্মুখ দেখাইয়া লেখক পার্ব্বতীকে লালিমাভ করিয়া তুলিলেন। স্ফুটন্ত কোরকের প্রথম রূপে পাঠক মুগ্ধ হইল। দেবদাস পাঠশালায় যায় না, যে পাঠশালায় দেবদাস নাই, দিনের সুদীর্ঘ সময় সে স্থানে কাটাইতে পার্ব্বতীর প্রাণ চায় না। মাছ-ধরার ছিপ কাটিতে দেবদাস তাহাকে সঙ্গে নিল। বাঁশের ডগা নত করিয়া পার্ব্বতীকে ধরিতে দিয়া কহিল, "দেখিস্, যেন ছেড়ে দিসনে, তা' হ'লে পড়ে যাব।" হঠাৎ অন্যমনস্ক পার্ব্বতীর হাত হইতে ডগাটি ছুটিয়া ঊর্দ্ধে উঠিয়া গেল, নীচে পড়িয়া দেবদাসের হাত পা ছড়িয়া গেল। 'ক্রুদ্ধ দেবদাস একটা শুষ্ক কঞ্চি তুলিয়া পার্ব্বতীকে পিঠের উপর, গালের উপর, যেখানে সেখানে বসাইয়া দিল'। তাহার কান্না ও গায়ে দাগ দেখিয়া, ঠাকুমা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে মারিয়াছে, চোখ মুছিতে মুছিতে পার্ব্বতী বলিল, পণ্ডিতমশাই।' এইরূপে বালিকা তাহার কিশোর প্রাণের সহজ প্রেরণায়, দেবদাসের

দোষ পণ্ডিতমশায়ের ঘাড়ে চাপাইয়া, স্কুলের সময়টা দেবদাসের সহিত কাটাইবার সুযোগ করিয়া লইল।

এইরূপে একটি শক্তিমান্ অশান্ত বালক ও মুগ্ধা বালিকা, 'সারাদিন রোদে ঘুরিয়া বেড়ায়, সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া মারধোর খায়। আবার সকাল বেলা উঠিয়া পলাইয়া যায়, আবার তিরস্কার, প্রহার ভোগ করিয়া, রাত্রে নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে নিদ্রা যায়।' বেয়াড়া, দুর্দ্দান্ত দেবদাসের সকল কাজে পার্ব্বতী তার একমাত্র সঙ্গিনী; রৌদ্র, বৃষ্টি, জলকাদা, প্রহার ও তিরস্কার প্রভৃতি সকল কষ্ট ও শাসন, দেবদাসের আকর্ষণে, তাহার সঙ্গলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় পার্ব্বতীর নিকট তুচ্ছ হইয়া যায়। দেবদাসের 'পারু' ডাকটিতে এক অজানা রসের আস্বাদ পাইয়া তাহার সমস্ত দেহ-মন তৃপ্তিতে ভরিয়া ওঠে; দুঃখ, কষ্ট, খেলার ক্লান্তির মত, দেবদা'কে পাওয়ার তৃপ্তিতে দূর হইয়া যায়।

এইরূপে পার্ব্বতী দেবদাসের উপর নির্ভর করিয়া এবং দেবদাস পার্ব্বতীকে অবলম্বন করিয়া বাল্যে বাড়িয়া উঠিতেছিল। এই বালক বালিকার পরস্পরের নির্ভর ও অবলম্বন কতটা সুদৃঢ় ও তাহাদের জীবনে কতটা গভীর দাগ কাটিয়াছিল তাহা চরিত্র দুইটির উত্তর-বিকাশে লেখক দেখাইয়াছেন। খেলার সাথী দেবদাসে নির্ভর করিয়া পার্ব্বতী তাহার দিনগুলি কাটাইতেছিল। সাথীর উপর এই নির্ভর তাহার স্বভাব-ধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল কিনা, কিম্বা দেবদাস শুধু তাহার খেলার ঘরের ক্রীড়নক মাত্র ছিল, এই প্রশ্নের সহজ বিকাশ ও স্বাভাবিক সমাধান লেখক আখ্যায়িকার পরিবর্দ্ধনে দেখাইয়াছেন। পার্ব্বতীর প্রাণে দেবদাসের যে আকর্ষণের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার শক্তি-পরীক্ষার জন্য লেখক দেবদাসকে স্থানান্তরিত করিলেন। বিদ্যার্জ্জনের অজুহাতে

কলিকাতায় রাখিয়া প্রাণের সহজ ধর্ম্ম পরীক্ষার সুযোগ করিয়া লইলেন। বিচ্ছেদের প্রথম ধাক্কা দেবদাস ও পার্ব্বতীর মনে সমভাবেই লাগিল। "দেখো, যেন যেও না দেবদা", পার্ব্বতীর এই উক্তির উত্তরে দেবদাস জোরের সহিতই বলিল, "কক্ষণও না।" কিন্তু পিতার ব্যবস্থায় জননীর আশীর্ব্বাদ লইয়া দেবদাস যখন কলিকাতা চলিয়া গেল, পার্ব্বতীর সঙ্গীহীন জীবন নিতান্তই অসহ্য হইয়া পড়িল। দেবদাসের সহিত 'গোলমালে হুজুগে' তাহার সারাদিন কাটিয়া যাইত, অবসর পাইত না, 'এখন অনেক সময়, কিন্তু এতটুকু কাজ খুঁজিয়া পায় না।' অবসরের অসহ্য ভারে তাহার দম আটকাইয়া আসিতেছিল, সে পুনরায় পাঠশালায় যাইবে স্থির করিল। কিন্তু সেই পাঠশালাতেও শুধু দেবদাসের স্মৃতি তাহাকে সর্ব্বক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল।

পার্ব্বতীকে ছাড়িয়া বিদেশে যাইবার শোকটা দেবদাসের প্রথমে খুবই লাগিয়াছিল, কিন্তু যতই কাল কাটিতে লাগিল, সহরের নানা আকর্ষণ, পোষাক, আচার ব্যবহার দেবদাসের মনের অনেকখানি জুড়িয়া বসিল। এবার বাটি হইতে কলিকাতা যাইবার সময় দেবদাসের কান্নাকাটিতে 'সেবারের মত তেমন গভীরতা রহিল না। স্বভাবের পরিবর্ত্তন দেখিয়া পার্ব্বতী গোপনে কাঁদিয়া অনেক অশ্রু মোচন করিল।' বিদেশী ফ্যাশান ভূষণে, আদব কায়দায় যেন দেবদাসের প্রাণে পূর্ব্বেকার আকর্ষণ অনেকটা লাঘব করিয়া দিয়াছিল, 'বাল্যস্মৃতি জড়িত দু'একটা সুখের কথা যে এখনও মনে পড়ে না তাহা নয়;—কিন্তু নানা কাজের উৎসাহে সে সকল আর বেশীক্ষণ হৃদয়ে স্থান পায় না।' এবার নিতান্তই পিতামাতার জোর তাগিদে ইচ্ছা না থাকিলেও দেবদাস তালসোণাপুরের বাটিতে আসিল। বিচ্ছেদের দহনে পার্ব্বতী অনুক্ষণ জলিয়া পুড়িয়া

মরিতেছিল, বিরহের ব্যথা তাহার দিন দিন তীব্রতর হইয়া উঠিতেছিল। দেবদাসের ভিতর কিন্তু সে বিরহ-বহ্নি নানারূপ আকর্ষণে শীতল হইয়া আসিতেছিল। বিরহের পীড়নে হৃদয়ের সকল আকাঙ্ক্ষা একমুখী, হইয়া পার্ব্বতীর প্রাণে, তাহার 'দেবদা'র' প্রতি আকর্ষণ বলবত্তর করিয়া তুলিতেছিল, বেদনায় প্রেম গভীরতর হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল দেবদাস যেন পার্ব্বতীকে ততই ভুলিয়া যাইতেছিল, অন্তরঘন প্রেম-প্রবাহ দিন দিন বহির্ম্মুখী ও বহুমুখী হইয়া ধীরে ধীরে পার্ব্বতীকে দূরে ঠেলিয়া ফেলিতেছিল। পুরুষ ও নারী চরিত্রের স্বাভাবিক রূপ ও ধর্ম্ম লেখকের অভিনব তুলিকাস্পর্শে কিশোর দেবদাস ও কিশোরী পার্ব্বতীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। Madame Stael এবং অন্যান্য নারীচরিত্রবিশারদগণ বলিয়াছেন যে, পুরুষ জীবনে নারীর প্রতি প্রেম ও ভালবাসা একটি আকস্মিক সংঘটনা মাত্র, কিন্তু নারীর হৃদয়ে এই প্রেম ও আকর্ষণ তাহার সকল হৃদয় জুড়িয়া আত্মিক ধর্ম্মরূপে প্রকাশিত হয়। * কবি Byronও নারীর অন্তর্নিহিত চরিত্রশক্তির এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম ভাবাপ্লুত করিয়া বলিয়াছেন :

> 'Man's love is of man's life, a thing apart ;
> 'Tis woman's whole existence.'

জীবন সত্যের স্বাভাবিক রূপ লেখক শরৎচন্দ্র তাঁহার সুনিপুণ তুলিকায় ফুটাইয়া তুলিলেন। বিরহের পরীক্ষায় নারীর স্বভাবধর্ম্ম পার্ব্বতীর চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করিল।

---

* Love is an episode merely in the life of a man, of woman it is the entire history.

পাৰ্ব্বতী

তের বৎসরের পার্ব্বতী প্রথম যৌবনে পদার্পণ করিল। বাল্যে প্রেমের যে বীজ তাহার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হইতেছিল যৌবনের প্রেরণায় সান্নাল ও রসাল মাটির সাহচর্য্যে সে অঙ্কুর ধীরে ধীরে বাড়িয়া উঠিল। বিবাহের প্রস্তাব, জমীদার বাড়ীতে অগ্রাহ্য হইয়াছে শুনিয়া পিতা নীলকণ্ঠ, 'এক হপ্তার মধ্যে আমি সম্বন্ধ স্থির ক'রে ফেলব, বিয়ের ভাবনা কি' এই মন্তব্য প্রকাশ করিলেন। শুনিয়া 'পার্ব্বতীর মাথায় বাজ ভাঙিয়া পড়িল।' জীবনের একমাত্র অবলম্বন দেবদাসকে, 'হারানোর কথা উঠিতেই তাহার সমস্ত হৃদয় ভরিয়া একটা ভয়ানক তুফান উঠিতে লাগিল।' '...কিন্তু দেবদাসের সম্বন্ধে এ কথাটি ঠিক খাটানো যায় না; ছেলেবেলায় যখন সে পার্ব্বতীর উপর দখল পাইয়াছিল, তখন তাহা সে পূর্ণভাবেই উপভোগ করিয়াছিল।—সে জানিত না পার্ব্বতী তাহার সেই একঘেয়ে গ্রাম্যজীবনের মধ্যে নিশিদিন তাহাকেই ধ্যান করিয়া আসিতেছে।' এস্থলে আমরা দেখিতে পাই যে পার্ব্বতী চরিত্রে যাহা একমাত্র অবলম্বন, দেবদাসের জীবনে তাহা আত্মিক ধর্ম্মরূপে প্রকাশ পাইল না। যাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে পার্ব্বতীর জীবন ঝরা ফুলের মত আপনিই শুকাইয়া যাইবে, দেবদাসের জীবনে তাহাই একমাত্র সঞ্জীবনীরূপে দেখা দিল না। নারী ও পুরুষের চরিত্র ও জীবনধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য আবার লেখকের নৈপুণ্যে ভাস্বর হইয়া উঠিল। শত ঝঞ্ঝা ও বিপত্তির মধ্যে একান্তে নির্ভর আশ্রয়টি অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার শেষ প্রচেষ্টায় পার্ব্বতী নিশীথে একাকী দেবদাসের শয়নকক্ষে প্রবেশ কবিল। অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে জাগ্রত নারীত্ব বুঝিতে পারিয়াছিল যে, দেবদাস একমাত্র তাহারই। সহজাত অন্তর-প্রেরণায় তাই সে দেবদাসের চরণে

স্থান প্রার্থনা করিতে আসিল এবং সখীর নিকট বলিল, 'তাহার বরের নাম, শ্রীদেবদাস।'

নারীর স্বভাব-তারল্য তাহার সমস্ত সত্বাকে সহজাত প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে নিয়ন্ত্রিত করে। পার্ব্বতীও তাই আবেষ্টনের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও দেবদাসের চরণে সর্ব্বস্ব নিবেদন করিতে গেল এবং আশ্রয় না পাইয়াও বিশ্বাস হারাইল না; ভাবিল, "দেবদা' আবার আসবে, আবার আমাকে ডেকে বলবে, 'পারু, তোমাকে আমি সাধ্য থাকতে পরের হাতে দিতে পারব না'।" কিন্তু দেবদাসের চিঠি অন্তরের এই নির্ভরশীলতায়, বিশ্বাসে, একটা প্রবল ধাক্কা দিল। দেবদাস লিখিল, "তোমাকে যে আমি ভালবাসিতাম তাহা আমার কোনদিন মনে নাই; আজও তোমার জন্য আমার অন্তরের মধ্যে নিরতিশয় ক্লেশ বোধ করিতেছি না।" এবং আরও জানাইল যে, দেবদাস তাহার বিচার বুদ্ধিতে পিতামাতার অনুশাসনের নিকট পার্ব্বতীকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতে চায়; সে যে 'নীচু বেচা-কেনা ঘরের' মেয়ে তাহাও দেবদাস লিখিতে ভুলিল না। ছোট বেলা হইতেই দেবদাস ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন কাজ করিতে বা কোন কথা বলিতে শেখে নাই। মায়ের চোখের জল ও বাপের রুক্ষ শাসনের প্রথম ধাক্কায় দেবদাসের মনে যাহা আসিয়াছিল, দুরন্ত মতি দেবদাস সেই রুদ্ধ রোষের প্রথম নিষ্ঠুর নিঃশ্বাসটি পার্ব্বতীর বক্ষে নিক্ষেপ করিল। আঘাতের গুরুত্ব ও ফলাফল পূর্ব্বে যেমন সে কোনদিন ভাবিয়া দেখে নাই, আজও তেমনই ভাবিতে পারিল না। ছেলেবেলা হইতেই দেবদাসের মনে যখনই কোন রাগ বা বিরক্তির সঞ্চার হইয়াছে, সে যে কোন কারণেই হোক না কেন, প্রথম আক্রোশটি পার্ব্বতীর উপর পড়িয়াছে। এই স্বভাব ধর্ম্মে পিতামাতার প্রতি রুদ্ধ

ক্রোধের আবেগে সে নির্ব্বিচারে পার্ব্বতীকে আঘাত করিয়া বসিল। পূজার অর্ঘ্য—নির্ভরতায় নিঃশেষে নারীর আত্মনিবেদন—যখন দেবতা অবহেলায় প্রত্যাখ্যান করে, তখন আঘাতে নারীর চরিত্রভিত্তি একেবারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সর্ব্বপ্রকার নির্য্যাতন, কষ্ট ও দুঃখ, বিপদের আবর্ত্ত নারী অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিতে পারে, কিন্তু তাহার প্রেম নিবেদনে ও আত্মদানে প্রিয়তমের কিঞ্চিন্মাত্র উপেক্ষা ও ঘৃণা তাহার সমস্ত সত্বায় প্রবল বিদ্রোহের তুফান তুলিয়া দেয়। প্রিয়তমের প্রেমে যে ঐকান্তিক বিশ্বাস লইয়া অবিচলিত চিত্তে নারী তাহার জীবন-তরী বাহিয়া চলে, পথের বিপদ গ্রাহ্য করে না, তাহাতে যখন নারী সন্দিহান হয়, সে বিকৃত রূপ লইয়া শত ফণিনীর মত শ্বসিয়া ওঠে। আজীবন যত্নে সাজান, বাঞ্ছিতের তৃপ্তির জন্য তাহারই পায়ে নিবেদিত জীবন-ডালি উপেক্ষিত দেখিলে তাহার অন্তরাত্মা বিষাইয়া ওঠে। পার্ব্বতী সব সহ্য করিতে পারিত, কিন্তু দেবদাস তাহাকে ভালবাসে না এবং কোনদিন ভালবাসে নাই, এ নিদারুণ বাণী মৃত্যুশেলের মত তাহাকে বিঁধিল। প্রাণের দেবতার সহিত তাই নিজ প্রাণকেও যথেচ্ছ বলি দিতে সে সঙ্কল্প করিল। আহতা, উপেক্ষিতা নারী, তাহার প্রেম ও আত্মসম্মানকে অনাহত রাখিতে যে কী ভয়ানক বিরোধী শক্তি ধারণ করিতে পারে, শরৎচন্দ্রের নৈপুণ্যে তাহা প্রকাশিত হইল।

দেবদাস ছিল শক্তিমান্, কিন্তু সে সংযম শেখে নাই। প্রাণের দুর্দ্দমনীয় আবেগকে সে সংযত করিতে জানে না। শক্তিমান্ প্রাণের দুর্দ্দমনীয় আবেগে প্রতিঘাতের বাধা না তুলিয়া, নিজেকে আবেগ প্রবাহে সে নিঃশেষ করিতে পারিত ; সে শক্তি তাহার ছিল। রুদ্ধ ক্রোধ ও ক্ষিপ্ত অভিমানে সে পার্ব্বতীকে ভালবাসে না জানাইয়া দিল, কিন্তু

তাহার আন্তর সত্য পরক্ষণেই শান্ত মুহূর্ত্তে আবেগ প্লাবনে তাহাকে ভাসাইয়া চলিল, বুঝিল পার্ব্বতীহারা হইয়া তাহার জীবন বিস্বাদ হইয়া উঠিবে। দেবদাসের বহুমুখী দুর্দ্দমনীয় চরিত্রশক্তি একমাত্র পার্ব্বতীকে কেন্দ্র করিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। শক্তির সেই আবেগকে প্রতিহত করিতে পারে জগতে এইরূপ কোন কঠিন বাঁধই দেবদাসের ছিল না। চুণীলালের সাহচর্য্যে লেখক দেবদাসকে বারবনিতা চন্দ্রমুখীর সংস্পর্শে আনিলেন। অর্থের বিনিময়ে বিলাসী নারীর ঘৃণিত দেহ দেবদাসের প্রাণ বিষাইয়া তুলিল। পার্ব্বতীর প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ অপ্রতিরোধে দেবদাসকে পার্ব্বতীর নিকট ফিরাইয়া আনিল। সে পার্ব্বতীকে বলিল, "আমি যেমন করিয়া পারি, মা বাপের মত করিব, শুধু তুমি...", শুনিয়া উপেক্ষিতা পার্ব্বতী কথার মাঝখানেই তীব্র ঝঙ্কার দিয়া উঠিল, "শুধু আমি! তোমার সঙ্গে? ছিঃ!—তোমাতে কিছুমাত্র আমার আস্থা নাই; আমি যার কাছে যাচ্ছি তিনি ধনবান্, বুদ্ধিমান্, শান্ত এবং স্থির।" বলিয়া নারী তাহার কঠিন মূর্ত্তিতে উপেক্ষা ও অপমানের প্রতিশোধে প্রিয়তমের বক্ষে বিষ ঢালিয়া আত্মস্থ হইল। আঘাতে দেবদাস স্বভাবস্থ হইল। রাগে 'দৃঢ় মুষ্টিতে ছিপের বাঁট ঘুরাইয়া লইয়া সজোরে পার্ব্বতীর মাথায় আঘাত করিল।' আহতা পার্ব্বতী আবার দেবদাসের শক্তির পরিচয় পাইয়া বাল্যসাথী দেবদা'র অনিরুদ্ধ আকর্ষণে দর্প মুক্তা হইয়া, 'মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া কহিল, দেবদা', করলে কি, ওগো ও দেবদা'।' আকুল কণ্ঠের সেই আবাল্য-পরিচিত নির্ভরশীল দেবদা' ডাক দেবদাসকে জানাইয়া দিল যে, পার্ব্বতী একমাত্র তাহারই আছে। কহিল, 'ভয় কি পারু, শেষ বিদায়ের দিনে একটুখানি মনে রাখবার মত চিহ্ন রেখে গেলাম। ······ছিঃ, তুই কি আমার পর,

পারু। ......কবে তোর ওপর রাগ ক'রেছিলাম, কবে মাপ করিনি ?”
কর্ম্মসংঘাতে, সবল ও শক্তিশালী চরিত্রের স্বাভাবিক গতিতে, চরিত্রদ্বয়ের আত্মধর্ম্ম পাঠকের চক্ষে ভাস্বর হইয়া উঠিল। অভিমানের যে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা দূর হইল। লেখকের সুনিপুণ অঙ্কনে আবার পার্ব্বতী ও দেবদাস বাল্যসাথীর স্নিগ্ধ চরিত্রে পাঠকের নিকট দেখা দিল। শরতের রবির কর মেঘমুক্তির পরে যেমন আরও উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশিত হয়, নব কিরণের হাসির ছটায় সবদিক মাতাইয়া তোলে, তেমনই মানমুক্তা পার্ব্বতী সহজ উৎকৃষ্টতর আকর্ষণে, আবার একান্তে তাহার জীবন-দেবতা দেবদাসের পায়ে নিঃশেষে আত্মনিবেদন করিল। কপালে প্রিয়তমের ভালবাসার অক্ষয় নিদর্শন লইয়া কলঙ্কের অমর চিহ্ন জীবনের একমাত্র অবলম্বন করিয়া পূর্ণশশীর মত ম্লান উজ্জ্বল সৌন্দর্য্যে পাঠকের চিত্ত আকর্ষণ করিল। সহানুভূতির অশ্রুবিন্দু সম্বল করিয়া পার্ব্বতী শ্বশুরবাড়ী চলিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—নারী তাহার সহজ বুদ্ধিতে জীবন দেবতার সন্ধান পায়। এবং যেখানেই আত্মীয়ের সন্ধান মেলে, প্রেমের পাত্রটিতে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া ধীরে ধীরে বাড়িয়া ওঠে। নির্ভর আশ্রয়ে সে যতই বিশ্বাস করিতে পারে এবং আশ্রয়স্থল যত শক্তিমান্ হয়, নারী-চরিত্র ততই সুবিকশিত হয়। নারী আত্মশক্তি ও ঐ আশ্রয়শক্তির সঞ্জীবনী রসধারা পান করিয়া বলবতী হয়। প্রকৃতপক্ষে এই আশ্রয় অনুপ্রেরক ও সম্প্রসারক শক্তির রূপ লইয়া নারী চরিত্র অনুপ্রাণিত হয়। পাশ্চাত্য মনীষী Otto Weninger এই সত্যের অনুভূতিতে নারীর পৃথক্ সত্ত্বা স্বীকার করেন নাই।* Nietzsche ও Schopenhauer'ও নারীর

* The absolute female has no ego.

আত্মার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়াছেন। মনু, পরাশর প্রভৃতি শাস্ত্রকারেরাও নারীর স্বাতন্ত্র্য কল্পনা করেন নাই। নারীর স্বভাব-তারল্যই বোধ হয় ইহার কারণ। উহাতে নারীর শক্তিহীনতা বা অপকর্ষের কোন ইঙ্গিত নাই। বরং সকলেই সহজ ও স্বরূপ নারীত্বকে দেবীশক্তি জ্ঞানে পূজা করিয়াছেন। স্বভাব-তারল্যে ও একনিষ্ঠ নির্ভর-শীলতায় আশ্রয়শক্তিতে আত্মনির্ভর করিয়া নারীত্বের শক্তি বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। পার্ব্বতী দেবদাসকে একমাত্র অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিয়াছিল, সামাজিক বিধি-নিষেধে বংশমর্য্যাদার প্রাচীর ভঙ্গ করিতে না পারায় সে আশ্রয় হইতে সে বঞ্চিত হইল। আখ্যায়িকায় এক রহস্যময় সমস্যার আবির্ভাব হইল। নারী তাহার সহজাত বৃত্তির নির্দ্দেশে যাহাকে একবার আত্মীয়রূপে গ্রহণ করে কোন অস্বাভাবিক কারণে সে আশ্রয় বঞ্চিত হইলে আশ্রয়ান্তরকেও আত্মীয় রূপে গ্রহণ করিতে পারে কি না, ইহাই হইল সমস্যা। ধনবান্ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র বয়োবৃদ্ধ স্বামীর দ্বিতীয় পত্নীর আসনে লেখক পার্ব্বতীকে বসাইলেন। পতিগৃহে অর্থ, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কোন কিছুরই অভাব পার্ব্বতীর ছিল না। বিবেক বুদ্ধির অনুশাসনে পার্ব্বতী নিজেও স্বামীর সংসারের প্রতি কর্ত্তব্যপালনে এতটুকু ত্রুটী পর্য্যন্ত করিল না। পার্ব্বতীর চরিত্রে এক অভিনব দ্বন্দ্বের আবির্ভাব হইল। নারীপ্রাণের সহজ প্রবাহে ও বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন সামাজিক মনে এই দ্বন্দ্বের সুরু হইল। সামাজিক স্বামীর সংসারে কর্ত্রীর ভূমিকায় পার্ব্বতীকে বসাইয়া লেখক দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক গতি ও পরিণতি দেখাইলেন। পার্ব্বতীর সামাজিক মন তাহার সহজ প্রাণকে অনুশাসনে কর্ত্তব্য পথ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। মনে প্রাণে, মুখের হাসিতে স্বামীর দ্বিতীয় সংসার করার অবচেতন ক্ষোভ

সে দূর করিল। আত্মীয়তায় ও পালনে সপত্নীপুত্র মহেন্দ্র এমন কি বিদ্বেষী যশোমতী পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইল। নিজের গায়ের সব গহনাগুলি একে একে যশোমতীকে পরাইয়া দিয়া, 'নিরাভরণা পার্ব্বতী কহিল, মা, মেয়ের ওপর রাগ করেছো,……আমি একজন দাসী বইত নয়। কত দীন, দুঃখী অনাথ তোমাদের দ্বারে প্রতিপালিত হয়, আমি মা, তাদেরই একজন।' শুনিয়া যশোমতী অভিভূত হইল। পায়ের কাছে ঢিপ করিয়া প্রণাম করিয়া বলিয়া উঠিল, 'তোমার পায়ে পড়ি মা।' যশোমতীর আত্মগ্লানিতে ত্যাগের ও ন্যায়ের মহিমা পার্ব্বতীকে সুন্দর করিয়া তুলিল। সমাজনীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ পার্ব্বতী কর্ত্তব্যের বেদীতে আত্মদানে মহিমান্বিত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই সংযম ও অনুশাসনের দৃঢ় আবেষ্টনের মধ্যে, পার্ব্বতীর সহজ প্রাণ অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত প্রবাহিত হইতেছিল। অনুশাসন, সংস্কার ও বুদ্ধির নির্দ্দেশ কোন মতেই ইহাকে মানিয়া লইতে পারিতেছিল না। অন্তরের নিভৃততম আসনে, পার্ব্বতীর নারীপ্রাণের ঐ সামাজিক স্বামীদেবতার ছায়াটুকু পর্য্যন্ত প্রবেশ করিতে পারিল না। একনিষ্ঠ ধর্ম্মে নারীপ্রাণে দেবতা দেবদাসই সুপ্রতিষ্ঠিত রহিল।

গুটিকয়েক সুনিপুণ তুলিকাক্ষেপে, অনুশাসন আবেষ্টনের, সংস্কারের কঠিন প্রাচীরের অন্তরালে লেখক নারীর একনিষ্ঠ সহজ প্রাণের অনিরুদ্ধ গতি পাঠকের চোখে সুস্পষ্ট করিয়া তুলিলেন। স্বামী-সেবাপরায়ণা পার্ব্বতী দেবদাসের অধঃপতনের খবর পাইয়া তালসোনাপুর গ্রামে হাজির হইল। বাল্যসখী মনোরমাকে বলিল, "মনোদিদি, নিজের জিনিষ নিজে নিয়ে যাব তাতে লজ্জা কি!" সামাজিক সম্পর্কের কথায় ম্লান হাসি হাসিয়া পার্ব্বতী কহিল, "জ্ঞান হওয়া পর্য্যন্ত যে কথা বুকের মাঝে বাসা

ক'রে আছে তা' মুখ দিয়ে এক-আধবার বার হ'য়ে পড়ে। তুমি বোন তাই একথা শুনলে।" স্বামীর সংসারে সে দশজনের মত একজন আশ্রিতা, দাসদাসীদের অন্যতম। সে ঐশ্বর্য্যের এতটুকু অধিকার পার্ব্বতীর মন মানিয়া লয় নাই। সংসারের সেবা ও পালনে সেই ঐশ্বর্য্য নিয়োজিত ছিল। আট বছরের বালিকা পার্ব্বতী দেবদাসের গচ্ছিত তিনটি টাকা শুধুমাত্র গান শুনিবার খেয়ালে নিঃসঙ্কোচে বৈষ্ণবদিগকে দান করিয়াছিল। দেবদাসের টাকার যথেচ্ছ ব্যবহারে সে অনুমতির পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে নাই, কিন্তু স্বামীর ঐশ্বর্য্যের কর্ত্রী পার্ব্বতী, তাহাতে নিজ অধিকারের দাবী পোষণ করিতে পারিল না। বিবাহটা সে সামাজিক সংসারে শুধুমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল কিন্তু তাহার নারীপ্রাণ সে নির্দ্দেশ মানিয়া লইতে পারে নাই। দেবদাসই সে প্রাণের একমাত্র অধীশ্বর ছিল। প্রাণের সহজ গতি অস্বাভাবিক আবেষ্টন ও অনুশাসনে বাধা পাইয়া, যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করিল সেই দ্বন্দ্বের ধারায় চরিত্রে দুঃখের আবর্ত্ত রচনা হইল। অন্তঃসঞ্চারী এই স্বভাব ও আবেষ্টনের সংগ্রামে পার্ব্বতীর সামাজিক মন দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিল ও স্বাভাবিক মন অন্তর্নিহিত শক্তিতে বলবত্তর হইতেছিল। দ্বন্দ্বের এই চরম মুহূর্ত্তে অন্তরের একনিষ্ঠ নীরব উপাসনায় তাহার প্রিয়তম দেবদাস যে পূজার অর্ঘ্য একদিন অবহেলায় পায়ে ঠেলিয়াছিল সেই পূজা ও সেবার দান গ্রহণ করিতে তাহারই অট্টালিকা সমীপে উপস্থিত হইয়া শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিল। দেবতার আহ্বান কুলের প্রাচীর ও জমীদারের অন্তঃপুর ভেদ করিয়া, 'পারু'র কানে পৌঁছিল, লাজ, মান, ভয় দূরে ফেলিয়া পার্ব্বতী দেবদাসের উদ্দেশ্যে বাহির পানে ছুটিল। "সে আর নাই", সংবাদে পার্ব্বতীর অস্বাভাবিক খোলস খসিয়া গেল, সে মূর্চ্ছিতা হইল।

সহজাত প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে নারী যে স্থানে তাহার তরল প্রাণ একবার বহাইয়া দেয়, জীবনধারাকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা তাহার আর থাকে না। সংস্কার আবেষ্টনের দৃঢ় প্রাচীর ও কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশ সকলই অগ্রাহ্য করিয়া একনিষ্ঠায় নারীর জীবনসত্য, তাহার প্রাণের একমাত্র নিয়ন্ত্রিত পথে প্রবাহিত হয়। সহজাত শক্তির প্রেরণায় পরিপুষ্ট ও পূর্ণ রূপ লইয়া আত্মশক্তির স্বপ্রকটিত মূর্ত্তিতে মানব ও সমাজ জীবনে অমূল্য সম্পদ দান করে,—জীবনকে সহজতার রূপ দান করিয়া তাহাকে সুমধুর করিয়া তোলে। ইহা হইল নারীর বৈশিষ্ট্য ও অমূল্য অবদান। Arabella Kenealy তাঁহার 'Feminism and Sex Instinct' নামক গ্রন্থে নারীর এই চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। 'She remains at core a creature of instinct, not of reason. As a creature of instinct she is invaluable to life—because life is moulded upon instinct.'

* *
*

চন্দ্রমুখী

নারী স্বভাবতঃ নির্ভরশীলা। কোন কিছুকে অবলম্বন করিয়া নির্ভর-নিশ্চিন্তে তাহার অন্তঃসারিণী নারীশক্তি প্রবাহিত হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে, নারীশক্তির সহজ রূপ কি? সৃষ্টিতত্ত্বের গোড়ার ইতিহাস হইতে বর্ত্তমান সভ্যযুগ পর্য্যন্ত আমরা দেখিতে পাই যে, নারী মাতৃত্বের উপাসিকা। তাহার সচেতন, অবচেতন ও অচেতন চিত্তের সমুদয় বৃত্তিগুলি মাতৃত্বের উপাসনায় উৎপ্রাণিত। তাহার দৈহিক বৈশিষ্ট্যেও মাতৃত্বের এক বিরাট অবস্থান লক্ষিত হয়। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে নারীর কর্ম্মধারাও অন্তর্নিহিত ধর্ম্মের অনুপ্রেরণায় উৎসারিত। প্রাকৃতিক নিয়মেই সৃষ্টির রহস্যময় বিধানে নারীর সহজাত প্রবৃত্তির সার্থকতার জন্য তাহাকে জীবনসাথী অবলম্বন করিতে হয়। এই সাহচর্য্য ভিন্ন নারীর সমস্ত শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকিয়া যায়, জীবনসাথীর সংস্পর্শে আসিয়া নারী তাহার সুপ্ত শক্তি সক্রিয় দেখিতে পায়। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মাতৃত্ব ধর্ম্মই নারীর প্রথম বৈশিষ্ট্য। চরিত্র ধর্ম্মের এই স্বাভাবিক নিয়মে জীবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে নারী তাহার আত্মিক ধর্ম্মপ্রেরণায় জীবনসাথীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হয়। বাল্যে তাহার অবচেতন চিত্তে এই সন্ধান আরম্ভ হয়, বয়োবৃদ্ধির সহিত যৌবনের সমাগমে তাহার সারা চেতনায় এই সন্ধানের প্রেরণা সজাগ হইয়া ওঠে। মিলনের অভাবে জীবন ব্যর্থতার সুপ্ত আশঙ্কায় সে আকুল হইয়া ওঠে। নারীর জীবনে তাই সাথীর মিলন এক চরম সমস্যার সমাধান করিয়া দেয়। জীবনকে সার্থক করিবার বা মাতৃত্বে জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ করিবার আশায় উৎকন্ঠিতা নারী জীবন-বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষা করে। উৎকণ্ঠায়, সার্থকতায়, অনুপ্রেরণায়, অসতর্কতায় সে

অনেক সময়ে জীবনে ব্যর্থতা বরণ করিয়া বসে। লোভে, মোহে, কখন বা নিপীড়নে, অবার কখনও বা সামাজিক ও সাংসারিক আবেষ্টনের নির্ম্মমতায় কিম্বা নিরুপায়ে বাধ্য হইয়া যখন নারীকে প্রকৃত জীবনসাথী ও আত্মীয়ের আসনে বিরূপধর্ম্মীকে বসাইতে হয়, ফলে জীবনে অস্বাভাবিক মিলনে তাহার স্বরূপ বিকৃত হইয়া যায়। অমৃত ভ্রমে গরল পান করিয়া তাহার নারীশক্তি বিষাক্ত হইয়া ওঠে। নারীর বিকৃত রূপও বিষম শক্তি, মাতার উজ্জ্বল ও গৌরবময় আসন হইতে অপসৃত করিয়া তাহাকে নরকের কীট করিয়া তোলে। পাশ্চাত্য মনীষী Ludovici বলিয়াছেন, 'Her vices are not vices in their origin, but only becomes so when certain vital principles within her get out of hand, or find expression in a way, they are not intended to adopt.' * পাপ নারীর চরিত্র ধর্ম্ম নয়; অসাধ্য শক্তি সংঘাতে ইহা নারীর বিকৃত রূপ। ইহাই পতিতা নারীর জীবনেতিহাস। তাহার পতিত ও ঘৃণিত জীবন আমাদের চক্ষে পড়ে, —আমরা শিহরিয়া উঠি। কিন্তু সেই অবস্থায় উপনীত হইতে সে নিজে কতখানি দায়ী তাহা আমরা তলাইয়া দেখি না। দেখিলে হয়ত কুলটার করুণ জীবন-কাহিনী আমাদের চোখে জল আনিত। ফরাসী বিদুষী Emile Faguet বলিয়াছেন, "All prostitutes start their illicit amour with a strong monogamic bias, and it is only subsequently that circumstances drive them to promiscuity. ‡ একনিষ্ঠায় নারী

* Woman

‡ Feminism.

নিঃশেষে যাহাকে আত্মনিবেদন করে তাহার নিকট প্রতারিত হইলে প্রতিকূল আবেষ্টনে বিকৃত রূপী হইয়া ওঠে।

নারী তাহার আত্মিক ধর্ম্মে ও শক্তিতে এই ঘৃণিত ও হীন অবস্থা হইতেও অনুকূল সুযোগে যদি কখনও তাহার প্রাণের দেবতার পরিচয় পায়, সংস্পর্শে আসে, সে আবার তাহার অন্তর্নিহিত মাতৃধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আবার তাহার সকল অন্তর-রাজ্যে স্নেহ ও ভালবাসার মন্দাকিনী উৎসারিত হইতে পারে। প্রতিভাশালী শরৎচন্দ্র নারী-চরিত্রের এই অন্তর্নিগূঢ় সত্য সুস্পষ্ট অনুভব করিয়া তাঁহার আখ্যায়িকার বিবিধ চরিত্রে ইহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার কল্পিত চন্দ্রমুখী, বিজলী, সাবিত্রী ও কিরণময়ী প্রভৃতি চরিত্রে নারীধর্ম্মের এই সহজ শক্তি সুবিকশিত হইয়াছে। নারী যখন তাহার জীবনদেবতার পরিচয় পায়, সংস্পর্শে আসে, তাহার বিকৃত রূপ ও অধঃপতিত অবস্থা হইতেও উন্নীত হইবার, স্বধর্ম্মে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যে পতিতা এই জীবনদেবতার বা অন্তরবন্ধুর সন্ধান-সুযোগ পায় না—সে হতভাগিনী পতিতাই রহিয়া যায়। বিকৃত রূপে নারীত্বের অন্তঃশক্তিহীন হইয়া তাহার পিশাচ মূর্ত্তি দিন দিন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে।

দেবদাসের চরিত্রে ধৈর্য্য বা সংযমের শাসন বিড়ম্বনা ছিল না। কিন্তু সে চরিত্রের অন্তঃশক্তি এতই বলবান. ও বনীয়াদি ছিল যে, স্বভাব-উৎকর্ষে তাহাতে কোন নিকৃষ্টতার স্থান হইতে পারিত না। তাহার চরিত্রে নীচতার কোন ছায়াই আমরা দেখিতে পাই না। কেন না, অনুরূপ চরিত্রে অন্তঃশক্তি প্রভাবে নীচতা আসিতে পারে না। সে পার্ব্বতীকে ভালবাসিয়াছিল, তাহাকে হারানোর বেদনা-দহনে সে অস্থির হইয়া ফিরিতেছিল। অন্তরের তীব্র দহন সে সুরাতে নিবাইতে চেষ্টা

করিল। তাহার সুরাপান তাই প্রকৃতপক্ষে আসক্তি নয়। সুরাবিষে আচ্ছন্ন হইয়া অন্তর্দাহ ভুলিয়া থাকিবার করুণ ও মর্ম্মান্তিক প্রচেষ্টা মাত্র। তাহাকে সংযত করিতে কেহ ছিল না, কাহারও শাসন মানিয়া চলিতে সে শেখে নাই। সে যদি অস্থিরসঙ্কল্প চরিত্রহীন পুরুষ হইত, পার্ব্বতীর প্রতি তাহার যদি কেবল রূপজ মোহ থাকিত, তাহা হইলে সে অবাধে অন্য নারীর রূপ-সায়রে ডুবিয়া পার্ব্বতীকে ভুলিতে পারিত। কিন্তু চরিত্রের বনীয়াদি উৎকর্ষে, যৌবনের উন্মাদনা ও অর্থের স্বাচ্ছল্য, বন্ধুর প্রলোভন ও সুন্দরী বারনারীর মায়াজাল, সকলই সে নির্ব্বিকারে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। স্বাভাবিক উৎকর্ষে, কোন শাসন ও বাধা না থাকা সত্ত্বেও কোন হীন প্রবৃত্তি দেবদাসের মনে স্থান পায় নাই। পুরুষশক্তির যে স্বাভাবিক ও সুদৃঢ় শক্তিতে আশৈশব দেবদাস পার্ব্বতীর উপর অধিকার বিস্তার করিয়া আসিতেছিল, চরিত্রের সে প্রোজ্জ্বল শক্তি কখনও তাহাকে ত্যাগ করে নাই। গভীর প্রেমে তাহার সকল প্রাণ নিঃশেষে পার্ব্বতীকে সঁপিয়া দিয়া তাহারই বিরহ বেদনায়, তিলে তিলে, ক্ষয় হইয়া সে মৃত্যুর সন্নিকট হইতেছিল। শেষের দিন অস্তমুখী জীবনের শেষ নিঃশ্বাসটি পার্ব্বতীর স্নেহাশ্রয়ে ত্যাগ করিবার দৃঢ় সঙ্কল্পে মৃত্যুর সহিত ছুটিয়া আসিয়া পার্ব্বতীর বাটীর সম্মুখে একমাত্র তাহাকে দেখিবার উৎকণ্ঠায়, শেষ প্রচেষ্টায়, জীবন ত্যাগ করিল। দেবদাস চরিত্রের যে অনিরুদ্ধ শক্তি-মাধুর্য্যে পার্ব্বতী আকৃষ্ট হইয়া তাহাকে তাহার সমস্ত নারীপ্রাণ সঁপিয়া দিয়াছিল, শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত দেবদাসের চরিত্রে সেই শক্তি অম্লান ও সমুজ্জ্বল ছিল।

চন্দ্রমুখী রূপসী বারবনিতা। রূপের ব্যবসায়ে হীন চরিত্র লোকই তাহার সহচর ছিল। মেসের বন্ধু চুণীলালের উৎপ্রেরণায় ও অন্তর্দাহ

ভুলিয়া থাকিবার প্রলোভনে দেবদাস চন্দ্রমুখীর গৃহে উপস্থিত হইল। কিন্তু তাহার ঘৃণিত ব্যবসা মনশূন্য রূপ ও দেহের পরিবেশন, রূপের মোহ সৃষ্টি করিবার ইন্দ্রজাল, দেবদাসকে নিমেষে বিষাইয়া তুলিল। শত বৃশ্চিক দংশনের যন্ত্রণায় ও ঘৃণায় না-শুনিয়া ও না-দেখিয়া সে একখানা নোট চন্দ্রমুখীর প্রতি নিক্ষেপ করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিল। আযৌবন রূপের ব্যবসায়ে চন্দ্রমুখী এইরূপ প্রকৃতির লোকের সংস্পর্শে কখনও আসে নাই। 'দেবদাসের এই আন্তরিক ঘৃণা, সরল ও কঠিন উক্তি তাহার ভিতরে গিয়া পৌঁছিল।' দালাল চুণীকে চন্দ্রমুখী বলিল, "সত্যিই একটু মায়া পড়েছে।"..."এই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই।" চরিত্রের বনীয়াদি ঔৎকর্ষে মনশূন্য নারীদেহে কি আকর্ষণ আছে দেবদাস তাহা ভাবিয়া পাইল না। চুণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি আশায় তুমি সেখানে যাও?"

পুরুষচরিত্রের অন্তরশক্তি এক প্রভাবময় রহস্যপূর্ণ আকর্ষণের ভাণ্ডার। আন্তর উৎকর্ষে ও প্রভাবে এই শক্তি সর্ব্বত্রই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকে। আকর্ষণের গভীরতা এত অধিক যে, একবার সংস্পর্শে আসিলে বিস্ময়ে ও প্রশংসায় প্রতিনিয়ত সে শক্তিতেই আকৃষ্ট হইতে হয়। চন্দ্রমুখী যতই দেবদাসকে দেখিতে লাগিল ততই নিজের গণিকাবৃত্তির প্রতি, জঘন্য চরিত্রের প্রতি দেবদাসের আন্তরিক ঘৃণা সে অনুভব করিতে লাগিল। এমন কি মাতাল অবস্থাতেও সে দেবদাসকে বলিতে শুনিল, "ছিঃ ছুঁয়ো না,—এখনও আমার জ্ঞান আছে,...আমি কত যে তোমাদের ঘৃণা করি। চিরকাল ঘৃণা করবো—তবুও আসব, তবুও বসব, তবুও কথা কব। নাহ'লে যে উপায় নেই, তা'কি তোমরা কেউ বুঝবে।" আয়নায় প্রতিফলিত ছবির মত দেবদাসের সংস্পর্শে

চন্দ্রমুখী তাহার ঘৃণিত চরিত্র তদপেক্ষা ঘৃণিত ব্যবসায় ও কুৎসিত আবেষ্টনের কদাকার রূপ দেখিতে লাগিল। অপরদিকে দেবদাসে পুরুষ-চরিত্র শক্তির উজ্জ্বল রূপ ভাস্বর দেখিল। এতদিন তাহার ব্যবসার সাথী চাটুকারদিগের মুখে সে তাহার বিকৃত রূপেরই প্রশংসা শুনিয়া আসিয়াছে। নিজের স্বরূপ বুঝিবার বা জানিবার কোন সুযোগ তাহার হয় নাই। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে, সুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় দেবদাসের আন্তরিক ঘৃণায় তাহার বিকৃত নারীরূপের কদর্য্যতা জীবনে তাহার সর্ব্বপ্রথম ধরা পড়িতেছিল। শুধু তাই নয়, সে বুঝিতে পারিল যে, তাহার পৈশাচিক লীলাসহচরগণ ক্ষণিক রূপজ মোহে, আকর্ষণে, এক নারকীয় বাসরের সৃষ্টি করিয়া থাকে। নারীত্বের নিত্য সহচর হইবার মত শক্তি বা চরিত্রের উৎকর্ষ তাহাদের নাই। প্রকৃতপক্ষে যাহা নারীর শ্রেষ্ঠ অবলম্বন, তাহার জীবনধর্ম্ম যে অবলম্বনে প্রবাহিত হয় এবং যাহার স্বতঃপ্রবাহে নারীজীবনে সার্থকতা ও পরিণতি লাভ করে, সেই শক্তিমানের আশ্রয় চন্দ্রমুখী জীবনে লাভ করিতে পারে নাই। সে দেখিতে পাইল যে, নারীর সাবলীল জীবনধারা সমস্ত বিশ্বকে নবতর রূপদান করিতে করিতে চির অবিচ্ছেদে সেই অসীম সমুদ্রের উদ্বেল বক্ষে অফুরন্তে বিলীন হন। চন্দ্রমুখী অনুভব করিল যে, নারী তাহার সহজাত বৃত্তিতে, ঐকান্তিক কামনায়, যেখানে জীবন সুন্দরের একবার অনুসন্ধান পায়, দ্রব্যের শক্তির মত সে একান্তে সেই দেবতায় লীন থাকিয়া আত্মশক্তিতে সমুজ্জ্বল হইয়া ওঠে। সে আরও দেখিতে পাইল যে, নারীর জীবনবন্ধু তাহার স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ও শক্তিমান্ রূপে নারীত্বে অন্তর্নিহিত স্নেহমাতৃকারই একনিষ্ঠ উপাসক হইয়া থাকে। সে দেবতা শুধুমাত্র রূপজ মোহে আকৃষ্ট হন না। নারীর একনিষ্ঠ প্রেমফল্গুর স্নেহ-

কল্লোল সেই সুপ্ত দেবতাকে জাগ্রত করিতে পারে। সর্ব্বশেষে নারীর বিকৃত রূপের প্রতি দেবদাসের আন্তরিক ঘৃণা, মনশূন্য রূপ ও দেহে বিতৃষ্ণা তাহার মুক্ত উদার চরিত্রের দৃঢ় আকর্ষণে ও পার্ব্বতীর প্রতি তাহার একনিষ্ঠ প্রেমে, আত্মদানে চন্দ্রমুখী তাহার জীবনদেবতার সন্ধান পাইল। নারীসুলভ সহজাত প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে, 'মাত্র পাঁচ মিনিটের' দেখায়, দেবদাসের ঘৃণায় আত্মশুদ্ধি লাভ করিয়া তাহার চরিত্র-শক্তির আকর্ষণে নির্ব্বিশেষে তাহাকেই জীবনদেবতা রূপে বরণ করিল,—সে দেবদাসকে আন্তরিক ভালবাসিল। এইরূপে এক নিগূঢ় রহস্যময় বিধানে তাহার পিশাচ সহচরদের মধ্যেও নারী তাহার জীবনদেবতার সন্ধান পাইয়া থাকে; এবং যখনই সন্ধান মেলে, মুহূর্ত্তে সে স্বধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রকৃতিস্থ হইয়া স্নেহ, ভালবাসা, সেবার মূর্ত্তিতে মাতৃত্বে চরম সার্থকতায় আপন জীবন অকাতরে বিলাইয়া দেয়। বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের মত জীবনদেবতার অনুরাগ ও শক্তি স্পর্শে নারীর সমস্ত জীবন সক্রিয় হইয়া ওঠে। শক্তির অনিরুদ্ধ গতিতে স্নিগ্ধতায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে সে বিশ্বপ্রাণে বিস্ময়ের সৃষ্টি করে।

দেবদাসের সংস্পর্শে আসিয়া শক্তিমানের স্পর্শে মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ের পঙ্কিলতা দূরীভূত হইল এবং সহসা নব জাগরণে চন্দ্রমুখী অন্তরে নারীত্বের স্বরূপ অনুভব করিল। সেই রূপমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া সে তাহার দৈহিক রূপবিলাসে বিতৃষ্ণ হইল। ত্যাগ ও ভালবাসায় দেবদাসকে আপন করিয়া পাইবার আশায় সে সেবাব্রতে দেবদাসকে আশ্রয় করিল। অবহেলা, ঘৃণা, লাঞ্ছনা, নিপীড়ন, তাহার মাতলামি পর্য্যন্ত অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিয়া শুধু তাহারই মঙ্গল ও শুভ কামনায় চন্দ্রমুখী আত্মনিয়োগ করিল। শুধু সেবার সুযোগ পাওয়াই যেন

তাহার জীবনে এক পরম সার্থকতা আনিল। বিলাসিনীর গৃহসজ্জা, স্বর্ণালঙ্কার এমন কি ঘরের ছবিগুলি পর্য্যন্ত সে হয় বিক্রয় না হয় দান করিয়া দিল। একবার ভাবিল না কি উপায়ে তাহার ভবিষ্যতের দিনগুলির অতি দীন গ্রাসাচ্ছদন চলিবে। দেবদাসের সেবা ও শুভ কামনার তৃপ্তিতে তাহার সমস্ত জীবন ও যৌবনক্ষুধা পরিতৃপ্ত হইল। প্রথম দর্শনে দেবদাস তাহাকে যে আঘাত করিয়াছিল, সে আঘাতের তীব্রতায়, ঘৃণায় ও পুরুষশক্তির প্রভাবে চন্দ্রমুখীর আমূল পরিবর্ত্তন হইল। তাহার স্বোপার্জ্জিত সমস্ত সম্পত্তি বিলাইয়া, ছড়াইয়া দিয়া, দেবদাসের সামান্য অনুগ্রহ জীবনে সম্বল করিল; বুঝিল ভালবাসা ও রূপের মোহ এক নয়। এবং নারীজীবনে মাত্র একবারই ভালবাসিতে পারা যায়,—'সে ভালবাসার মূল্য অনেক।······শুধু অন্তরে ভালবাসিয়াও যে কত সুখ, কত তৃপ্তি—যে টের পায় সে নিরর্থক সংসারের মাঝে দুঃখ অশান্তি আনিতে চায় না।' জীবনের এই তৃপ্তিটুকুকেই একমাত্র সম্বল করিয়া চন্দ্রমুখী তাহার বাকী দিনগুলি দেবদাসকে ভালবাসিয়া কাটাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিল। দেবদাসকে বলিল, "তুমি যে কি আকর্ষণ, যে কখনও তোমাকে ভালবেসেছে সেই জানে, এই স্বর্গ থেকে যে সাধ ক'রে ফিরে যাবে এমন মেয়ে কি পৃথিবীতে আছে?···এ রূপ ত চোখে পড়ে না, বুকের একেবারে মাঝখানটিতে এর গভীর ছায়া পড়ে।···সে কি তৃপ্তি!" এইরূপে চন্দ্রমুখীর চরিত্রে লেখক দেখাইয়াছেন যে, শক্তিমান্ পুরুষের প্রগাঢ় অনুরাগ ও স্পর্শ যখন নারীর প্রাণে লাগে—রূপজ মোহের নয়—তখন তাহাতে বিশ্বের সুখ অফুরন্ত সৌন্দর্য্যে এক চিরবসন্ত জাগাইয়া তোলে। সেবা, স্নেহ, ভালবাসা, পালন প্রভৃতির নব নব পুষ্পভারে শোভিত করিয়া জীবনকে

অফুরন্ত রূপচ্ছবি ও স্নেহের উৎস করিয়া রাখে। সৃষ্টির অফুরন্ত ভাণ্ডার খুলিয়া নারী দিন দিন রূপ ও সৌন্দর্য্যে বর্দ্ধিত হয়।

শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি নারীর স্বভাবসুন্দর বিশিষ্ট রূপই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। নারীর জীবনধর্ম্ম, মাতৃত্ব, আলো বাতাসের আনুকূল্যে বিকশিত পুষ্পের মত, পুরুষের শক্তিমান্ অনুরাগ স্পর্শে, আকর্ষণে প্রস্ফুটিত হয়। কিন্তু অনেক সময়েই নারী এই ভালবাসার স্বরূপ সম্বন্ধে ভুল করিয়া বসে। রূপজ মোহকে ভালবাসা মনে করিয়া সেই ভ্রান্ত ধারণায় নির্ভর করিয়া জীবনপথে চলিতে চলিতে বিপথে নারী বিকৃত হইয়া পড়ে। তাহার আত্মিক ধর্ম্ম নারীত্ব, ঐ রূপজ মোহে অচিরেই বিতৃষ্ণ হইয়া পড়ে। এই বিকৃত অবস্থায় ও প্রকৃত ভালবাসার তৃষ্ণা, নারীর চেতন বা অবচেতন চিত্তে সকল সময় বিরাজিত থাকে। জীবনযাত্রার আরম্ভে যদি অনুকূল সুযোগে নারী যথার্থ প্রেমের স্পর্শ পায়, সেই অনুরাগ স্পর্শে আত্মিক প্রেরণায় তাহার নারীত্ব ও মাতৃত্ব স্বতঃ প্রস্ফুটিত হইয়া ওঠে। অন্যথায় রূপজ মোহের আকর্ষণে, আজ যাহাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, মোহান্তে বিতৃষ্ণায় তাহা ত্যাগ করিয়া আবার আত্মিক তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া ওঠে। কিন্তু নারী যতই বিকৃত চরিত্র ও পতিতা হোক না কেন, অধঃপাতের নিম্নতম স্তর হইতেও শক্তিমানের আহ্বানে প্রকৃত ভালবাসার আস্বাদে আবার তাহার স্বাভাবিক নারীত্ব ও মাতৃত্ব ধর্ম্মে ফিরিয়া আসিবার সম্ভাবনা থাকে। এই স্বভাব ও ধর্ম্মের বশেই পতিতা বারবনিতা চন্দ্রমুখী দেবদাসের সংস্পর্শে আসিয়া চরিত্রশক্তির আকর্ষণে ও তেজে প্রকৃত ভালবাসার সন্ধান পাইয়া নারীত্বের দাবীতে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে পারিল। তাহার বিলাসিনীর রূপ চির সুন্দরের

অমৃত স্পর্শে দূরীভূত হইল। ভালবাসার আকর্ষণ উত্তাপে সমস্ত হৃদয় গলাইয়া দেবদাসের সেবায় ও কল্যাণধারায় বহাইয়া দিয়া জীবনে পরম সার্থকতা ও অনন্ত তৃপ্তি লাভ করিল। তৃপ্তির অমর ফল্গু শুধু দেবদাসের নয়, অশথঝুরি গ্রামের দীনদুঃখী সকলেরই প্রাণে তাহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদ্রেক করিল। সার্থকতায় চন্দ্রমুখী মহীয়সী হইয়া উঠিল।

* *

*

বিজলী

'আঁধারে আলো' আখ্যায়িকাটিতে বিজলীর চরিত্রেও নারীর এই আত্মিক বৈশিষ্ট্যই শরৎচন্দ্র সুপ্রকাশিত করিয়াছেন। বিজলী রূপের ব্যবসায়ে নিপুণা—রূপের ফাঁদে, মোহের আকর্ষণে, সে তাহার লীলা-সহচরদের আকৃষ্ট করিত। আপাত পরিচয়ে সদ্য গঙ্গাস্নাতা বিজলীর স্নিগ্ধ রূপ নিষ্কলঙ্ক স্ফুটন্ত কলির মত নবীন যুবক সত্যেন্দ্রের মনে একটা আকর্ষণের সৃষ্টি করিল। দিনের পর দিন নানা কৌশলে গাঢ় অনুরাগের অভিনয়ে বিজলী সত্যেন্দ্রের হৃদয়ে আকর্ষণ তীব্র করিয়া তুলিল। তাহার মায়া-কৌশল সত্যেন্দ্রের শুভ্র কুমার চিত্তে, কল্পনার রাজ্যে এক মানসী প্রিয়ার রূপ সৃষ্টি করিল। মানসী প্রিয়ার সে স্নিগ্ধ শুচি ও শুভ্রতার ছবি সত্যেন্দ্রের অন্তরে গভীর উন্মাদনার সৃষ্টি করিল। বিজলী বুঝিল, 'শীকার টোপ গিলিয়াছে'। তীরে টানিয়া তুলিবার চেষ্টায় মিথ্যা অসুখের সংবাদে ঝিকে দিয়া সে সত্যেন্দ্রকে বাড়ীতে ডাকিয়া আনিল। ফাঁদের গ্রন্থি সুদৃঢ় করিয়া মোহমুগ্ধ এই শীকারটির পরিত্রাণের কোন উপায় না রাখিয়া সত্যেন্দ্রকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য বিজলী বাইজীর আসর জমাইয়া বসিল। আসরের আনুষঙ্গিক আয়োজন ও অনুষ্ঠানের ত্রুটি রাখিল না।

অসুখের কথায় উদ্বিগ্ন চিত্তে, হয়ত তাহার বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া বিজলী পীড়িত হইয়াছে চিন্তায় কাতর সত্যেন্দ্র, তাহার গৃহদ্বারে উপনীত হইল। বিজলীর চাক্ষুষ পরিচয় পাইয়া তাহার বাইজীরূপ ও ইয়ারবন্ধুদের ঘৃণিত ব্যবহার দেখিয়া সত্যেন্দ্রের চমক ভাঙ্গিল। 'প্রবল তড়িৎ স্পর্শে হতচেতন মানুষ যেমন করিয়া কাঁপিয়া নড়িয়া ওঠে, ইহার করস্পর্শেও সত্যেন্দ্রের আপাদমস্তক তেমনই করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।'

তাহার আকাশ কুসুম খসিয়া পড়িল, ঘৃণায় তাহার সমস্ত মুখ কালি হইয়া গেল। এতদিন যে সত্যেন্দ্র তাহার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটি পর্য্যন্ত পালন করিতে অধীর হইয়া উঠিয়াছে, একটি কৃপা-কটাক্ষের আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে, আজ তাহার ক্লিন্ন নারীত্বের পরিচয় পাইয়া সেই সত্যেন্দ্রের মন ঘৃণায় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। বিজলীর বিনীত অনুনয় ও প্রার্থনা সত্ত্বেও সত্যেন্দ্র তাহার প্রদত্ত ভোজ্য ঘৃণায় স্পর্শ পর্য্যন্ত করিল না। তাহার ছায়া পর্য্যন্ত ঘৃণ্য মনে করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

দেবদাসের ঘৃণায় চন্দ্রমুখী তাহার বিকৃত রূপের কদর্য্যতার প্রথম পরিচয় পাইয়াছিল, তেমনই অবজ্ঞা ও উপেক্ষার আঘাতে বিজলী তাহার রূপ ব্যবসায়ের পঙ্কিলতা প্রথম অনুভব করিল। নারীত্বের নিপীড়িত ও কলঙ্কিত রূপ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। * চরিত্রহীন, রূপমুগ্ধ, নারকীয় লীলাসঙ্গীদের চাটুকথা বিজলী এতদিন শুনিয়া আসিয়াছে, কদর্য্যতার কথা কেহ তাহাকে শোনায় নাই। কিন্তু আজ সত্যেন্দ্রের মুখে স্বীয় বীভৎস রূপের কথা শুনিয়া তাহার ঘৃণায় বিজলীর চক্ষু খুলিল। সুপ্ত নারীত্ব, নিপীড়িত লাঞ্ছিতার করুণ মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিল। বিলাসিনী বাইজী মরিল; 'যে রোগে আলো জ্বাললে আঁধার মরে, সূর্য্য উঠলে রাত্তির মরে, আজ সেই রোগেই বাইজী চিরদিনের জন্যে মরে গেল।' সত্যেন্দ্রের নারীত্বের উপাসনায়, প্রথম পূজার ফুলে, আনন্দে সুপ্ত নারীত্ব, দেবী মূর্ত্তিতে জাগিয়া উঠিল। তড়িৎ স্পর্শে

---

* মধুরাতে কত মুগ্ধহৃদয়
স্বর্গ মেনেছে এ-দেহখানি,—
তখন শুনেছি বহু চাটুকথা,
শুনিনি এমন সত্যবাণী।—রবীন্দ্রনাথ।

আলোকের আবির্ভাবের মত, বন্ধুর আগমনে তাহার সমস্ত নারীজীবন এক অভিনব স্পন্দনে সচেতন হইয়া উঠিল।

লেখক বলিয়াছেন, 'সে ভালবাসিয়াছে। সে ভালবাসার এক কণা সার্থক করিবার লোভে এই রূপের ভাণ্ডার দেহটাও হয়ত একখণ্ড গলিত বস্ত্রের মত সে ত্যাগ করিতে পারে।' নারী জীবনের অন্তর্গূঢ় সত্য শিল্পী শরৎচন্দ্রের প্রতিভায় ধরা পড়িয়াছে। পতিত ও হীন অবস্থায়ও দেবতা নারীকে ত্যাগ করেন না,—নিদ্রিত থাকেন মাত্র। অনুকূল সুযোগে দেবতা আবার জাগ্রত হন;—নারী দেবীর রূপে বিকশিত হইয়া ওঠে। 'সকলের দেহতেই ভগবান বাস করেন। এবং আমারও দেহটা ছেড়ে তিনি চলে যান নি।...সব মন্দিরেই দেবতার পূজা হয় না বটে, কিন্তু তিনি দেবতা। তাঁকে দেখে মাথা নোয়াতে না পারো, কিন্তু তাঁকে মাড়িয়ে যেতেও পার না। নারীদেহের ওপর শত অত্যাচার চলতে পারে, কিন্তু নারীত্বকে ত অস্বীকার করা চলে না। বিজলী নর্ত্তকী, তথাপি সে যে নারী।' সত্যেন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া খাঁটি সত্য কথা শুনিয়া নারীত্বের যথার্থ উপাসনায় বিজলীর 'অর্দ্ধমৃত নারীপ্রকৃতি অমৃত স্পর্শে জাগিয়া বসিয়াছে।' নারী-চরিত্রের অন্তর্নিহিত সত্যের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়া ঘৃণার পরিবর্ত্তে সমাজ মনে লেখক পতিতার প্রতি করুণার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

* *
*

কিরণময়ী ও সাবিত্রী

সকলই নিয়মের অধীন। জড় ও অন্তর জগতে যে সকল স্থিতি বা পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সকলই প্রাকৃতিক নিয়মের পরিণতি মাত্র। সুনিয়ন্ত্রিত প্রাকৃতিক বিধান তাই সর্ব্বকালে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন গতিশীল। যদি কোন অস্বাভাবিক উপায়ে এই স্বভাবধর্ম্মে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, অস্বাভাবিক সেই বাধা স্বাভাবিক নিয়মে আপনি সরিয়া যায়।

নারীত্ব, নারীর আত্মধর্ম্ম, তাহার অন্তর স্বভাব বিধানে নিজ গতি ও পরিণতি সৃষ্টি করিয়া লয়। জলের নিম্নগতির মত নারীত্ব ও স্বভাব ধর্ম্মে স্বতঃ প্রবাহিত হয়। কিন্তু সকল নদী একই ভাবে খরস্রোতে বহিয়া যায় না। ঢালুর বুকে, পার্ব্বত্য ঝরণা যে বেগে আছড়াইয়া পড়ে, সমতল দেশের নদীস্রোত অনুরূপ শক্তিশালী হয় না। আবার স্রোতধারার ক্ষীণতা ও প্রাবল্যের অনুপাতে বিভিন্ন নদী বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। কিন্তু ঢালু প্রদেশ পাইলেই সকল নদীর স্রোতই বেগবতী হইয়া ছুটিয়া চলে। ইহা স্রোতের স্বভাব ধর্ম্ম। আবার দেখিতে পাওয়া যায়, প্রবাহের পথ যতই সমতল হয়, স্বভাবধর্ম্মে নিম্নগামী নদী সমতল ভূমিতে ক্ষীণস্রোতা হইয়া যাত্রাপথ, শক্তির অভাবে বালু-স্তূপে হারাইয়া ফেলে। নদীর বুকে চড়া পড়ে। ইহাই হইল মরা নদীর ইতিহাস। স্বভাব-তারল্যে নারী তাহার আশ্রয়পথের নির্দ্দেশ আপনাপনি করিয়া লয়। আশ্রয়পথটি যত সহজ ও বাধা বিহীন হয়, ঢালু পথে প্রবাহিত নদীর মত নারীর স্বভাব-তারল্যের শক্তিও ততই বাড়িয়া চলে। ইহা নারীত্বের স্বভাব তারল্যের প্রাকৃতিক নিয়ম।

সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে মানবের অন্তরধর্ম্মকে সামাজিক নিয়মে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া জনসাধারণের মঙ্গলে তাহা নিয়োজিত করা সুব্যাপ্ত

সভ্যতার আদর্শ। অনুশাসন ও সংস্কার তাই যে সমাজে যত এই প্রাকৃতিক শক্তির আনুকূল্যে নিয়ন্ত্রিত সেই সমাজ ততই সম্প্রসারিত ও উন্নত। অন্যদিকে যে স্থলে সামাজিক বিধান প্রাকৃতিক নিয়মের যত প্রতিকূলতা করে, অনুশাসনে ও স্বভাবে এই বিরোধের ফলে, সভ্যতা ও উন্নতি তত বাধা পাইয়া পিছাইয়া পড়ে। সভ্যযুগের এবং সমাজের ইহা হইল যথার্থ ইতিহাস। যে সমাজ জড় ও অন্তর জগতের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, যত জনসাধারণের মঙ্গলে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারিয়াছে, সে সমাজ তত উন্নত।

ঢালু পথে বারিধারার সহজ গতির মত নারীত্বের জাগরণে নারী তাহার অন্তরের সকল উদ্যম ও সামর্থ্য লইয়া অপ্রতিহত গতিতে ছুটিয়া প্রশান্ত সাগরে, দেবতার পায়ে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া তৃপ্তি পাইতে চায়। পথ যত তার ঢালু হয়, নিম্ন গতিতে তাহার প্রবাহ-শক্তি ততই বেগবতী হইয়া ওঠে। শক্তির আত্ম-উচ্ছ্বাসে, নির্ভরে, তৃপ্তির স্নিগ্ধ কল্লোলে স্রোতস্বতীর মত সে দিন দিন আরও মাধুর্য্য ও সৌন্দর্য্য লইয়া প্রবাহিত হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, নারীর এই সহজ গতি যে স্থলে বিঘ্নময় হয়, পথের নিম্নতা না পাইয়া যে স্থলে এই শক্তি প্রকাশিত হইতে না পারে, সাগরের প্রশান্ত বক্ষে নদীর মত জীবনদেবতায় যখন নারী আত্মনিবেদন করিতে না পারে, সে স্থলে নারীর জীবনধারার, নারীত্বের রূপ কি হইবে? এই সমস্যার সমাধানে লেখক শরৎচন্দ্র প্রতিকূল আবেষ্টনে নারীর রূপ-বিকারের সুনিপুণ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। লেখকের অনেক চিত্রে তাই বিকাশের অনুকূল আবেষ্টন না পাইয়া প্রতিকূলতার দ্বন্দ্বে নারীত্বের বিলোপ হইয়াছে দেখা যায়। মাতৃত্বের ক্ষুধা কোথাও নৈতিক অনুশাসনের

পীড়নে, কোথাও বা আবেষ্টনের দুর্ভেদ্য প্রাচীরে প্রশমিত কিম্বা রুদ্ধ করিয়া শরৎচন্দ্র অর্দ্ধমৃত নারীকঙ্কালকে, সেবাধর্ম্মে, কখনও বা 'পরহিত ধর্ম্মে, প্রাণহীন আদর্শে তৈলহীন ক্ষীণ দীপশিখার মত জীবনের শেষ দিনটি পর্য্যন্ত কোন রকমে বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। পার্ব্বতীকে স্বামী সংসারের ঐশ্বর্য্য ও স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে করুণ বৈরাগ্যের ক্ষীণ নীতিসূত্রে ঝুলাইয়া রাখিয়াছেন। এই সূত্রের শক্তি যে কত দুর্ব্বল, উহার অবলম্বন যে কত অপ্রাকৃতিক এবং কিরূপে দেবদাসের শেষ নিঃশ্বাসে অকস্মাৎ প্রলয়ের সৃষ্টি করিয়া সূত্রটির সহিত পার্ব্বতীর জীবনছায়া নষ্ট হইয়া গেল, লেখক তাহা দেখাইয়াছেন। স্বামীগৃহে পার্ব্বতীর নারী রূপ আমরা দেখিতে পাই না। দেবদাসের 'পারু'তে যে নারীত্বের উন্মেষ ও বিকচ জীবনের স্নিগ্ধ উচ্ছ্বাস আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, বিবাহের সহিত 'পারু'র সেই প্রাণ মরিয়া গিয়াছিল। বিবাহিতা পার্ব্বতী বিকচোন্মুখ 'পারু'র প্রেতের ছায়া মাত্র—বিবাহ বন্ধনে পার্ব্বতীর নারীত্ব বিবাহ বাসরেই মরিয়া গিয়াছিল। চরিত্রে প্রকৃতিগত স্বাভাবিক গতির যথার্থ পরিণতি দেখাইয়া লেখক তাহার তীক্ষ্ণ প্রতিভার পরিচয় দিলেন। এইরূপে চন্দ্রমুখী তাহার জীবন-সর্ব্বস্বের পায়ে তাহার নারীত্বটুকু বিসর্জ্জন দিয়া, সেবা ও পরোপকার ধর্ম্মে, বৈরাগ্যে শেষ দিনগুলি কাটাইল বটে কিন্তু তাহার এই শেষের দিনগুলি যেন মুমূর্ষের নাভিশ্বাস লইয়া বাঁচিয়া থাকা মাত্র। সর্ব্বত্যাগী চন্দ্রমুখী তাহার নারীত্ব পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া সেবা ও নৈতিক আদর্শের দাসী হইয়া রহিল।* 'বড়দিদি' মাধবীর স্নেহ-নির্ঝর সুরেন্দ্রর আশ্রয়

* The great prevalence in women of the religious emotional state is largely due to unemployed sexual impulse. Havelock Ellis, 'Psychology of Sex.'

ত্যাগ করার সঙ্গেই শুষ্ক হইয়া উঠিল। 'কাজের তেমন আর বাঁধনি রহিল না।' নারীত্বের জাগরণে, মাধুর্য্যের আকর্ষণে বিজলী তাহার বিকৃত রূপের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল সত্য, কিন্তু তাহার পরবর্ত্তী জীবনের ইতিহাসে যতটুকু লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে তাহা বিতৃষ্ণা ও বৈরাগ্যের আলেখ্য মাত্র,—নারীত্বের মূর্ত্তি আমরা তাহাতে দেখিতে পাই না। সাবিত্রীকেও যেদিন উপীনদা'র পরামর্শে সতীশের আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল সেদিন সেই আশা ত্যাগের সঙ্গেই তাহার নারীত্বকে বলি দিতে হইল। এইরূপে বিভিন্ন চরিত্রে লেখক দেখাইয়াছেন যে, সমাজ ধর্ম্ম, নীতি প্রভৃতি যতই উচ্চ আদর্শ হোক না কেন, নারী যখন তাহার জীবনদেবতার আশ্রয় লাভে বঞ্চিত হয়, সে নারীত্ব হারাইয়া ফেলে। তাহার উত্তর জীবনও নারীর আর এক ধরণের বিকৃত রূপ। ত্যাগ ও সেবার নিষ্ঠুর শুভ্র কাঠিন্য ও কর্ত্তব্যের তীব্র অনুশাসন অবলম্বন করিয়া এই বিকৃত রূপে নারী তাহার জীবনে সহজ স্নিগ্ধতার আস্বাদ আর পায় না।

স্রোতস্বতী নদী গতিপথে কোন বাধা মানে না। জীবনের অফুরন্ত উচ্ছ্বাস-প্রবাহে সে সকল বাধা পরাভূত করিয়া অগ্রগামী হয়। প্রাণবন্ত নদীর বক্ষে বাঁধের সৃষ্টি করা যায় না। আন্তর শক্তিতে সে সকল বাঁধ ভাঙিয়া আপন পথ সৃষ্টি করিয়া প্রবাহিত হয়। কিরণময়ীর জীবনশক্তি ছিল এইরূপ বলবতী ও বেগবতী। আবেষ্টনের সুদৃঢ় প্রাচীর, সহস্র যুগের নৈতিক সংস্কার, অনিরুদ্ধ সামাজিক শাসন, কোন কিছুই কিরণময়ীর চরিত্রের আন্তর শক্তিকে প্রশমিত করিতে পারে নাই—তাহার জীবন-প্রবাহ সর্ব্বত্রই স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল গতিতে সমুদয় বন্ধন ধ্বংস করিয়া আপন পথে অগ্রসর হইতেছিল। এখন

প্রশ্ন হইতেছে, এই অপূর্ব্ব আন্তর শক্তিময়ী চরিত্রের স্বতঃ পরিণতি কি হইবে? বিচারে এই চরিত্রশক্তির স্বরূপ ও আবেষ্টনের অবস্থা আলোচনা করা আবশ্যক।

'দেখছ না পায়ের কাছে আলো দেখে ঘরের সমস্ত সাপ ছুটে আসবে', বলিয়া সতীশ উপীনদা'কে লইয়া আতঙ্কে কিরণময়ীর জীর্ণ শ্বশুরঘরের সর্প ও মূষিকের হাত হইতে রক্ষা পাইতে গৃহের একমাত্র আসন ভাঙা তক্তাপোষের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। মৃত্যুর করুণ ছায়া যেন সহচরদের সহিত এই ভাঙা বাড়ীর পঞ্জর ভেদ করিয়া একটা বিপদ ও আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছিল। এই পরিবেশের বিষাদের কালো ঘন মেঘের বুকে বিজলী চমকের মত হঠাৎ কিরণময়ী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, "এটি আমার শ্বশুরের ভিটা, আপনারা অমর্য্যাদা করবেন না।" প্রাণহীন আবেষ্টনের বিষাদপূর্ণ কারা-প্রাচীরে অফুরন্ত প্রাণের উচ্ছ্বাসে লেখক এক অভিনব পরিহাসের সৃষ্টি করিলেন। কিরণময়ীর অফুরন্ত প্রাণ ও বিষাদপূর্ণ মুমূর্ষু পরিবেশের নগ্ন চিত্র—দুইটি সম্পূর্ণ বিরোধী শক্তির মূর্ত্তি লইয়া চিত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যের শুধু মাত্র অমর সাহিত্যিকদের বিশিষ্ট তুলিকাক্ষেপেই এরূপ চিত্রের অঙ্কন মাত্র কোথাও কোথাও দেখা যায়। কিরণময়ীর ঐ হাসিতে আমরা তাহার চরিত্রের অতল ও এক দুর্ব্বার অন্তঃশক্তির পরিচয় পাই। ঐ চরিত্রশক্তিকে বিরোধী ও বিষাদপূর্ণ আবেষ্টনে অবরুদ্ধ রাখার প্রয়াস যেন মেঘের বুকে তড়িৎপ্রবাহকে ধরিয়া রাখিবার বৃথা আকাঙ্ক্ষা। 'এটি আমার শ্বশুরের ভিটা, আপনারা অমর্য্যাদা করবেন না', উক্তিটীতে পরিহাসের কারুণ্য ও গভীরতা মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। যে গৃহে মাত্র ক্ষণিকের

উপস্থিতিতে বলিষ্ঠ দুইটি যুবক আতঙ্কে শিহরিয়া ওঠে, প্রাণরক্ষার চেষ্টায় মেঝে ছাড়িয়া তক্তাপোষের উপর আশ্রয় লয়, নারীর কোমলতা অফুরন্ত যৌবনের পূর্ণ উচ্ছ্বাস ও সম্মোহন রূপ লইয়া কেবলমাত্র শ্বশুরের ভিটার মর্য্যাদার রক্ষার্থে কিরণময়ীকে সামাজিক ও নৈতিক সংস্কারের অনুশাসনে, সেই গৃহে কারাবাস বরণ করিয়া লইতে বাধ্য করা হইয়াছে। সে যুবতী, সুন্দরী, অফুরন্ত তাহার আশা ও আকাঙ্ক্ষা। সুখ ও সম্ভোগের প্রাণবন্ত উচ্ছ্বাস তাহার অণু পরমাণুতে উৎসারিত। বুঝি রাজার প্রাসাদও ইহার পক্ষে অশোভন হইত না। কিন্তু তাহার এই ভরা যৌবন ও নারীপ্রাণ লইয়া, ভগ্ন ও অব্যবহার্য্য কোঠা-বাড়ীতে মুষিকদষ্ট জীর্ণ শয্যাসম্ভার, ছিন্ন গদি তোষক ও বালিসের তুলার স্তুকার, এবং সেই শয্যাশায়ী মুমূর্ষু স্বামীর জীবিত কঙ্কাল অবলম্বন করিয়া কিরণময়ী কালাতিপাত করিতেছিল। লেখক একটি মাত্র করুণ মর্ম্মোচ্ছ্বাস ও মর্ম্মান্তিক পরিহাসে স্বামীর জীর্ণ কঙ্কাল দেহ ও তদনুরূপ জীর্ণ পুরাতন বাস্তুভিটার মর্য্যাদাই যে সমাজবিধানে এই যুবতীর জীবনের অস্বাভাবিক অবলম্বন তাহা দেখাইলেন। সংস্কারের অনুশাসন যেন বর্ষায় কূল-ভাঙা বিপ্লবী নদীপ্রবাহের সম্মুখে বালির বাঁধের মত দুর্ব্বল প্রতীয়মান হইল।

আবেষ্টন, নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের অনুশাসন, যৌবন উচ্ছ্বসিত কিরণময়ীর শক্তিময়ী নারীপ্রাণকে যে একটুও স্পর্শ করিতে পারে নাই, লেখক তাহা কিরণময়ীর স্বাধীন ও চটুল ব্যবহারে ও উপহাসের ভিতর দিয়া ফুটাইয়া তুলিলেন। সে সতীশ ও উপেন্দ্রকে, 'রাজদর্শনে' অর্থাৎ স্বামী হারাণচন্দ্রকে দেখাইতে লইয়া চলিল। 'রাজদর্শনে' এমন কি সতীশের মত নির্ভীক ও উপেন্দ্রের মত ধীর যুবকও আতঙ্কে শিহরিয়া

উঠিল। মৃত্যুর নাভিশ্বাসে যে আবেষ্টন প্রতিনিয়ত শ্বসিয়া উঠিতেছিল, মুমূর্ষু হারাণচন্দ্রের জীর্ণ কঙ্কালকেই একমাত্র সেই আবেষ্টনের কেন্দ্র করিয়া পরিহাস আরও গভীর করিয়া তোলা হইল। বিষাদপূর্ণ ও বিষাক্ত পরিবেশে পূর্ণযৌবন, মাতৃত্বের ক্ষুধা ও অফুরন্ত প্রাণের আশার উন্মাদনা লইয়া ঐ মৃত্যুপথের যাত্রীকেই জীবন-সাথী করিয়া কিরণময়ীকে চলিতে হইবে।

লেখক প্রথম পরিচয়ে চরিত্রের উপাদানসমূহ সুস্পষ্ট করিয়া দেখাইলেন। কিরণময়ীর অনুরূপ চরিত্র অন্তঃশক্তিতে ও বেগবতী ধারায় কেবলমাত্র দুর্ব্বল স্বামী কঙ্কাল ও শ্বশুরের ভিটার মর্য্যাদার সংস্কারে, শান্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত থাকিতে পারে না। সামাজিক ব্যবস্থা ও বিধানগুলি খরস্রোতা নদীর বুকে বালির বাঁধের মত দুর্ব্বল বলিয়া প্রতীয়মান হইল। পরবর্ত্তী অধ্যায়সমূহে এই চরিত্রশক্তি যে কত গভীর ও দুর্ম্মদ বেগবতী, লেখক তাহাই দেখাইয়াছেন।

নারী নির্ভরশীলা। চরিত্রধারার আবেগ ও গতি ধারণক্ষম শক্তিমান্ আধার তাহার আবশ্যক। আশ্রয়শক্তি নির্ভরে অন্তঃশক্তি প্রবাহিত করিয়া নারীর জীবনধারা ছুটিয়া চলে। আশ্রয়ে শক্তিহীনতায় জীবনভার বিন্যস্ত করিতে না পারায় সার্থকতার দুরাশায় সে তাহার আবেষ্টনে সন্দিহান হইয়া ওঠে। সন্দেহ যতই গভীরতর হয় নির্ভরে প্রতারিত হইয়া তাহার অন্তঃশক্তিও ততই বিকৃত ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে। দুর্ব্বল ও অস্বাভাবিক এই আবেষ্টনে কিরণময়ীর জীবনে একটা অতৃপ্তির বিক্ষোভ সঞ্চারিত হইতেছিল। যতই দিন যাইতেছিল ততই আন্তর-বিক্ষোভ অতৃপ্তির আবর্ত্তে তাহাকে বিষাইয়া তুলিতেছিল। জীর্ণ, মুমূর্ষু ও প্রাণহীনের প্রেতচ্ছবিতে যেন আবেষ্টনের পরিহাসটি প্রতারণার

মূর্ত্তিতে তাহার নিকট দেখা দিল। স্বামী ও সংস্কার জীবনে তাহার একটা মস্ত উপহাস হইয়া দাঁড়াইল। শুধু তাই নয় বিশ্ব সংসার যেন এই প্রতারণার ও অস্বাভাবিকতার লীলাক্ষেত্র বলিয়া তাহার প্রতীতি জন্মিল। তাহার জীবনসৌধের পরিবেশ ও সংস্কার গ্রন্থিগুলি নিজস্ব দুর্ব্বলতায় অতি স্বাভাবিকভাবে খসিয়া পড়িতেছিল। যাহা কিছু এই জীবনের অবলম্বন সবই যেন তাহাকে প্রাণহীন করিয়া তুলিবার, তাহার আত্মশক্তিকে ম্রিয়মাণ ও ক্ষীণপ্রবাহ করিবার একটি অস্বাভাবিক প্রতারণা-কৌশল। প্রাণবন্ত চরিত্রের অনিরুদ্ধ গতিধারায় দুর্ব্বল আবেষ্টন কোন বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না সত্য, কিন্তু নির্ভরশূন্য স্বভাবতরল নারী-চরিত্র আন্তর-অতৃপ্তিতে, বিক্ষোভে অস্থির হইয়া ওঠে। নির্ভরহীনতায় এক স্বাভাবিক অস্থিরতা আপনি তাহার চরিত্রে আসিয়া পড়ে। শক্তিমান আশ্রয়ের পরিচয় না পাইয়া, সত্যের সন্ধান না মেলায় কিরণময়ীর অতৃপ্ত চরিত্র দিন দিন এইরূপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। কারণ, চরিত্রের স্বতঃশক্তিতে সে অস্বাভাবিক আবেষ্টনকে জীবনে স্বীকার করিয়া লইতে পারিতেছিল না। পরিহাস ও প্রতারণা, সত্য নয় বলিয়া আত্মজীবনে উহাদের স্থান সে কখনও স্বীকার করে নাই। হয়ত শক্তিমান সত্য ও সুন্দরের পরিচয় সে জীবনে পায় নাই বলিয়াই সারা বিশ্বকেও সে ঐ প্রতারণার লীলাক্ষেত্র বলিয়াই মনে করিয়া আসিয়াছে। স্বামীর আহ্বানে তাহার মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে আগত সুহৃদ্ উপেন্দ্রকেও তাই না জানিয়া ও না দেখিয়াই ঐ প্রতারণার লীলা-সহচর বলিয়া মনে করিয়া লইল। জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা উপেনবাবু, আপনি সমস্তই নিজের নামে লিখে নেবেন?" সরল এই প্রশ্নটিতে লেখক কিরণময়ীর অন্তরদ্বার উদ্ঘাটন করিয়া তাহার স্বরূপ পাঠক

সমাজে প্রকট করিলেন। আমরা দেখিতে পাইলাম পথভ্রষ্ট এই শক্তিমান চরিত্রধারার নিপীড়িত ও বিকৃত রূপ। জীবনে কোন কিছু অবলম্বন করিয়া সুস্থির হইবার ও তীরের আশ্রয় লাভ করিবার আশা সে যেন হারাইয়াছিল। নিরাশার সহিত অবিশ্বাসের অন্ধকারে, সন্দেহে তাহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতেছিল। উপেন্দ্রের সহিত প্রথম আলাপে ও প্রশ্নে তাই এই অবিশ্বাসের সুর ফুটিয়া উঠিল।

কিরণময়ীর চরিত্র-উন্মেষ লেখকের এক অভিনব শিল্প। প্রথম সাক্ষাতে সতীশ এই চরিত্রের খর উচ্ছ্বাসের পরিচয় পাইল। আত্মশক্তি প্রবাহে উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের সাবলীল ও শক্তিমান আঘাতে সতীশের প্রাণে আতঙ্কের সৃষ্টি করিল। সে বলিল, "খাল খুঁড়ে কুমীর ঘরে এনো না, উপীনদা', ওখানে তোমার আর গিয়ে কাজ নেই, ওঁরা লোক ভালো নন।" কিন্তু পরিচয় কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর আমরা দেখিতে পাই সতীশের মত সম্পূর্ণ বদলাইয়া গিয়াছে, "সংসারে দুইটি লোককে আমি দেবতার মত ভক্তি করি—উপীনদা'কে আর তোমাকে (কিরণময়ীকে)। একজনকে মনে করলেই আমি তোমাদের দুইজনকে এক সঙ্গে দেখি।" যে চরিত্র প্রথম পরিচয়ে সতীশের মনে ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার উদ্রেক করিয়াছিল, পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় তাহাকেই সতীশ দেবী বলিয়া স্বীকার করিল ;—শুধু তাহাই নয়, ইহাকে শক্তিমান ও সংযত উপেনদা'র আদর্শ চরিত্রের সমতুল্য করিয়া ভক্তি অর্ঘ্য দান করিল। চরিত্রের সম্ভাব্যশক্তি যে কত গভীর ও প্রশান্ত, তাহার অতল রূপ যে আপাতদৃষ্টিকে এড়াইয়া যায় এবং তাহার শক্তির ধারা যে অনিবার্য্য, লেখক তাহা সুস্পষ্ট করিলেন। যেন যাদুশক্তিতে কিরণময়ী সতীশের ঘৃণা ও উপেক্ষাকে আকৃষ্ট করিয়া ভক্তিধারায় রূপায়িত করিল। আমরা পরে দেখিতে

পাই, ভগ্নীর স্নেহে কিরণময়ী সতীশকে যত্ন করিয়া, ভাইয়ের আসনে বসাইয়া রান্নাঘরে গল্প করিতে করিতে লুচি ভাজিয়া খাওয়াইতেছে। আখ্যায়িকার প্রথম ভাগে কিরণময়ী চরিত্রে আমরা ঘৃণিত চটুলতার পরিচয় পাই। তাহার চরিত্রের খরধার, কুলটার কটাক্ষে কখন যে কাহাকে অজ্ঞাতে বিদ্ধ করিবে এই অনিশ্চিত আশঙ্কার সৃষ্টি করে। ডাক্তার অনঙ্গমোহনের সহিত তাহার গোপন সম্বন্ধে চরিত্রটিকে অধঃপাতের নিম্নতম স্তরেই নিপতিত দেখিতে পাওয়া যায়। পঙ্কিল কদর্য্যতায়, দুর্গন্ধে আমরা শিহরিয়া উঠি। সুরবালার "তোমরা মহাভারত বিশ্বাস কর না?" এই সহজ প্রশ্নে, সমগ্র উপনিষদ্ হজম করিয়া এতদিন কিরণময়ী যে সত্যের সন্ধান পায় নাই, যেন অকস্মাৎ তাহার সন্ধান পাইয়া, 'বিপুল আবেগে তাহাকে বক্ষে টানিয়া চুপি চুপি কহিল, "মিথ্যা নয়, বোন,—কোথাও এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যা নেই···সত্যি তো সবাই চিনতে পারে না, দিদি, তাই ঠাট্টা তামাসা করে," বলিতে বলিতেই তাহার দুই চক্ষু প্লাবিত হইয়া গেল।' দৃঢ়তায় ও চরিত্রের অন্তঃশক্তিতে যেন ক্ষণিকের জন্য সে উপেন্দ্রকেও ক্ষীণপ্রভ করিয়া তুলিল। আবার দেখা যায়, গ্রন্থারম্ভের প্রথমে যে কিরণময়ী তাচ্ছিল্য, উপহাসে স্বামীর জীবনকঙ্কালকে ঘৃণার সামগ্রী বলিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছে, মুমূর্ষু স্বামীকে দর্শনেচ্ছু সতীশ ও উপেন্দ্রকে 'রাজদর্শনে' লইয়া যাই বলিয়া ক্রুর ও হীন উপহাসও করিয়াছে, সেই কিরণময়ীর আশ্চর্য্য স্বামী-সেবা সতীশকেও বিস্ময়ে হতবুদ্ধি করিয়া দিয়াছে। "সে কি আশ্চর্য্য সেবা!" মানুষে তেমন সেবা করিতে পারে তাহা উপেন্দ্র কখনও ধারণা করিতে পারেন নাই। এইরূপে একাধারে আমরা কিরণময়ীকে দেবী ও পিশাচীর আসনে, তীক্ষ্ণধী ও উন্মাদের রূপে, ঘোর অবিশ্বাসী নাস্তিক,

তার্কিক এবং বিশ্বাসভরা ভক্তি-অশ্রু আপ্লুতভাবে দেখিতেছি। আপাত-দৃষ্টিতে চরিত্রটি যেন বিরুদ্ধ গুণাত্মক ও রহস্যময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে কিরণময়ী ডাক্তার অনঙ্গমোহনের ঘৃণিত লীলাসহচরী তাহারই আপ্রাণ স্বামী-সেবা সতীশ ও উপেন্দ্র দুইজনকেই তাহার প্রতি সশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে। যুক্তিবাদের অজুহাতে যে ধর্ম্ম, শাস্ত্রবাক্য এমন কি ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে চাহে নাই, নির্ব্বিচার আনুগত্য যে দুর্ব্বলতারই নামান্তর বলিয়া মনে করিয়া আসিয়াছে, সেই কিরণময়ী ক্ষণিকের জন্য সুরবালার ভক্তি ও বিশ্বাসের সংস্পর্শে আসিয়া নির্ভর বিশ্বাসকেই আত্মধর্ম্ম বলিয়া মানিয়া লইয়া ভক্তি আপ্লুত হৃদয়ে সাশ্রুনেত্র হইয়া উঠিল। তাহার সমস্ত তর্কের জাল, বিচারবুদ্ধি নিমেষে দূর হইয়া গেল। আবার দেখা যায়, পালনের স্নিগ্ধ মূর্ত্তিতে যে কিরণময়ী মমতার প্রস্রবণে একে একে সতীশ, দিবাকর ও উপেন্দ্রকে প্লাবিত ও সশ্রদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, আদর, যত্ন ও সেবায় আপনাকে স্বচ্ছন্দে বিলাইয়া দিয়াছে তাহারই অমানুষিক প্রতিহিংসার শ্বাস শত ক্রুদ্ধ ফণিনীর আক্রোশে শ্বসিয়া, ভীষণ জ্বালাময়ী মূর্ত্তিতে, বিকৃতরূপে আমাদের চক্ষের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে। "দুই চক্ষু তাহার বাণবিদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত ধক্ ধক্ করিয়া ফুলিয়া উঠিল," বলিল, "তোমার উপীনদাদা মাথা উঁচু ক'রে চলবে সে হবে না।" তাহার বিষাক্ত চুম্বন ও নিষ্ঠুর হাসিতে শুধু হিংসার জ্বালা ও নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার প্রলয়কারী সঙ্কল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, একই চরিত্রে এইরূপ বিরোধী ধর্ম্মের সংস্থান কি করিয়া সম্ভব হয়? দেবতা ও দানব, পিশাচ ও গন্ধর্ব্ব, বেদ-উজ্জ্বলা তীক্ষ্ণধী ও চণ্ডাল ধর্ম্ম যেন আন্তর নিবিষ্টভাবে লেখক এই চরিত্রে সন্নিবিষ্ট

করিয়াছেন। কিন্তু তবুও এই বিষম গুণবিশিষ্ট চরিত্রের কোথায়ও একটু অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। সকল বিরূপ ও স্বরূপ অবস্থায় দেবী ও দানবীরূপে, সমভাবে কিরণময়ী আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়া আসিয়াছে। অনঙ্গমোহনের নিকট আত্মবিক্রয়ে কিরণময়ীর ঘৃণিত রূপের কদর্য্যতা পাঠকের চক্ষু এড়াইয়া গেল, মনে আসিল 'কত বৎসরের দুর্দ্দান্ত অনাবৃষ্টির জ্বালা সেই বুকের মাঝখানে জমাট বেঁধে', সেই মর্ম্মান্তিক পিপাসার সৃষ্টি করিয়াছিল, 'যে তৃষ্ণায় মানুষ নর্দ্দমার গাঢ় কাল জলও অঞ্জলি ভরিয়া মুখে তুলে দেয়'। 'আসক্তি ঘৃণার, তৃষ্ণা বিতৃষ্ণার অবিশ্রাম সংঘর্ষে যে গরল অহরহ উঠতে লাগল', সেই বিষের পীড়নে মর্ম্মান্তিক যাতনায় লেখক পাঠকের মনে কিরণময়ীর জন্য সমবেদনার সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে প্রতি তুলিকাক্ষেপে স্বরূপ ও বিকৃত রূপের স্বাভাবিক অঙ্কনে লেখক কিরণময়ীর প্রতি পাঠকের সহানুভূতি জাগ্রত রাখিয়াছেন।

চরিত্র শক্তির এই বিষম ধর্ম্মের দুইটি স্বাভাবিক ব্যাখ্যা হইতে পারে। যদি বলা যায় যে, চরিত্রে প্রথম হইতেই উন্মাদের সুপ্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়, কথাটা অসঙ্গত মনে হইবে না। হারাণচন্দ্রের জীর্ণ বাড়ীর ফটকে প্রেতচ্ছায়ার অন্তরালে সতীশ ও উপীনদা'র সহিত প্রথম সাক্ষাৎ ও ব্যবহারে আমরা কিরণময়ীর প্রথম পরিচয় পাই। অনুরূপ আবেষ্টনে, পরিপাটি অঙ্গবিন্যাসে, টিপ পরা, হাস্য চপলা কিরণময়ী তাহার নিজ চরিত্রের অসংলগ্নতার পরিচয় দিয়াছিল। আবার যখন সে প্রথমে উপেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার স্বামীর শেষ সম্পদ বুঝি তিনি ফাঁকি দিয়া নিজের নামে লিখিয়া লইতে আসিয়াছিলেন, অপরিচিত যুবককে, কুলবধূর এই অমার্জ্জিত প্রশ্নতেও চরিত্রের

অসংলগ্নতাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। নবাগত অতিথিদের 'রাজদর্শনে' লইয়া যাইবার উপহাসও চরিত্রের স্বাভাবিকতার লক্ষণ নয়। আবার এইরূপ বিকৃত চরিত্রের সহসা স্বামী সেবায় আত্মনিয়োগেও অসংলগ্নতার লক্ষণ দেখা যায়। এইরূপ প্রতি ক্ষেত্রেই চরিত্র ধর্ম্মে অসামঞ্জস্য বড়ই সুস্পষ্ট মনে হয়। অভ্যন্তরীন এই বিষম ধর্ম্ম ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া উত্তরকালে উন্মাদনায় পরিণত হইয়াছিল তাহা মনে করিবার যুক্তি সঙ্গত কারণেরও অভাব নাই। পতিবিয়োগে, বুকফাটা বিরহে ও ক্রন্দনে যে কিরণময়ী সকলের প্রাণে সহানুভূতির অশ্রু টানিয়া আনিয়াছিল, সহসা সে অপরিণত যুবক আশ্রিত দিবাকরকে লইয়া কূলত্যাগিনীর বেশে আরাকান যাত্রা করিল। ইহাও অস্থিরমতি ও অসংলগ্ন চরিত্রধর্ম্মের যে সুস্পষ্ট লক্ষণ তাহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যদি চরিত্রটিকে এইভাবে ক্রম বিশ্লেষণ করা যায়, তাহা হইলে প্রথম হইতেই উন্মাদের বীজ এই চরিত্রে নিহিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। অন্তর্নিহিত উন্মাদ ধর্ম্মই যেন ক্রমে অসংলগ্নতা ও অস্থিরতার মধ্য দিয়া আত্মবিকাশ করিয়া চরিত্রটিকে উন্মাদে পরিণত করিয়াছে। বিরোধী ধর্ম্মের—রাগ, দ্বেষ, হিংসা, সেবা, ভালবাসা ও ভক্তির,—সহসা অত্যন্ত অসংযত প্রকাশ ভবিষ্যৎ উন্মাদের লক্ষণ। কিরণময়ীর চরিত্রবৃত্তিগুলির অসংযত প্রকাশ তাহার চরিত্রের প্রতি স্তর উন্মোচনে স্পষ্ট লক্ষিত হয়।

কিন্তু উন্মাদনা স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক যে কোন ভাবে আসিতে পারে। চরিত্রের অন্তর্নিহিত শক্তির দুর্ব্বলতা ইহার মুখ্য কারণ। শক্তি-হীনতায় পরিবেশ ও আবেষ্টন, আত্মিক ও সামাজিক, নৈতিক ও দৈহিক প্রাকৃতিক ধর্ম্মের সহিত স্বাভাবিক সংযোগ বিচ্যুত হইলেই উন্মাদনার সৃষ্টি হইয়া থাকে। আন্তর-দৌর্ব্বল্য, দ্বন্দ্বে অক্ষমতা, আত্মসংযোগ ও

প্রতিষ্ঠায় অপারগতা ইহার কারণ। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কিরণময়ীর চরিত্রে আন্তর-দৌর্ব্বল্যের লেশমাত্র ছিল না। এই চরিত্রের প্রত্যেকটি স্তর উন্মোচনে বরং বিপরীত রূপটিই দেখা যায়। চরিত্র শক্তি এত প্রখর, গভীর, অতল ও লীলায়িত যে শক্তির ধারা অপরিমেয় বলিয়া মনে হয়। চরিত্রে যদি শক্তির এই দুর্নিবার গতি, দৃঢ়তা ও দুর্দ্দম প্রবাহ দেখিতে না পাওয়া যাইত তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত উন্মাদ ধর্ম্মের মত সমর্থন করিতে কোনও দ্বিধা আসিত না। কিন্তু উত্তাল আবেগ ও শক্তিসম্পন্ন এই চরিত্রের কোন স্তরেই দুর্ব্বলতার ছায়াটুকু পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং দেখা যায় যে, জন্মাবধি নিষ্ঠুর ভাগ্যবিধাতা প্রতিকূল আবেষ্টনের নির্ম্মম পীড়নে প্রতিনিয়ত তাহাকে নিষ্পেষিত করিতেছিলেন। বাল্য, কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত সে আবেষ্টনের প্রতিকূলতাকে ভাগ্যের বিধান মনে করিয়া অদৃষ্টের সকল নির্দ্দেশ নীরবে পালন করিয়া আসিয়াছে। বালিকা কিরণময়ী একদিন, 'নিরানন্দ মাতুল সংসার হইতে' বধূর বেশে ততোধিক বিষাদপূর্ণ স্বামীর জীর্ণ ও অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিল। দারু-শুষ্ক, বিদ্বান স্বামীর কঠোর মূর্ত্তিকে গুরুরূপে স্বীকার করিয়া নির্ব্বিচারে শিষ্যার ভূমিকায় সে দিন কাটাইতে লাগিল। 'গুরুশিষ্যের কঠোর সম্বন্ধ আর ঘোচে নাই।' পণ্ডিত স্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সে বাংলা, ইংরাজী ও সংস্কৃত, উপনিষদ্ প্রভৃতি দর্শন শাস্ত্রের পাঠ গ্রহণ করিতে লাগিল। শুষ্ক নীরস কাঠিন্যের নিশ্চল মূর্ত্তি স্বামীর অধ্যাপনায় তাহার বুদ্ধি ও বিচারশক্তিকে সবল করিয়া তুলিল বটে, কিন্তু ভালবাসা ও অনুরাগ স্পর্শ না পাইয়া তাহার নারীত্ব সুপ্ত রহিয়া গেল। স্বামীর ভালবাসার যে সম্প্রসারক ও অনুপ্রেরক শক্তিতে নারীত্বের জাগরণ হয়, এই শুষ্ক

কাষ্ঠের মধ্যে সে শক্তির স্পর্শ কিরণময়ী কোনদিন অনুভব করে নাই, এবং বোধ হয় তাহাতে সে শক্তি কোনদিন ছিল না। স্বামীর পাঠশালার বাহিরে দিনের যেটুকু অবসর সে পাইত তাহা শাশুড়ী অঘোরময়ীর শাসন-কারায় অতিবাহিত হইত। 'হাতা, বেড়ি, খুন্তী হইতে পোড়া কাঠ পর্য্যন্ত সবগুলির চিহ্নই' অঘোরময়ী তাহার দেহে অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন। যৌবন যখন কুলভাঙ্গা তরঙ্গ প্রবাহে তাহার দেহের কানায় কানায় উদ্বেলিত, 'তখন সে স্বামীর সহিত শুষ্ক বিচার লইয়া ব্যস্ত'। এই নীরস পাষাণ স্বামী তাহার যুক্তিজালে 'সুখই' যে সর্ব্বক্ষেত্রে ও সর্ব্বকালে মানব জীবনের 'একমাত্র লক্ষ্য এবং অন্য সমস্তই উপলক্ষ্য তাহাই বুঝাইতেছিলেন'। এইরূপ শিক্ষা সংস্কার ও নীরস স্বামীর সংসার-মরুতে কিরণময়ী বাড়িতেছিল। নারীত্বের সঞ্জীবনী রসের নামগন্ধ সে বাড়ীতে ছিল না। জন্মান্ধের মত তাই কিরণময়ীর নারীত্ব শক্তি চির অন্ধকারে নিদ্রিত ছিল। প্রভাতের যে আলোকপাতে জাগরণ আসে, আবেষ্টনের দৃঢ় অন্তরালে সেই অরুণোদয় কিরণময়ী কখনও দেখিতে পায় নাই।

কিন্তু সকলই প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন। আমাদের চরিত্রবৃত্তিগুলিও স্বাভাবিক প্রেরণায় নিয়ন্ত্রিত। স্বামীগৃহের অন্ধ প্রাচীরেও তাই যৌবন-প্রবাহ কিরণময়ীর চরিত্রশক্তি নিয়ন্ত্রিত করিতে ত্রুটি করিল না। প্রেরণায় এক বুকফাটা তৃষ্ণায় কিরণময়ীর নারীপ্রাণ অস্থির হইয়া উঠিতেছিল। তৃষ্ণার মর্ম্মান্তিক জ্বালায়, অতি স্বাভাবিক নিয়মে, কালো পচা দুর্গন্ধযুক্ত নর্দ্দমার জলের মত অনঙ্গমোহনের ঘৃণিত প্রণয় গরল সে পান করিল। ক্লিন্নতায় তাহার সমস্ত দেহ মন বিষাইয়া উঠিল। তৃষ্ণার্ত্তের মত মরীচিকায় অন্তর্দাহন তাহার প্রতিদিনই বাড়িতে লাগিল।

অন্তর দ্বন্দ্বের তীব্রতার এই দুঃসহ ক্ষণে স্বামীর অসুস্থতার সূত্র অবলম্বন করিয়া বন্ধুর বেশে উপেন্দ্র ও সতীশ তাহার স্বামীগৃহে আবির্ভূত হইল। সে যেন চির অন্ধকারের ঘন আবরণ ভেদ করিয়া মধ্যাহ্ন সূর্য্যোদয়ের মত সহসা অপ্রত্যাশিত আলোকপাতে আজন্ম নিদ্রাচ্ছন্ন কিরণময়ীর নারীপ্রাণ স্নিগ্ধ উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত ও জাগ্রত করিয়া তুলিল। অজানা এক আন্তর শক্তির সন্ধান পাইয়া, শক্তির অনিরুদ্ধ প্রবাহে উৎপ্রাণিত হইয়া, জীবনে এই সর্ব্বপ্রথম কিরণময়ী বুঝিতে পারিল যে, 'ভালবাসার সাধ (তাহার) কত বেশী'। জীবন-দেবতার সন্ধান পাইয়া সার্থকতার আশায় তাহার সমস্ত নারীত্ব সে দেবতার পায়ে নিবেদন করিল। অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক নারীত্বের প্রবাহ, এতদিন যাহা আবেষ্টনের প্রতিকূলতায়, 'আসক্তি-ঘৃণার, তৃষ্ণা-বিতৃষ্ণার অবিশ্রাম সংঘর্ষে অহর্নিশ গরল উদ্গীরণ করিতেছিল', অমৃত সিঞ্চনে যেন সেই শক্তিকে উপেন্দ্র স্নিগ্ধতায় মঙ্গলময়ী করিয়া তুলিলেন। লেখক বলিয়াছেন, "শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণ অহল্যা যেমন মানুষ অহল্যা হ'য়েছিলেন", তেমনই কিরণময়ী উপেন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া আমূল বদলাইয়া গেল। মুমূর্ষু স্বামীকে বাঁচাইয়া তুলিবার প্রচেষ্টায় কিরণময়ী অহর্নিশ আপনাকে স্বামী সেবায় নিয়োজিত করিল। 'সে কি অপূর্ব্ব শুশ্রূষা!' সতীশকে সে ভ্রাতৃস্থানে গ্রহণ করিল। আজন্ম স্নেহবঞ্চিত দিবাকরকে সে কখনওবা মাতৃস্নেহে সন্তানের স্থানে, কখনওবা কনিষ্ঠ ভ্রাতার আসনে স্থাপন করিল। আর উপেন্দ্রকে জীবনে অবলম্বন করিয়া সূর্য্যের সহস্র রশ্মির মত কিরণময়ীর নারীত্ব স্নেহ, ভালবাসা, মমতা, সেবা ও পালন প্রভৃতির উৎকর্ষে বিকশিত হইতে লাগিল। একদিকে উপেন্দ্রের চরিত্রশক্তি যেমন কিরণময়ীর নারীত্বকে জাগ্রত ও সঞ্জীবিত করিয়া

তুলিতেছিল, অন্তঃসঞ্চারী শক্তিকে লীলাময়ী করিয়া তুলিতেছিল, অন্য-দিকে সুরবালার ভক্তি নির্ভরশীল স্থির চরিত্রের যাদুস্পর্শ সেই লীলায়িত কিরণময়ীর নারীত্ব তেমনি সুস্থির ও সুস্নিগ্ধ করিতেছিল। তাই আমরা দেখিতে পাই কিরণময়ী উপেন্দ্রকে নারীত্বের গুরু ও সুরবালাকে তাহার জীবন গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়াছে। তাহার নারীত্ব শক্তির দুর্ব্বার প্রবাহ উপেন্দ্রের চরিত্র আকর্ষণে, তাহার নিষ্ঠুর কঠিন পবিত্রতায় ও 'স্ফটিকের মত স্বচ্ছ এবং বজ্রের মত শক্ত' চরিত্রশক্তিতে প্রতিহত হইয়া যখন ঘূর্ণাবর্ত্তে উৎক্ষিপ্ত ও উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, সুরবালার শান্ত, স্থির, স্বচ্ছ, অতল ও গভীর নির্ভরশীল চরিত্রের নির্দ্দেশে তাহার মাতাল চিত্ত শান্ত হইতেছিল। একদিকে যেমন তাহার অন্তর তৃষ্ণা অপ্রাপ্তির বিক্ষোভে আরও বাড়িয়া চলিল অন্যদিকে সুরবালার শান্ত, গভীর ও একান্ত নির্ভরশীলতায় কিরূপে আপনাকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিলে জীবনদেবতার স্নেহ অনুরাগের অধিকারী হওয়া যায় কিরণময়ী তাহা শিখিল। কিরণময়ী বলিল, "ভগবানকে পাওয়া যায় না ব'লেই মানুষ এমন ক'রে সব দিয়ে তাকে চায়।······ তুমি (উপেন্দ্র) আমার এত বড় অপ্রাপ্য বস্তু না হ'লে, বোধ করি তোমাকে এত আমি ভালবাসতুম না।" অপ্রাপ্তির বিক্ষোভ, প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা আরও আবেগময়ী ও তীব্র করিয়া তুলিতেছিল। একলব্য যেমন অটল ভক্তিতে ও একনিষ্ঠতায় দ্রোণের মূর্ত্তিকে গুরু পদে বরণ করিয়া ধনুর্ব্বিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছিল তেমনই সুরবালার সেবা, নিষ্ঠা, একান্ত নির্ভরতা ও আত্মনিবেদনের শক্তিতে কিরণময়ী জীবনে যথার্থ ভালবাসা অর্জ্জন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। চরিত্র উন্মেষে লেখক অন্তর্নিহিত শক্তির অতল গভীরতা ও অপ্রতিহত গভীর ধারা ফুটাইয়া

তুলিলেন। যে চরিত্র এইরূপ দুর্ব্বার শক্তিসম্পন্ন, যাহার গভীরতা অতলস্পর্শী ও যাহার আবেগ দুর্নিবার, তাহাতে উন্মাদের কল্পনা আসিতে পারে না। কিরণময়ী পাগল হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সে পূর্ব্বে পাগল ছিল না। তাহার অন্তর্নিহিত শক্তি ছিল অপরাজেয়; হার মানিতে, বিরুদ্ধ আবেষ্টনকে স্বীকার করিয়া লইতে এবং আবেষ্টনের আনুগত্যে শক্তির ধারা প্রশমিত করিতে তাহার স্বাভাবিক চরিত্রশক্তি কখনও পারিত না এবং পারিলও না। অনুরূপ চরিত্র পরাজয়ে একমাত্র মৃত্যুকেই আলিঙ্গন করিতে পারে। জীবনকালে পরাজয়ের দৈন্যতা, স্বাভাবিক ধর্ম্মে এই চরিত্র স্বীকার করিতে পারে না। জীবনদ্বন্দ্বের পরবর্ত্তী ইতিহাসে প্রতি অঙ্কনে লেখক চরিত্রে এই স্বাভাবিক সত্য উন্মীলিত করিয়াছেন। *

ভালবাসার প্রথম আস্বাদে, উপেন্দ্রের চরিত্র প্রভাবে অন্তর্নিহিত সুপ্ত নারীত্বের জাগরণে প্রাপ্তির ও সার্থকতার আকাঙ্ক্ষায়, কিরণময়ীর সকল আন্তরবৃত্তিগুলি শক্তিময়ী রূপে আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। সে বুঝিল, 'ভাল (তাহাকে) বাস্‌তেই হবে', নিরুপায়ে সে বুঝিল, 'তাকেই (স্বামীকেই) ভালবাসতে হবে।…আমরণ স্বামীসেবা দিয়েই হয়ত একদিন তাকে (স্বামীকে) পাব' এই আশায় পাহাড় ভাঙা ঝরণার একমুখী নিম্নগতিতে সেবায় ও শুশ্রূষায়, মুমূর্ষু স্বামীকে বাঁচাইয়া তুলিতে সে আত্মনিয়োগ করিল। বাঁচাইতে পারিলে হয়ত বা

* Great literature must exhibit the great possibilities and exertions of human nature, i.e. strong passions, strong will, depth and breadth of experience.—Winchester, 'Principles of Literary Criticism.'

কিরণময়ী আপ্রাণ সাধনায় সেই শুষ্ক পাথর প্রাণে প্রেমের উৎস ফুটাইয়া তুলিতে পারিত। এস্থলেও অসাধ্য সাধনের আপ্রাণ চেষ্টা আমরা কিরণময়ীর চরিত্রে দেখিতে পাই। কিন্তু মৃত্যু স্বামীকে গ্রাস করিয়া কিরণময়ীর এই কর্ম্মক্ষেত্র অপসারিত করিল। কালের নিশ্চিত গ্রাস হইতে স্বামীকে ছিনাইয়া লইয়া তাহার অন্তরে প্রেমের প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প এইরূপে কিরণময়ীর ব্যর্থ হইল।

'ভাল তা'কে বাস্‌তেই হবে।' স্বামী-বিয়োগে কিরণময়ী দেখিতে পাইল 'সাক্ষাতের প্রথম দিন থেকে সেই যে' উপেন্দ্র তাহার বুক জুড়িয়া রহিল, কোন মতেই সেখান হইতে কিরণময়ী আর তাহাকে সরাইতে পারিল না। নিঃসঙ্কোচে তাহার অন্তর সত্য উপেন্দ্রকে জানাইয়া সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বিজয় যাত্রা এই চরিত্রের সহজাত বৃত্তি। দেবতা তাহার পূজার অর্ঘ্য গ্রহণ না করিলেও উপেক্ষায় বা ঘৃণায় পদদলিত করিলেন না। আপ্রাণ সাধনায় সে দেবতার বিশ্বাস অর্জ্জন করিল। 'আমি যাকে ভালবাসি তার অমঙ্গল আপনার দ্বারা কখনও হবে না', এই বিশ্বাসে উপেন্দ্র দিবাকরকে কিরণময়ীর হাতে সমর্পণ করিবেন প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। বিজয় গর্ব্বে নারীত্বের মহীয়সী মূর্ত্তিতে, স্নেহ ও পালন ধর্ম্মে কিরণময়ী দেবতার দান দিবাকরকে, 'নাবালক ছোট ভাইটির মত' গ্রহণ করিল। স্নেহসাগরে অপর্য্যাপ্ত রসের আস্বাদে দিবাকর আকণ্ঠ পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিল। সেবা, যত্ন, পালনে ও নারীত্বের পূর্ণ মহিমায় কিরণময়ী তাহার স্নেহ-মন্দাকিনী উজাড় করিয়া অভিনব মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে আত্মপ্রকাশ করিল। দেবতার ঐ বিশ্বাসটুকু জীবনে তাহার অমৃত ধারা বহাইয়া দিল। কি সে স্নিগ্ধ মূর্ত্তি, তৃপ্ত নারীত্বের

গৌরবময়ী ছবি ! সার্থকতার তৃপ্তিতে নারী তাহার অফুরন্ত মাধুর্য্যে প্রস্ফুটিত হয়। নারীত্বের উন্মীলন, সারাল জমিতে অনুকূল আবহাওয়ায় সুবর্দ্ধিত বৃক্ষে বিকশিত পুষ্পের মত। আত্মতৃপ্তিতে যেন বিশ্বের সৌন্দর্য্য চয়ন করিয়া নিজের মধ্যে প্রকাশ করে। জীবন-দেবতার নির্দ্দেশে নারীর অন্তঃশক্তি স্বচ্ছ ও স্নিগ্ধ গতিতে বহাইয়া দিবার আন্তরিক প্রয়াস আমরা কিরণময়ীর এই আপ্রাণ সেবা ও পালনের মূর্ত্তিতে দেখিতে পাই। তাহার বিক্ষুব্ধ প্রাণ যেন এতদিনে পথের নির্দ্দেশ পাইয়া আনন্দ-কল্লোলে, নিশ্চিন্তে সেই পথে অবিচ্ছিন্ন বহিয়া চলিল। স্নিগ্ধ ও শান্ত উচ্ছ্বাস, কর্ম্মে আন্তরিক প্রেরণা কিরণময়ীর চরিত্রে আমরা সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য করিলাম। মুমূর্ষু স্বামীর কঠোর সেবা-ব্রতে অসাধারণ আত্মনিয়োগ এই চরিত্রে আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম সন্দেহ নাই। সেই কঠোর সাধনা সত্যই আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছিল, কিন্তু সেই কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় ও স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করিবার আপ্রাণ চেষ্টায় আমরা আন্তরিক অনুপ্রেরণার সহজ উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই নাই। এ যেন সমুদ্রে বাত্যাক্ষুব্ধ তরীর কূলে পৌঁছিবার কঠোর প্রচেষ্টা মাত্র, সাধনায় ও সঙ্কল্পে সমুদয় আত্মশক্তি নিয়োগ; কিন্তু দেবতার দান দিবাকরের পালনভার জীবনের সহজ ছন্দময়ী উৎসাহে, করুণায় ও স্নেহে কিরণময়ী গ্রহণ করিল। তাহার পালনে, যত্নে, সেবা ও শুশ্রূষায়, কর্ত্তব্যের কঠোর নিষ্ঠা তিরোহিত হইয়া নারীপ্রাণ সহজে উৎসারিত হইল। বিশ্বাসের স্নিগ্ধ আকর্ষণে এই অস্থির আবেগময়ী চরিত্র সুস্থিরভাবে আত্মপ্রকাশ করিল।

দিবাকরের সহিত ব্যবহারে, আলাপ ও রহস্য পরিহাসে লেখক কিরণময়ী চরিত্রে এক অভিনব রহস্যের প্রবর্ত্তন ও তাহার সমাধান

করিয়াছেন। উপেন্দ্রের চরিত্র ছিল পবিত্রতায় শুভ্র-কঠিন স্ফটিক স্তম্ভের মত। সমুন্নত এই চরিত্রের আকর্ষণে, এক রহস্যময় বিধানে, কিরণময়ী তাহার নারীত্বের গৌরবময় আসনে উপেন্দ্রকে বসাইল। কিন্তু এই জীবনদেবতার অনুরাগস্পর্শ লাভের আশা তাহার জীবনে সুদূর পরাহত ছিল। জীবনেতিহাসে, অতীতের কদর্য্যতার গ্লানিতে অতিষ্ঠ হইয়া সে উপেন্দ্রকে তাহার সব কথাই আনুপূর্ব্বিক বিবৃত করিল। স্বভাবতঃই কিরণময়ীর মনে হইয়াছিল, তাহার অতীত জীবনের বীভৎসতায় উপেন্দ্রের মন ঘৃণায় বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিবে, তাহার মুখ আর উপেন্দ্র কখনও দেখিবেন না। কিন্তু কিরণময়ীর, "এত কথা শোনার পরেও তুমি (উপেন্দ্র) এত বড় বিশ্বাসের ভার আমার ওপর কি ক'রে দেবে ঠাকুরপো", প্রশ্নের উত্তরে উপেন্দ্র যখন জানাইলেন যে, তিনি যাহাকে ভালবাসেন, কিরণময়ীর দ্বারা তাহার অমঙ্গল ঘটিবে বলিয়া কখনও উপেন্দ্র ভাবিতেও পারেন না, ইহা শুনিয়া বিশ্বাসের স্নিগ্ধ-অতলে কিরণময়ী ডুবিয়া গেল। উপেন্দ্রের তাহার প্রতি স্থির-বিশ্বাসের অন্তরালে উপেন্দ্রের প্রাণে কিরণময়ীর প্রতি অটল শ্রদ্ধা ও ভালবাসার যে প্লাবন বহিতেছিল, সে তাহা অনুভব করিল। এই অপ্রত্যাশিত নব জ্ঞানলাভে, সার্থকতার তৃপ্তিতে কিরণময়ীর নারীপ্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। উপেন্দ্রের ভালবাসায় এই অমূল্য জ্ঞানলাভে, দেবতার বিশ্বাস সম্পদটুকু অবলম্বন করিয়া হয়ত সাবিত্রীর মত, কি চন্দ্রমুখীর মত, দেবতার নির্দ্দেশে সেবা ও মঙ্গলব্রতে পরবর্ত্তী জীবন সেও কাটাইয়া দিতে পারিত। কিন্তু স্বভাবধর্ম্মে আবেষ্টনের প্রতিকূলতা জীবনে মানিয়া লওয়া কিরণময়ীর চরিত্রবিরুদ্ধ ছিল। তাহার চরিত্রশক্তি সর্ব্বদা এবং সর্ব্বত্রই আবেষ্টনকে পরাভূত করিয়া চলিয়াছে। প্রতিকূলতায় সর্ব্বত্রই বিদ্রোহী

হইয়া উঠিয়াছে। তাই দেখা যায় যে, উপেন্দ্রের শ্রদ্ধা ও প্রেমসম্পদে পরিপুষ্ট হইয়া যত শ্রদ্ধায় ও স্নেহে অধিকার-জ্ঞান কিরণময়ীর জন্মিতেছিল ততই সহজ স্ফুরণে, স্নিগ্ধতায় ও মাধুর্য্যে তাহার প্রাণ মুখর হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই অসাধারণ শক্তিশালী চরিত্র, অন্তর্নিহিত এক অসাধারণত্বের জন্যই সাধারণ আবেষ্টনের আনুকূল্য অসম্ভব করিয়া তুলিল। চরিত্রের জটিল গতি তীক্ষ্ণধী ও ধীর চরিত্র উপেন্দ্রকেও সাময়িক ভাবে হতবুদ্ধি করিয়া তুলিল।

দিবাকর-প্রসঙ্গ কিরণময়ীর চরিত্রে এক অভিনব রহস্যের সৃষ্টি করিয়াছে। প্রসঙ্গটি কিরণময়ী-চরিত্রের সহিত মূলতঃ অঙ্কুরিত হইয়াছে —আখ্যায়িকায় ইহা অসংবদ্ধ পরগাছা নয়। কিরণময়ীর সাবলীল তরঙ্গায়িত চরিত্র-প্রবাহ এই প্রসঙ্গটিকে অবলম্বন করিয়া অন্তর্নিহিত শক্তিপ্রাচুর্য্যে সুবিকশিত হইয়া বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। অসাধারণ এই চরিত্রের অভিনব বিকাশ তাই অদম্য নৃত্যছন্দে শান্ত স্থির উপেন্দ্রের মনেও ভ্রান্তির সৃষ্টি করিল। আপাতদৃষ্টিতে চরিত্রের অতি সহজ ও স্বাভাবিক গতিতে হাস্যকৌতুক, পরিহাস চাটুল্যে দিবাকরের সহিত কিরণময়ীর সম্বন্ধটা যেন কদর্য্যতার ইঙ্গিত করে। একদিকে বিকচোন্মুখ কোরকের মত দিবাকরের নবযৌবনের ভাবপ্রবণ মূর্ত্তি ও নবাগত যৌবনের অজ্ঞাত প্রেরণায় তাহার মৃদুমত্ত রূপ, অন্যদিকে সোচ্ছল যৌবনধর্ম্মা অসামান্যা রূপসী বিধবা কিরণময়ীর দিবাকরের সহিত স্বাধীন চপল ব্যবহার বিভ্রান্ত দিবাকরের মতই পাঠক সাধারণের মনেও উভয়ের সম্বন্ধে সন্দেহ জাগাইয়া তোলে। নারীর অন্তরের স্বাভাবিক ভাবধারাগুলি দিবাকরের নিকট ব্যক্ত করিতে কিরণময়ী সঙ্কোচ করিত না। দিবাকরও এক অজ্ঞাত আন্তর প্রেরণায় সেই অজানা রূপের স্বরূপ,

কিরণময়ীর কাছে বুঝিয়া লইতে লজ্জা-নম্র অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছে। সাধারণ ক্ষেত্রে চরিত্রদ্বয়ের অনুরূপ ব্যবহারে কদর্য্যতার সন্দেহ আসা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। দিবাকরের 'বিষের ছুরি' নভেল লিখিবার প্রচেষ্টায় অনভিজ্ঞ যুবক ও লেখকের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অপরিপক্কতা তীক্ষ্ণধী বিদুষী কিরণময়ীর মনে ব্যঙ্গ ও পরিহাসের রস সৃষ্টি করিল। চরিত্রগত স্বাভাবিক তীক্ষ্ণতায় এই অপরিপক্ক যুবককে সে বিদ্রূপের খোঁচা দিতে ছাড়িল না। বলিল, "যা' নিজে বোঝ না, তা' পরকে বোঝাবার চেষ্টা কোরো না।" হাসি ঠাট্টায় ও কারুণ্যে এই অনভিজ্ঞ ও অপরিণত বুদ্ধি যুবককেও ক্ষণে ক্ষণে রাগ অভিমান, দুঃখ ও ভক্তি জাগাইয়া তুলিয়া এবং তাহা উপভোগ করিয়া সে আনন্দ লাভ করিতেছিল। বুদ্ধির প্রখরতায় এইরূপে দিবাকরের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া কিরণময়ী নিজের চপল চরিত্রের কৌতুকপ্রিয়তা সার্থক করিতেছিল। স্বীয় অভিজ্ঞতায় ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে দিবাকরের চরিত্রদৌর্ব্বল্য কিরণময়ীর নিকট আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল, জীবনে কত সাধনায়, তপস্যার কঠোরতায় যে নারী প্রকৃত জীবনদেবতার সন্ধান পায় এবং কত গভীর প্রেম অর্ঘ্যে যে সে দেবতার পূজা করিতে পারে, কিরণময়ী তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিয়াছিল। চরিত্রের কি সুগভীর দৃঢ়তায় নারীত্বে প্রেমধর্ম্ম অবিচলিত হয়, তাহার জীবনগুরু সুরবালার আদর্শ শিক্ষায় সে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। আবার উপেন্দ্রের সমুন্নত ও সুদৃঢ় চরিত্রের সংস্পর্শে সে নারীর জীবনদেবতার অন্তঃশক্তির স্বরূপও অনেকটা জানিয়াছিল। পুরুষচরিত্রের যে কোন অন্তর্নিহিত শক্তি নারীর সুপ্ত নারীত্বকে জাগ্রত করে এবং সেই শক্তির স্বরূপ কি, তাহাও জীবন-মধ্যাহ্নে উপেন্দ্রের আদর্শে কিরণময়ী বুঝিতে পারিয়াছিল। তাই

দিবাকরের 'বিষের ছুরি'র নায়ক ও নায়িকার কাল্পনিক পরিণতিতে কিরণময়ী দিবাকরের নির্ব্বুদ্ধিতা ও অনভিজ্ঞতা লইয়া পরিহাসের লোভ সংবরণ করিতে পারিল না। বলিল, "প্রেমের ব্যবসা অত সোজা নয়।"

প্রশ্ন আসে, বিধবা যুবতীর পক্ষে অপরিণত যুবকের সহিত নারীর জীবন-ধর্ম্মের এই স্বাধীন আলোচনা কতদূর যুক্তিসঙ্গত। একান্ত বিশ্বাসে যাহার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের ভার উপেন্দ্র কিরণময়ীর হাতে ন্যস্ত করিয়াছিলেন, কিরণময়ীর অনুরূপ ব্যবহার সেই দিবাকরের পক্ষে কতদূর মঙ্গলদায়ক হইয়াছিল এবং ঐ ব্যবহার ও আলাপের হাস্য চাপল্যে কোন প্রচ্ছন্ন কদর্য্যতার ইঙ্গিত ছিল কি না, তাহার বিচার করিতে গিয়া প্রথমে আমাদের মনে পড়ে 'ঠাট্টাতামাসায়' দিবাকরের বিরক্তিতে কিরণময়ী দিবাকরকে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "তুমি যে আমার দেওর হও ঠাকুরপো, তোমার সঙ্গে যে ঠাট্টা তামাসারই সুবাদ। এ সব না করে বাঁচি কি ক'রে বল দেখি ভাই।" লেখকও বলিতেছেন, "বাঙালীর সমাজের দেবর-ভাজের মধ্যে একটি মধুর হাস্য পরিহাসের সম্বন্ধই বিরাজিত রহিয়াছে।...কিন্তু এই নির্দ্দোষ হাস্য পরিহাসের আতিশয্যে কত সময় যে কত বিষের বীজ ঝরিয়া পড়ে এবং অলক্ষ্যে অজ্ঞাতসারে উপ্ত হইয়া বিষবৃক্ষে পরিণত হইয়া অকস্মাৎ এক সময় সমস্ত পরিবারকে ভীত চমকিত করিয়া দেয় তাহার হিসাব ক'জন রাখে।" দিবাকর ও কিরণময়ীর দেবর-ভাজ সম্বন্ধে 'হাস্য-পরিহাসের আতিশয্যে' ও 'বিষের বীজ ঝরিয়া পড়িতেছিল কি না' তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিৎ, কিরণময়ীর অবাধ হাসি ঠাট্টার কোন সীমারেখা ছিল না। সহজ প্রাণের নগ্ন উচ্ছ্বাস ও নারী ধর্ম্মের

স্বাধীন বিচারে কিরণময়ীর কোন বাধা বা কুণ্ঠা আমরা কখনও দেখি নাই। "নারীর রূপ জিনিষটা কি?" বিচারে কিরণময়ী বলিল, "সন্তান ধারণের জন্য যে সমস্ত লক্ষণ সব চেয়ে উপযোগী তাহাই নারীর রূপ।...শুধু নারীর নয়, পুরুষেরও এই দশা। ততক্ষণই তার রূপ যতক্ষণ সে সৃষ্টি করতে পারে। এই সৃষ্টি করবার ক্ষমতাই তার রূপ যৌবন, এই সৃষ্টি করার ইচ্ছাই তার প্রেম।" এইরূপ সৃষ্টিতত্ত্বের নারীর রূপ ও যৌবন-ধর্ম্মের সহজাত প্রবৃত্তির তাড়না ও সামাজিক, নৈতিক এবং কর্ত্তব্যবুদ্ধির শাসনশক্তির অবাধ আলোচনায় কিরণময়ীর দিবাকরের সহিত আন্তরিক সম্বন্ধটা ভাজ ও দেবরের সম্বন্ধের সীমা যেন অতিক্রম করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই হাস্যচাতুরী, চপল পরিহাসের নামে আমরা ইহাও কিরণময়ীকে বলিতে শুনি, "যিনি আমার যথার্থ স্বামী, তিনি নিশিদিনই আমার এইখানে আছেন, বলিয়া অঙ্গুলি দিয়া বক্ষস্থল নির্দ্দেশ করিল।"... "আমি একজনের কাছে যেতে চাই, সে মরণের ওপারে নয় ঠাকুরপো, এপারেই। এতদিন চ'লেও যেতুম··শুধু যদি একবার জানাতো আমাকে চায় কি না।" কথাগুলির ইঙ্গিতে কিরণময়ীর নারীহৃদয়ে যে দিবাকরের কোন স্থান ছিল না, সে দিবাকরকে ভালবাসার কথা কখনও মনেও করে নাই, তাহা স্পষ্টই ব্যক্ত হয়। আরাকানে দুর্গতির চরম মুহূর্ত্তে যখন বাড়ীওয়ালীর ভাড়াটে ঘরে কিরণময়ী দিবাকরের রক্ষিতার ভূমিকা অভিনয় করিতেছিল, বাহিরে দশজনের চক্ষে ঐ বাহ্যিক অভিনয়টা সত্য বলিয়া ধার্য্য হইয়াছিল, দিবাকরের সহিত অবাধ জীবন যাপনের কোনও অন্তরায়ই ছিল না, তখনও আমরা কিরণময়ীকে বলিতে শুনিয়াছি, "যেদিন তোমার উপীনদা, আমার

হাতে তোমাকে সঁপে দিয়ে যান, সেই দিন থেকেই তোমাকে ছোট ভাইয়ের মত, নিজের ছেলের মত ভালবেসেছিলুম। তাইত এই ছয়মাস ধ'রে একঘরে বাস ক'রেও তোমাকে এই দেহটা নষ্ট করতে দিতে পারি নি,—তাই ত তোমার চক্ষের ক্ষুধায়, তোমার মুখের প্রেম নিবেদনে আমার সমস্ত দেহ ঘৃণায়, লজ্জায় এমন ক'রে শিউরে ওঠে!" উক্তি শুনিয়া কিরণময়ীর প্রখর দৃষ্টির সম্মুখে, 'বেত্রাহত কুকুরের ন্যায় সঙ্কুচিত হইয়া' দিবাকর সরিয়া গেল। অতএব কিরণময়ীর মনে আর যাহা কিছু থাকুক না কেন, দিবাকরের প্রতি ভালবাসার যে লেশমাত্র ছিল না তাহা অস্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। হয়ত উপেন্দ্রের বিশ্বাসের মর্য্যাদা সে রাখিতে পারে নাই, হয়ত যে মঙ্গলের আকাঙ্ক্ষায় উপেন্দ্র দিবাকরকে কিরণমীর স্নেহাশ্রয়ে রাখিয়াছিল, কিরণময়ী সেই দিবাকরের মঙ্গল কামনা চিরদিন করিতে পারে নাই। দুর্ব্বল চরিত্র নবীন যুবককে হয়ত কিরণময়ী সংযত শাসনের কষাঘাতে সবল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে নাই, এ সকলই হয়ত সত্য, কিন্তু দিবাকরের নিকট দেহ বিক্রয় কিংবা দিবাকরকে নারীত্বের আসনে বসাইবার ইচ্ছা কখনও কিরণময়ীর মনে জাগে নাই। সে তাহাকে বরাবর নির্ব্বুদ্ধি, দুর্ব্বল ও সঙ্কল্পহীন যুবক 'বিষের ছুবির' নায়ক বলিয়া মনে করিয়া করুণার চক্ষে দেখিয়াছে এবং তাহার মনে এই দুর্ব্বলতায় পরিহাসের জল্পনা আসিয়াছে।

তবে কেন এমন হইল? যাহাকে কিরণময়ী কোনদিন নারীত্বের সহচর রূপে চাহে নাই, যাহার হাস্যকর দুর্ব্বলতা, অপরিণত বুদ্ধি ও সঙ্কল্পহীন ভাবপ্রবণতাকে সে চিরদিনই করুণার চক্ষে দেখিয়া উপহাস করিয়াছে, সেই অনভিজ্ঞ হীনবুদ্ধি দুর্ব্বল যুবকের অমন

করিয়া সে সর্ব্বনাশ করিল কেন? প্রশ্ন আরও রহস্যপূর্ণ হইয়া ওঠে যখন আমরা দেখিতে পাই যে, দিবাকরকে পঙ্কিল আবর্ত্তে ডুবাইয়া কিরণময়ী শুধু তাহারই সর্ব্বনাশ করে নাই, নিজের সর্ব্বনাশই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়াছে। উপেন্দ্র ও সুরবালার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মহত্ত্বের শান্ত ও কঠিন আকর্ষণে আত্মিক উন্মাদনা ভুলিয়া কিরণময়ী সুস্থির হইতেছিল, চির অবিশ্বাসীর জীবনে বিশ্বাস ও শান্তির প্রতিষ্ঠা হইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ বিচ্ছিন্ন হইয়া তবে কিসের প্রমত্ততায় গৃহ-ত্যাগ করিয়া কুলটার বেশে দিবাকরকে লইয়া কিরণময়ী সাগরে ভাসিল? গৃহত্যাগের এই কারণের গুরুত্ব অত্যধিক না হইলে, তাহার আকর্ষণ সর্ব্বধর্ম্মধ্বংসী না হইলে এবং প্রলোভন উন্মত্তকরী না হইলে কিরণময়ীর এই কুলধর্ম্ম ত্যাগ নিতান্তই অহেতুক হইয়া পড়ে। অকারণ হেঁয়ালীতে কিরণময়ীর মত শক্তিমতী ও বিদুষী চরিত্র যে এত বড় গর্হিত কার্য্য করিয়া বসিবে তাহা সহজে মানিয়া লওয়া যায় না। অতএব কি সে কারণ? বিচারে কিরণময়ীর চরিত্রের মৌলিক শক্তির গতি ও পরিণতির আলোচনা আবশ্যক।

পূর্ব্বে আমরা দেখিতে পাইয়াছি যে, আন্তর সত্য উপেন্দ্রের পায়ে নিবেদন করিয়া কিরণময়ী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল। এই পঙ্কিল জীবনের নগ্ন ইতিহাস শ্রবণে উপেন্দ্রের 'নিষ্ঠুর কঠিন পবিত্র' এবং 'স্ফটিকের মত স্বচ্ছ ও বজ্রের মত শক্ত' অন্তরে ঘৃণা বা বিতৃষ্ণার উদ্রেক না হইয়া বরং এক রহস্যময় স্নেহচ্ছায়ার উদয় হইয়াছিল। যেন এক সশ্রদ্ধ ক্ষমার উৎসের ইঙ্গিত সেই চরিত্রে কিরণময়ী দেখিতে পাইয়াছিল। সব শুনিয়াও উপেন্দ্র তাহার স্নেহের পাত্র দিবাকরের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের ভার কিরণময়ীর হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন। বাত্যাহত

ক্ষুব্ধ সাগরের প্রলয় গর্জ্জন যেমন অনুকূল স্নিগ্ধ মলয়ে শান্ত হইয়া ওঠে, তেমনই যেন স্নেহ ও ক্ষমার শান্তিবারি সিঞ্চনে কিরণময়ীর বিক্ষুব্ধ উচ্ছ্বাসময়ী মত্ত চরিত্রশক্তি শান্ত ও সুস্থিরে প্রবাহিত হইয়াছিল। সমস্ত দিবাকর-প্রসঙ্গটিতে কিরণময়ীর যে আনন্দ-কূজন আমরা শুনিতে পাই, তাহা ঐ শান্ত চরিত্রেরই স্বচ্ছন্দ-সঞ্চার। আনন্দের এই স্বতঃ উৎস স্নেহের দান সোদরোপম দেবর দিবাকরকে ঘিরিয়া লীলায়িত হইয়া উঠিল। বাঙ্গালী সমাজে বৌদিদির দেবর ভিন্ন এইরূপ নিঃসঙ্কোচ আলাপ ও আনন্দ-উচ্ছ্বাস আর কোথাও সম্ভবপর নয়। দিবাকর-প্রসঙ্গে তাই লেখক কিরণময়ীর তৎকালীন চরিত্রশক্তির ও মানসিক বৃত্তির স্বরূপ সুব্যক্ত করিবার উপযুক্ত সুযোগ করিয়া লইলেন। শুধু মাত্র পরিচয়টি গোপন রাখিয়া কিরণময়ী তাহার অন্তর্গূঢ় সত্য দিবাকরের নিকট প্রকাশ করিল। লেখকের সুনিপুণ তুলিকায় এই সুব্যক্ত সত্য নির্ব্বোধ দিবাকরকে এড়াইয়া পাঠকের চক্ষে এক মনোরম পরিহাসের সৃষ্টি করিল। পাঠক দেখিতে পাইল কি গভীরতম আকর্ষণে ও বিশ্বাসে সুস্থির হইয়া কিরণময়ীর সমস্ত নারীজীবন তাহার আন্তর-দেবতা উপেন্দ্রের পায়ে নিবেদিত হইয়াছিল, আর কি দুর্ব্বলতায় শক্তিহীন যুবক দিবাকর ক্রীড়নকের মত এই শক্তিময়ী চরিত্রের উপহাস ও পরিহাসের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছিল। বিচারে, বুদ্ধিতে, জীবন, যৌবন ও সৃষ্টিতত্ত্বের আলোচনায় গভীর প্রেম ও আত্মনিবেদনে, নারীত্বের নব জাগরণের প্রতি রেখাপাতে শরৎচন্দ্র অভিনব এই কিরণময়ীচরিত্রের প্রতিটি স্তর ধীরে ধীরে উন্মুক্ত করিয়াছেন। কিরণময়ীর চরিত্রে লেখক নারীত্বের যতদূর সম্ভাব্য বিকাশ হইতে পারে তাহা পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন।

কিরণময়ী ও সাবিত্রী

নারীর অতৃপ্ত মাতৃত্বের ক্ষুধা, 'দুর্দ্দান্ত অনাবৃষ্টির জ্বালা', প্রলয়ের যে কি ঘোর আবর্ত্তে তাহাকে বিকৃতরূপী করিয়া পিশাচের ঘৃণিত সহচরী করিয়া তুলিতে পারে, কিরণময়ীর প্রথম জীবনেতিহাসে, উপেন্দ্রের নিকট স্বীকারোক্তিতে তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আবেষ্টনের নির্ম্মমতা ও কদর্য্য পরিবেশের নারকীয় পঙ্কিলতা যেন ঐ ঘৃণিত রূপকেও স্বাভাবিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া লেখক তাঁহার প্রতিভাবান্ অঙ্কনে কিরণময়ীর প্রতি পাঠকের করুণ সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন,—ঘৃণার উদ্রেক করেন নাই। এই প্রচ্ছন্ন সহানুভূতির মুক্ত রূপ লইয়া উপেন্দ্র কিরণময়ীকে স্নেহ ও ক্ষমাদান করিলেন। অন্তরশক্তি ও মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া উপেন্দ্র কিরণময়ীকে স্নেহ-করুণ চক্ষে না দেখিয়া পারিলেন না। স্বীয় কর্ত্তব্যের ভার তাহার উপর অর্পণ করিয়া তাহাকে জীবনের অংশীদার করিয়া লইলেন। অনুদার, সঙ্কীর্ণ ও সমবেদনাশূন্য নির্ম্মম আবেষ্টনে যে চরিত্র বিকৃত হইয়া উঠিয়াছিল, উদার ও শক্তিমানের ক্ষমা, করুণা ও বিশ্বাসের স্নিগ্ধ স্পর্শে সেই চরিত্র আবার গভীর মাধুর্য্যে, নিঃশেষ আত্মনিবেদনে, স্নেহ ও ভালবাসার জীবন্ত উৎসে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। কর্ত্তব্যের নির্দ্দেশে অমানুষিক শক্তিতে সে মুমূর্ষু স্বামীর জীর্ণদেহে প্রাণসঞ্চার করিবার প্রয়াসে মাতিয়া উঠিল। 'কি সে আশ্চর্য্য সেবা!' সেবাব্রতে সে সতীশের, এমন কি উপেন্দ্রের পর্য্যন্ত, শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিল। আবার দিবাকর-প্রসঙ্গে এই নিষ্ঠাব্রতা নারী যেন স্বচ্ছ যৌবনের কলোচ্ছ্বাসে পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মত ছন্দময়ী হইয়া উঠিল। তাহার হাস্যকৌতুক, জীবন ও যৌবন ধর্ম্মের আলোচনা, সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্লেষণ, সকলই যেন নব জীবনের ছন্দ; উচ্ছ্বাসে আনন্দমুখরা ও সদ্যপ্রস্ফুটিত ফুলের উল্লাসময়ী ছবি-রূপে, গন্ধে, চাঞ্চল্যে, হাস্যকৌতুকে

চির আকর্ষণময়ী ! আবার যখন কিরণময়ীকে দিবাকর, সতীশ এমন কি উপেন্দ্রকেও ধর্ম্ম, সমাজনীতি, কাব্য ও কৃষ্টির সূক্ষ্মতত্ত্বের বিচারে যুক্তি-জালে পরাভূত করিতে দেখি, এই তীক্ষ্ণধী, বিদুষী, জ্ঞানগভীরতায় ও প্রতিভায় আমাদিগকে সশ্রদ্ধ করিয়া তোলে। সমস্যার অমন সহজ সমাধান, বুদ্ধির প্রখরতা, জটিল ধারণাশক্তি যেন কিরণময়ীকে পাণ্ডিত্যে গৌরবময়ী করিয়া তোলে। লেখকেব শিল্পচাতুর্য্যে এই নিরভিমান পাণ্ডিত্য কিরণময়ীর সহজ রূপ বলিয়া মনে হয়।

কিন্তু এই অসীম শক্তিসম্পন্ন চরিত্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হইল সহজ প্রেমাত্মক নারীত্ব। 'ভাল আমাকে বাস্‌তেই হবে' কথাটি কিরণময়ীর বিচার বুদ্ধি প্রসূত নয়, ইহা তাহার অন্তরতম অন্তরের একমাত্র সত্য। ইহারই প্রেরণায় মরীচিকালুব্ধ তৃষ্ণার্ত্তের মত সে অনঙ্গমোহনের প্রলোভনের পঙ্কিলতায় পড়িয়া বিষাইয়া উঠিয়াছিল, ইহারই তীব্র আকর্ষণে শত মাতঙ্গের দুর্নিবার শক্তিতে মুমূর্ষু স্বামীকে বাঁচাইয়া তুলিবার অসম্ভব প্রচেষ্টা করিয়াছিল, ইহারই শান্ত, স্নিগ্ধ, সুদৃঢ় ও গভীর আকর্ষণে, নারীত্বের নব জাগরণে সে নিঃশেষে উপেন্দ্রের পায়ে আত্মনিবেদন করিয়া নির্ভরকামী হইয়াছিল। আবার ইহারই মৃদু উচ্ছ্বাসে সাবলীল তরঙ্গ-ছন্দে ছোট ভাইয়ের মত দেবর দিবাকরকে সে হাস্য পরিহাসে উৎক্ষিপ্ত করিতেছিল। জীবনের পরিণতি ও এই দুর্নিবার অন্তঃশক্তির স্বাভাবিক গতিতে তাই আপ্রাণ উচ্ছ্বাসে আছড়াইয়া পড়িয়া আশ্রয়-নির্ভরকে সমূলে উৎপাটিত করিয়া ভাসাইয়া লইয়া উত্তাল তরঙ্গভঙ্গীতে আবর্ত্তে পড়িয়া কিরণময়ী উন্মাদ হইয়া গেল।

নারী তাহার সহজাত প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে একবার যাহাকে জীবন দেবতারূপে আশ্রয় করে, স্বভাবতারল্যে, নির্ভরতায় যাহাতে নিঃশেষে

নিজেকে সমর্পণ করে, জীবনে কোনও প্রতিকূল আবেষ্টনে, ঝঞ্ঝা-বাত্যায় সে তাহার এই আত্মিক আশ্রয়স্থল ত্যাগ করিতে পারে না। ছায়ার বক্ষে আলোর মত তাহার নারীত্বে, প্রতি অণু পরমাণুতে, সে এই আশ্রয়ে নির্ভর করিয়া থাকে। ক্ষীণ নারীত্বশক্তি অনেক সময় বৃহত্তর শক্তিসম্পন্ন আবেষ্টনের প্রভাবে পরাজয় মানিয়া লইয়া অধীনতা স্বীকার করিয়া থাকে সত্য, কিন্তু অধীনতা স্বীকার তাহার স্বভাবধর্ম্ম নয়, ইহা শুধু অক্ষমতায় নারীত্বের পরাজয় মাত্র। চন্দ্রমুখী, পার্ব্বতী, বিজলী প্রভৃতি চরিত্রে আমরা নারীত্বের এই পরাজিত রূপই দেখিতে পাইয়াছি। সহজাত প্রবৃত্তির নির্দ্দেশে, জীবনে যে দেবতাকে নারীত্বের আসনে বসাইয়াছিল, একান্তে যাহাকে আত্মীয় বলিয়া নির্ভর করিয়াছিল, দ্বন্দ্বের শক্তিহীনতায় তাহাকে লাভ করিতে অক্ষম হইয়া, পরাজয় মানিয়া লইয়া, তাহারা জীবনে মৃত্যু বরণ করিয়া লইল। তাহাদের ব্যর্থ জীবনের পরবর্ত্তী ইতিহাসে নারীত্বের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য, লীলায়িত জীবন স্পন্দন আর আমাদের চোখে পড়ে না। খঞ্জের পর্ব্বত লঙ্ঘনে যে নৈরাশ্য আসিয়া থাকে, পাদমূলে বসিয়া উন্নত শিখরের দিকে যেমন সে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া ধীরে মৃত্যুতে জীবন শেষ করে, অক্ষমতায় জীবনে তাহার ঈপ্সিত লাভ ঘটে না, তেমনি পার্ব্বতী, চন্দ্রমুখী প্রভৃতির জীবন ব্যর্থতার ইতিহাসের অন্তরালেও তাহাদের শক্তিহীনতাই শ্রেষ্ঠতম কারণ বলিয়া দেখা যায়। জীবনের সার্থকতা কোথায় বুঝিয়া তাহারা ইষ্টে আত্মনিবেদন করিল বটে, কিন্তু অক্ষমতায় ইষ্ট প্রাপ্তি তাহাদের ভাগ্যে ঘটিল না।

কিন্তু কিরণময়ী ছিল অসাধারণ। তাহার আন্তরশক্তি অতল গভীরতায় ও দুর্নিবার গতিতে যাহা কিছু দুর্ব্বল, অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক

সকলকে সহজেই পরাভূত করিয়া চলিয়াছে। মানিতে হইবে বলিয়া মানিয়া লওয়া এই চরিত্রশক্তির প্রকৃতি বিরুদ্ধ ছিল। অস্বাভাবিক আবেষ্টন যখনই প্রাকৃতিক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছে, শক্তি সংঘাতে প্রতিকূলতাকে ধ্বংস করিয়া সর্ব্বত্রই শক্তির অনুরূপ বিশিষ্ট আবেষ্টন সে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে, সে প্রতিকূলতা যতই কঠোর হোক না কেন। যুক্তির খাতিরে, সমাজনীতি ও ধর্ম্মের অনৈসর্গিক বিধানে সে বাস্তব জীবনের নিত্য সত্য অস্বীকার করিতে পারিল না। একাধারে যুক্তি-সঙ্গত কাল্পনিক আদর্শবাদের মূল্য যেমন সে স্বীকার করিল, তাহার সহিত চরিত্রের সহজাতবৃত্তির—'প্রবৃত্তির তাড়না', সত্য বলিয়াই সে মানিয়া লইল। আদর্শবাদের গোঁড়ামিতে প্রবৃত্তির তাড়নার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অস্বীকার করা সে অযৌক্তিক ও নির্ব্বুদ্ধিতা মনে করিল। 'মানুষের প্রবৃত্তি জিনিষটা যুক্তি নয় বলিয়াই আছে।......এত বড় আকর্ষণ কোন মতেই অমন হেয়, অমন ছোট হতে পারে না। এ সত্য। সূর্য্যের আলোর মত সত্য, ব্রহ্মাণ্ডের আকর্ষণের মত সত্য। কোন প্রেমই কোনদিন ঘৃণার বস্তু হইতে পারে না।' কিন্তু তাই বলিয়া, 'ইচ্ছা করিলেই মানুষ যাহা খুসী তাই করিতে পারে না', ইচ্ছার সঙ্গে চেষ্টা চাই এবং সেই চেষ্টার ফলাফল মানুষের ক্ষমতা কিংবা অক্ষতার উপর নির্ভর করে। অক্ষমের মনোবাঞ্ছা ঐ পঙ্গুর পর্ব্বত লঙ্ঘনের মত কখনও কার্য্যে পরিণত হয় না। সমাজ বা নীতি বিধান-সকল যে ব্যক্তিকে অন্যের অধিকারে হাত দিতে বাধা দেয়, তাহা শুধু সর্ব্বসাধারণের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য। স্বেচ্ছাচারে পরের স্বাধীনতা হরণ করিতে গেলে সেই অন্যেরও স্বেচ্ছাচারীর অধিকারে হাত দেওয়ার ক্ষমতা স্বীকার করিয়া লইতে হয়। ফলে বিশ্বমানবতায়

একটা অবিরত সংগ্রাম ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। কথা সত্য। কিন্তু তেমনই মানব প্রকৃতিরও স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। সমাজ ও নীতির বিধানগুলি যদি প্রাকৃতিক নিয়মের উপর অনৈসর্গিক হুকুম চালায়, ফলে বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। অতএব চরিত্র-বৃত্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া যে সমাজ নীতির বিধান করা হয় তাহার ফলে শৃঙ্খলা ও মঙ্গলাদর্শের পরিবর্ত্তে বিশৃঙ্খলা এবং বিরোধের উদ্ভব হইয়া থাকে। এই বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা প্রাকৃতিক নিয়মের অবশ্যম্ভাবী ফল। সমাজকে, সর্ব্বজনসাধারণকে চির উন্নতিশীল মঙ্গলাদর্শে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইলে বিধানগুলির আনুকূল্যে চরিত্রবৃত্তিগুলিকে সর্ব্বমঙ্গলাদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। যে সমাজের নীতিবিধান যত এইরূপে অনুপ্রেরক ও সম্প্রসারক হইয়াছে, সেই সমাজ ততই জাতির কল্যাণপ্রদ হইয়াছে। সর্ব্বজনসাধারণের কল্যাণ আদর্শে জীব-কল্যাণের কথা ভুলিয়া যাওয়া তাই চলে না। কেন না, ব্যক্তির সমষ্টিই সমাজের রূপ লইয়া ওঠে। ব্যক্তির মনঃ সংঘাতে যে বিশিষ্ট মন সৃষ্ট হয় তাহাই সমাজ-মন। কিন্তু সেই সমাজ-মনের অধিগত ব্যক্তিমনেরও নিজ স্বাতন্ত্র্য থাকে। সমাজ যখন উদ্ধত হইয়া এই ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যে, স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, শাসন চালাইতে যায়, তখনই বিরোধ ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ব্যক্তির প্রাকৃতিক বৃত্তিগুলিকে আনুকূল্যে সর্ব্ব কল্যাণে অনুপ্রেরিত ও নিয়ন্ত্রিত করাই তাই সামাজিক আদর্শ। এই আদর্শের অনুপ্রেরণায় ব্যক্তি ও সমাজ যুগধর্ম্মে চিরপ্রগতিশীল হইয়া ওঠে। 'সব কাজে বুদ্ধি খাটাতে গেলেও যেমন সমাজ থাকে না, সমাজও যদি সব সময়ে, সব কাজে নিজের মতটাই চালাতে যায় তাতেও মানুষ টেঁকে না।......উভয়েরই সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে—সে সীমা মূঢ়তার

হোক, প্রবৃত্তির ঝোঁকে হোক, অন্যায় জিদের বশে হোক—যে ভাবেই হোক লঙ্ঘন করলেই অমঙ্গল। সে অমঙ্গলকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে এমন ক্ষমতা ভগবানেরও নেই।' চির মঙ্গলময়ের সৃষ্টি এই বিশ্বমানবও চির উন্নতিশীল ও চির উত্তম সত্ত্বায় আপনাকে উন্নীত দেখিতে পায়। এই নিয়মেরই বশবর্ত্তী হইয়া ব্যক্তি ও সমাজের বিধানগুলি তাই চির মঙ্গলাদর্শে গতিশীল হইয়া থাকে। 'যে নিয়মে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সরে সেই নিয়মে এও আপনি সরে।' ইহাই হইল সমাজ ও ব্যক্তি সম্বন্ধে মূল কথা। কিরণময়ীর চরিত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, তাহার অন্তর্নিহিত দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সর্ব্বত্রই স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া গিয়াছে। যেখানেই সামাজিক অনুশাসন এই স্বাতন্ত্র্যে হস্তক্ষেপ করিতে গিয়াছে, ব্যক্তিত্ব অনুশাসনকে উপেক্ষা করিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। দ্বন্দ্বে সর্ব্বত্রই চরিত্রের ব্যক্তি ধর্ম্ম আবেষ্টনকে অগ্রাহ্য করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। এখন দেখিতে হইবে, এই ঔদ্ধত্য কাহার? কিরণময়ীই স্বেচ্ছাচারে, প্রবৃত্তির তাড়নায়, অন্যায়রূপে সমাজবিধান লঙ্ঘন করিয়াছে, কিম্বা অন্ধতায় ও ঔদ্ধত্যে সমাজ তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে, ব্যক্তিত্বের বিকাশে, অন্যায় বাধা সৃষ্টি করিয়াছে।

কি অনুদার, নিরানন্দ মাতুল গৃহে কিরণময়ী বাড়িয়া উঠিয়া বাল্যে, বধূবেশে, শুষ্ক ও নীরস স্বামীর অন্ধকার বাসগৃহে আসিয়া উঠিল, আমরা তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। স্বামী তাহাকে ছাত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন,—বধূভাবে নয়। স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণমনা শাশুড়ী তীব্র নির্য্যাতনে কি প্রকারে তাহার আন্তর মানবী, রমণীকে দিন দিন পিশাচী করিয়া তুলিতেছিলেন তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। বধূর দেহ-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে সংসারের ব্যয়ভার বহন করিতে অঘোরমণির আপত্তি ছিল না,

বরং গোপন ইঙ্গিতেরও অভাব ছিল না। যৌবন উচ্ছ্বাস যখন দেহের কূল উপকূলে, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যে তরঙ্গায়িত হইতেছিল, 'তখন সে স্বামীর সহিত সূক্ষ্ম বিচারে ব্যস্ত রহিল।' সে বিচারে আবার ইহকালের সুখ যে মানব জীবনের চরম লক্ষ্য তাহাই প্রতিপন্ন করিবার প্রয়াস! সমাজ, কিরণময়ীকে এই নীরস দারু বিগ্রহটিকে তাহার জীবন-সঙ্গী করিয়া দিল। পরিহাসটি বড়ই করুণ। ইহার স্বাভাবিক পরিণতি যাহা হইতে পারে তাহাই হইল, সামাজিক বন্ধন ভেদ করিয়া কিরণময়ীর ব্যক্তিত্ব, যৌবন ধর্ম্ম কূল ভাঙ্গিয়া পঙ্কিলতায় ক্লিন্ন হইয়া উঠিল। সমাজ কিরণময়ীর ব্যক্তিত্বের সহজ বিকাশে যে অস্বাভাবিক বাধার সৃষ্টি করিয়াছিল, স্বাধিকার-স্বাতন্ত্র্যে, সে বাধা টিকিল না; অস্বাভাবিকতায় আপনি খসিয়া গেল।

অনুদার, সঙ্কীর্ণ ও অস্বাভাবিক আবেষ্টনে বিকৃত গতি এই চরিত্র উদার সমবেদনাত্মক শক্তিমানের সাহচর্য্যে আবার যে কি অফুরন্ত মাধুর্য্যে ও সৌন্দর্য্যে, গভীর স্নেহ ও প্রেমসম্পদে, নারীত্বের মহিমান্বিত দেবীমূর্ত্তিতে রূপায়িত হইতে পারে, সতীশ, উপেন্দ্র ও সুরবালার সংসর্গে কিরণময়ীকে আনিয়া লেখক তাহাই দেখাইলেন। উপেন্দ্রের সমুন্নত চরিত্রের আকর্ষণে অস্থির ও বিকৃত গতি কিরণময়ীর নারীত্ব আত্মস্থ হইল। 'শ্রীরামচন্দ্রের পাদস্পর্শে পাষাণ অহল্যা যেমন মানুষ অহল্যা হ'য়েছিলেন' তেমনি উপেন্দ্রের চরিত্র-আদর্শে কিরণময়ীর আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। নারীত্বের এই নব জাগরণে কিরণময়ী দেখিতে পাইল যে একনিষ্ঠ, অবিচলিত ও শান্ত গভীর প্রেমই নারীত্বের একমাত্র অমূল্য সম্পদ। সুরবালার আন্তরিক একনিষ্ঠা, নির্ভরশীলতা ও স্বভাব তারল্যে, একান্তে স্বামীতে নির্ভরশীলতার

দৃষ্টান্ত কিরণময়ীর জাগ্রত নারীত্বে অভিনব জ্ঞান ও সত্যের সন্ধান আনিয়া দিল। কি অগাধ প্রেমসম্পদে যে নারী, আত্মিক প্রেমের গভীরতায়, মহান্ আদর্শ ও শক্তিমান চরিত্র উপেন্দ্রের মত স্বামী নিজ সৌভাগ্যে লাভ করে, সুরবালার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে কিরণময়ী তাহা বুঝিতে পারিল। উপেন্দ্র ও সুরবালার আদর্শে নব জাগ্রত নারীত্বকে সৌন্দর্য্য ও শক্তিতে গড়িয়া তুলিয়া জীবনে সার্থকতা লাভের আপ্রাণ চেষ্টা তাই আমরা কিরণময়ীর মুমূর্ষু স্বামীর সেবায় দেখিতে পাই; এবং সেবার আন্তরিকতা ও শক্তিতে বিস্মিত হই। অন্তর সত্য সবিশেষে উপেন্দ্রের নিকট প্রকাশ করিয়া প্রত্যাশিত ঘৃণার পরিবর্ত্তে, কিরণময়ী যখন অপ্রত্যাশিত বিশ্বাসের অধিকারী হইল, তখন, সেই বিশ্বাসের মাঝে স্নেহের ইঙ্গিত পাইয়া যেন কিরণময়ীর জাগ্রত নারীত্বে নব জীবন উৎসরিত হইল। আনন্দ-উচ্ছ্বাস তরঙ্গায়িত জীবনপ্রবাহে সে এক অভিনব সুন্দর মূর্ত্তি ধারণ করিল। দেবতার অনুরাগ স্পর্শে নারীত্বে যে জাগরণ আসে, জাগ্রত সেই নারী নিঃশেষে ঐ জীবনদেবতার পায়ে একান্তে আত্মনিবেদন করে। এই আত্মদান আর সে ফিরাইয়া লইতে পারে না। জীবন-যাত্রায় একবার অন্তর দেবতার সন্ধান পাইলে স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক কোনও প্রতিকূলতা নারীকে আর তাহার জীবনধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। নারীধর্ম্মের স্বরূপ উপলব্ধিতে তাই আমরা শুনিতে পাই যে, চন্দ্রমুখী দেবদাসকে বলিতেছে, "তুমি যে কি আকর্ষণ, যে কখনও তোমাকে ভালবেসেছে সেই জানে। এই স্বর্গ থেকে সাধ ক'রে ফিরে যাবে এমন মেয়েমানুষ কি পৃথিবীতে আছে।" নারীধর্ম্মের এই নিত্যসত্যের পুনরাবৃত্তি উপেন্দ্রের মুখেও আমরা শুনিতে পাই। "সে (সুরবালা)

বলে আমাকে (উপেন্দ্রকে) যে একবার ভালবেসেছে তার সাধ্য নেই যে আর কাউকে ভালবাসে।” কিরণময়ীও স্বীকার করিল কথাটি নিতান্ত সত্য। উপেন্দ্রের অনুরাগ স্পর্শে আকৃষ্টা কিরণময়ীও তাই একনিষ্ঠায় ও নির্ব্বিশেষে উপেন্দ্রকে আত্মনিবেদন করিল। উপেন্দ্রের বিশ্বাস অর্জ্জন করিয়া তাই গর্ব্বে কিরণময়ীর নারীত্ব নৃত্য ছন্দে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য লইয়া আত্মপ্রকাশ করিল। দিবাকর-প্রসঙ্গে আমরা তাহার এই জীবনগতিরই বিকাশ দেখিতে পাই।

পূর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে, কিরণময়ী চরিত্রে লেখক নারীত্বের এক অভিনব রূপ ও শক্তি কল্পনা করিয়াছেন। সাধারণের মাপকাঠিতে এই চরিত্রশক্তির পরিমাণ করা যায় না। আন্তরশক্তির প্রাচুর্য্যে ও দুর্ব্বার গতিছন্দে এই অভিনব চরিত্র সর্ব্বত্রই আত্ম অনুরূপ আবেষ্টন সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। প্রতিকূলতায় এই চরিত্র শক্তি শতগুণে পরিবর্দ্ধিত হইয়া সকল বাধা ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইয়াছে। এবং আত্মানুরূপ উদার, প্রশস্ত ও শক্তিমান আবেষ্টনের আশ্রয় পাইলেই স্থির-সৌন্দর্য্যে, মাধুর্য্যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। শক্তির ধারা একই,—অধঃপাতের পঙ্কিল বীভৎসতায় যেমন সে বিশ্বপ্রাণে ভীতির সঞ্চার করিতে পারে, আবার মহত্ত্ব, ঔদার্য্য ও মঙ্গলাদর্শেও জগতের প্রাণে বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতে পারে। একই অন্তর্নিহিত শক্তি, আবেষ্টনের আনুকূল্য ও প্রতিকূলতায়, শক্তি ও দৌর্ব্বল্যে একই গভীরতায় স্বরূপ-সৌন্দর্য্যে ও বিকৃত রূপের কদর্য্যতায়, ভিন্ন ধর্ম্মে বিকশিত হয়। চরিত্র-শক্তির এই বিশিষ্ট ধর্ম্ম প্রতিভাবান্ শিল্পী শরৎচন্দ্রের অন্তর্দৃষ্টিতে প্রতিভাত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, “ইঞ্জিনের যে জিনিষটা তাকে সমুখে ঠেলে, সেই জিনিষটাই তাকে পিছনে ঠেল্‌তে পারে,

অপরে পারে না।” কিরণময়ীর যে চরিত্রশক্তি অধঃপাতে তাহাকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল, শক্তির সেই অনিরুদ্ধ ক্ষমতাই আবার তাহাকে উপেন্দ্রের প্রতি প্রেমে ও আকর্ষণে মহিমান্বিত করিয়া তুলিল।

অপরাজেয় অন্তঃশক্তি কিরণময়ীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। পরিচয়ের প্রথম হইতেই শক্তির এই রূপ আমরা কিরণময়ীর চরিত্রে দেখিয়া আসিতেছি। উপেন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া তাহার চরিত্র শক্তির আকর্ষণে, কিরণময়ীর নারীত্বের প্রথম জাগরণ আসিল। নব জাগরণে কিরণময়ী প্রথম অনুভব করিল, ‘ভালবাসার সাধ (তাহার) কত বেশি।’ পঙ্কিলতামুক্ত নব জীবনে সে এক অভিনব তৃপ্তির ও আশ্চর্য্য আনন্দের আস্বাদ পাইল। প্রথম দর্শনের ক্ষণ হইতেই এক দুর্ব্বার আকর্ষণ শক্তিতে উপেন্দ্র তাহার সমস্ত অন্তর অধিকার করিয়া বসিল। তাহার অপরাজেয় অন্তঃশক্তি স্বাভাবিক ধারায় উপেন্দ্রকে জয় করিতে মত্ত হইয়া উঠিল। সে বুঝিল যতই অসম্ভব হোক না কেন শত বাধা সত্ত্বেও জয় তাহাকে করিতেই হইবে,—উপেন্দ্রকে জীবনে লাভ তাহাকে করিতেই হইবে। অনন্যোপায়ে তাই একলব্যের তপস্যায় জীবন দেবতার শিষ্যত্ব লাভ করিতে কিরণময়ী বদ্ধপরিকর হইল। আবেষ্টনকে মানিয়া লইয়া, জীবনে উপেন্দ্রকে পাইবার আশা ত্যাগ সে কখনই করিতে পারিল না। আন্তর-সত্য নিঃশেষে নিবেদন করিয়া তৃপ্তির এক অভিনব আস্বাদে সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “তোমাকে (উপেন্দ্রকে) যে ভালবাসি তা’ জানিয়ে আমি বাঁচলুম।............ না জানালে পাগল হ’য়ে যেতুম।” কল্পনার মোহে, কাল্পনিক আদর্শের নির্দ্দেশে বাস্তবকে অস্বীকার করা, জীবন প্রবাহকে কল্পনার দাসত্বে নিয়োজিত করা কিরণময়ীর সহজ চরিত্রের বিরোধী ছিল। উপেন্দ্রের

উপদেশে সতীশের মঙ্গল কামনায় কাল্পনিক আদর্শকে জীবনে একমাত্র অবলম্বন করিতে সাবিত্রী পারিয়াছিল কিন্তু এই ত্যাগে সর্ব্বহারা হইয়া তাহার জীবনপ্রবাহ শুকাইয়া গিয়াছিল। নারীত্বের রূপ, এমন কি ছায়াও আর তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। যেন শক্তিহীনতায় মরিবে বলিয়াই মৃত্যুটা সাবিত্রী তাহার নারীত্বে বরণ করিয়া লইল। কিন্তু কিরণময়ীর চিরবিজয়ধর্ম্মী নারীশক্তি জীবনে মৃত্যুর ছায়া পর্য্যন্ত পড়িতে দিল না। সে বুঝিল, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অনুভব করিল যে, একমাত্র উপেন্দ্রই তাহার জীবন-দেবতা। তাই তাহাকে প্রাপ্তির আশায়, আপ্রাণ উদ্যমে সে আজীবন সচেষ্ট হইয়া রহিল। কিরণময়ী বুঝিল যে, প্রাকৃতিক নিয়মকে অগ্রাহ্য করিয়া শুধু মাত্র কাল্পনিক আদর্শের মোহে ঐ আদর্শকে জীবনে অবলম্বন করিয়া "কেউ কখনো (জীবনের) চির মধুর সম্বন্ধে পৌছুতে পারে না। মাধুর্য্য দেবার শক্তি আছে শুধু ঐ প্রকৃতির হাতে।" জীবন সত্যের এই স্বরূপ উপেন্দ্রও অস্বীকার করিতে পারিল না,—হয়ত যুক্তিতে সত্যের স্বরূপ অস্বীকার করিতে পারা যায় না বলিয়াই।

উপেন্দ্রের হৃদয়-বিজয়ের প্রথম অভিযানে কিরণময়ী দিবাকরকে অবলম্বন রূপে গ্রহণ করিল। জীবন-দেবতার স্নেহ পাত্রটিকে আপন স্নেহে উৎসারিত করিয়া সেই দেবতার স্নেহের পূর্ণ অধিকারী হইবার ইহা একটি রহস্যপূর্ণ প্রচেষ্টা। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার ভালবাসার পাত্রটিকে যত্ন করিয়া যেন তাহারই অবলম্বনে প্রেমাস্পদে পৌছিবার অজ্ঞাত প্রয়াস। দিবাকরের প্রতি আন্তরিক, নিঃসঙ্কোচ, সস্নেহ ব্যবহারে আমরা তাই কিরণময়ীর সহজ নারীত্বের স্বাভাবিক লীলায়িত উচ্ছ্বাস দেখিতে পাই। কিন্তু অসাধারণ এই নারী চরিত্রের

অন্তর্গূঢ় ভাবধারাটি শান্ত, ধীর ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি উপেন্দ্রেরও চিন্তাশক্তির সীমা এড়াইয়া গেল। তিনি বিচারে ভুল করিয়া বসিলেন। বাড়ীর ঝি মোক্ষদা, শাশুড়ী অঘোরময়ী, এমন কি অপরিণত বুদ্ধি দুর্ব্বল চরিত্র দিবাকরের মত উপেন্দ্রও কিরণময়ীকে ভুল বুঝিলেন। মনে করিলেন, বুঝি বা প্রবৃত্তির তাড়নায় হতভাগ্য এই নারী তাঁহার বিশ্বাসের অপব্যবহার করিয়া দিবাকরের সর্ব্বনাশ করিতে চায়। সতীশের ঘরে আকস্মিক উপস্থিতির পর অপ্রত্যাশিত ভাবে তথায় সাবিত্রীকে দেখিয়া যেমন ক্রোধে, ঘৃণায় হতবুদ্ধি হইয়া উপেন্দ্র তাহার জীবনপ্রিয় সোদরোপম সতীশকে ত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন, আজ আবার সন্দিহান হইয়া ক্রোধ উদ্দীপনায় হতবুদ্ধির মত উপেন্দ্র হঠাৎ অনুরূপ ভুল করিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আপনার ছোঁয়া খাবার খেতে আজ আমার ঘৃণা বোধ হচ্ছে।......ভাল আপনি কাউকে বাসতে পারবেন না, সে সাধ্য আপনার নেই, শুধু সর্ব্বনাশ করতেই পারবেন। ছি ছি শেষকালে কিনা দিবাটাকে—।"..."আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ঠাকুরপো, সমস্ত মিথ্যা, ছি ছি।" কিরণময়ীর এই কাতরোক্তিতে, "নাস্তিক, অপবিত্র ভাইপার" বলিয়া উপেন্দ্র অসম্ভব ঘৃণায় কিরণময়ীকে পায়ে ঠেলিয়া চলিয়া গেলেন। উপেন্দ্রের স্ফটিক-স্বচ্ছ উন্নত চরিত্র নিষ্ঠুর শুভ্রতামণ্ডিত ছিল। পবিত্রতার কাঠিন্য যেন এই চরিত্রকে অনেকখানি হৃদয়হীন করিয়া তুলিয়াছিল। মনে হয় তাহার শুষ্ক পবিত্রতা যেন পঙ্কিলতার ছায়াটি পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারে না; ক্ষমার স্থান তাহাতে নাই। আশৈশব যে সতীশকে উপেন্দ্র অগ্রজের ন্যায় স্নেহ করিয়া আসিয়াছেন এবং যে উপেন্দ্রের চরিত্র আদর্শে মুগ্ধ সতীশ দেবতার মত তাঁহাকে ভক্তি করিত, সতীশের

সহিত সস্ত্রীক তাহার বাসায় উঠিতে গিয়া সহসা উপেন্দ্র তথায় সাবিত্রীকে দেখিলেন। অপরিচিত সাবিত্রীকে নির্ব্বিচারে তিনি অপবিত্র ও অস্পৃশ্যা মনে করিয়া লইলেন। ক্রোধে ও বিতৃষ্ণায় স্ত্রী সুরবালাকে গাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার আদেশ দিয়া, 'আমিও চললুম' বলিয়া সতীশের গৃহ ত্যাগ করিলেন। ধীর বিচারে ও পরবর্ত্তী ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে এই সাবিত্রীকেই তিনি ভগ্নীর স্থান দিয়াছিলেন এবং বিশ্বাস ও শ্রদ্ধায় জীবনের শ্রেষ্ঠ ভার, তাহার হাতে সমর্পণ করিয়া স্বস্তির শেষ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। যে চরিত্রের প্রথম সংস্পর্শে তিনি ঘৃণায় বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, মৃত্যুর পূর্ব্বক্ষণে সেবাব্রতে জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধ পূর্ণ করিবার আশা সেই চরিত্রশক্তিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। দিবাকর ও সতীশকে বলিলেন, "তোরা দুটোতে আমার এই কথাটি মনে রাখিস ভাই, আমি চললুম বটে, কিন্তু আমার এই বোনটির (সাবিত্রীর) মধ্যে আমি চিরদিন বেঁচে থাকব।' আপাত অন্ধ দৃষ্টিতে ও অবিচারে সাবিত্রীর সম্বন্ধে তিনি যে ভুল ধারণা করিয়াছিলেন, উত্তরকালে নির্ভর বিশ্বাসে তাহারই কোলে মাথা রাখিয়া শেষ নিঃশ্বাসে, মৃত্যুর রক্ত-ঝলকে সেই ভুল এইরূপে শ্রদ্ধায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিল। ভুলের সংশোধন হইল। কিন্তু জীবনে আমরা অনেক সময় এমন ভুল-ভ্রান্তি করিয়া বসি, বিচার বুদ্ধির হঠকারিতায় পবিত্রতার গোঁড়ামীতে এমন অন্যায় করিয়া বসি যে, সে ভুল আর সংশোধন করিবার সুযোগ পাই না। সাবিত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে উপেন্দ্র যে ভুল ধারণা করিয়াছিলেন, চরিত্রের ধীর, মন্থর ও শান্ত গতিতে নিকট পরিচয়ের সুযোগ পাইয়া তাঁহার সেই ভুল ধারণা দূর হইয়াছিল, কিন্তু কিরণময়ীর চরিত্র শক্তির ক্ষিপ্র প্রখর গতিতে উপেন্দ্র,' দিবাকর-প্রসঙ্গে তাহার সম্বন্ধে যে ভুল

ধারণা করিয়াছিলেন তাহা সংশোধনের সুযোগ আর জীবনে পাইলেন না। ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে কিরণময়ীর আন্তর সত্য উপলব্ধি করিবার অবকাশ আর তাঁহার আসিল না। সে জ্ঞান লাভ করিয়াছিল সতীশ; তাই স্নেহে ও ভক্তিতে সতীশ কিরণময়ীর প্রতি সশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কল্পিত বিশ্বাসহীনতায় উপেন্দ্র কিরণময়ীর প্রতি ঘৃণায় বীতশ্রদ্ধ হইয়াই রহিলেন; তাহার চরিত্রধারা ক্ষমা ও করুণায় সঞ্চারিত হইতে না পারিয়া তাই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

উপেন্দ্রের বিশ্বাস ও স্নেহামৃতের স্পর্শ পাইয়া কিরণময়ীর অফুরন্ত দুর্ব্বার চরিত্র শক্তি আত্মস্থ ও শান্ত হইয়া উঠিতেছিল। নব জাগরণে আত্মস্বরূপের সম্মোহন রূপ তাহাকে অভিনব মাধুর্য্যমণ্ডিত করিয়া তুলিতেছিল। অফুরন্ত আশা আকাঙ্ক্ষায় সার্থকতার এক অজ্ঞাত উন্মাদনায় নারীত্বের উচ্ছ্বসিত মূর্ত্তিতে তাহার জীবনধর্ম্ম ফুটিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু উপেন্দ্র ভুল করিয়া বসিলেন। দিবাকর-প্রসঙ্গে ভ্রান্ত ধারণায় ঘৃণায় উন্মত্তের মত তিনি পদানত কিরণময়ীকে 'নাস্তিক, অপবিত্র, ভাইপার' বলিয়া ক্রোধে ঠেলিয়া ফেলিয়া বাহির হইয়া গেলেন। বিশ্বাসে স্নেহরস স্পর্শে যে আবেগময়ী চরিত্রশক্তি নির্ব্বিশেষে তাঁহাকে আত্মদান করিয়া, নিশ্চিন্তে জীবন সুবিকশিত করিতে চাহিয়াছিল ঘৃণা ও অবিশ্বাসের বিষাক্ত স্পর্শে সহসা সে চরিত্রশক্তি আবার উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। সৃষ্টি ও পালনের, সেবা ও প্রেমের স্নিগ্ধ গভীরতায় বিকচোন্মুখ নারী সহসা বিষাক্ত নিঃশ্বাসে সর্ব্বধর্ম্ম হারা হইয়া প্রলয় তাণ্ডবে প্রতিহিংসার সর্ব্বধ্বংসী মূর্ত্তিতে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। নারীর অন্তঃশক্তি, ভালবাসায় বিশ্বাসে ও নির্ভর আশ্রয়ের শক্তিতে যেমন বিশ্ব বিমোহিনী হইয়া ওঠে তেমনিই আবার উপেক্ষায়, ঘৃণায় বিষাইয়া

উঠিয়া শত ফণিণীর ক্রুদ্ধ শ্বাসে বিশ্বের বক্ষে যে কি প্রলয়ের ঝড় তুলিতে পারে, শরৎচন্দ্রের অপূর্ব্ব তুলিকায় কিরণময়ী চরিত্র বিকাশে তাহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। স্বাভাবিক তুলিকাক্ষেপে লেখকের-চরিত্র-শিল্প তাই এত চিত্তাকর্ষক হইয়াছে। শক্তিমান আদর্শ চরিত্রের একটি দুর্ব্বল সূত্র অবলম্বন করিয়া লেখক আখ্যায়িকায় প্রলয়ের সৃষ্টি করিলেন।* আবার শরৎচন্দ্র উপেন্দ্রের মর্ম্মর-নির্ম্মম স্বচ্ছ চরিত্রে ক্ষমার উৎস সৃষ্টি করিয়া চরিত্রটি মানব ধর্ম্মে সম্প্রসারক করিলেন।

আঘাতের প্রথম তীব্রতায় কিরণময়ী সর্ব্বনাশীর দুর্ব্বার শক্তিতে দেবতার বিশ্বাসের দান দুর্ব্বল চরিত্র, দিবাকরকে ছিনাইয়া লইয়া কুলটার বেশে গৃহত্যাগ করিল। সর্ব্বনাশী নারীশক্তির সকল অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া কিরণময়ী উপেন্দ্রের উন্নত শির অপমানে ভূলুণ্ঠিত করিবার প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল। ভোরের অন্ধকারে যন্ত্রচালিতের মত দিবাকর কিরণময়ীর সহিত আরাকান যাত্রা করিল। 'কাঁচপোকা যেমন করিয়া তেলাপোকাকে টানিয়া আনে, ঠিক তেমনই করিয়া কোন এক দুর্ণিবার যাদুমন্ত্রে কিরণময়ী অর্দ্ধসচেতন বিভ্রান্তচিত্ত হতভাগ্য দিবাকরকে জাহাজ-ঘাটে টানিয়া আনিয়া উপস্থিত করিল।' নারীর প্রতিহিংসা মূর্ত্তির এমন সুনিপুণ অঙ্কন, এমন নিখুঁত ছবি বিশ্ব-সাহিত্যেও অতি বিরল। উপেক্ষিতা নারীর প্রতিহিংসা বৃত্তির প্রতি স্তর উন্মোচনে লেখক চরিত্রশক্তির এবং স্বীয় প্রতিভার গভীরতার পরিচয় দিয়াছেন। জীবন দেবতায় নারীর প্রেম যত গভীর হয়, উপেক্ষায়

Aristotle's rule for tragedy.

Sir Arthur Quiller-Couch—Shakespeare's Workmanship.

ও ঘৃণায় তাহার প্রতিহিংসাবৃত্তিও তদনুরূপ অসীম শক্তির পরিচয় দিয়া থাকে। দিবাকর-প্রসঙ্গের শেষাংশে রক্ষিতার বেশে পরিহাসের মর্ম্মান্তিক তীব্রতায় কিরণময়ীর এই প্রতিহিংসাবৃত্তি আরও জ্বালাময়ী হইয়া দেখা দিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কিরণময়ীর প্রতিহিংসা তাহার অন্তর গভীর প্রেমধর্ম্মের বিকৃত রূপ। শ্রদ্ধায়, নির্ভরতায় সার্থকতার অনুপ্রেরক ইঙ্গিতে সে একান্তে বুঝিয়াছিল, তাহার উপেন্দ্রকে ভাল-বাসিতেই হইবে। তাহার নারীত্বের অন্তরতম আসনে উপেন্দ্রের একাধিপত্য চির অবিচলিত ছিল। অন্তরদেবতার প্রেমস্পর্শে সে যেমন সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যে বিকচোন্মুখ পুষ্পের মত হইয়া উঠিয়াছিল, আবার সেই দেবতারই ঘৃণা ও উপেক্ষায় সে শত ফণিনীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে শ্বসিয়া উঠিল। নারী নির্ভরশীলা, জীবনে সে যে-শক্তিকে একবার আশ্রয় করে, সেই আশ্রয়-শক্তির প্রাকৃতিক ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইয়া সে তদনুরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

অসাধারণ আন্তরশক্তিসম্পন্ন কিরণময়ী সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং লৌকিক, কাহারও শাসনের ঔদ্ধত্য কখনও নীরবে সহ্য করে নাই। শাস্ত্রবাক্য সে বিচার বুদ্ধিতে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিত, প্রাণহীন সামাজিক অনুশাসনকে দুর্ব্বলের বিক্রম ও বৃথা আস্ফালন বলিয়া মনে করিত। চরিত্র দৌর্ব্বল্যকে সে করুণায় উপহাস করিত এবং শক্তিমানের স্পর্দ্ধাকেও দ্বিগুণ শক্তিতে গুঁড়াইয়া ফেলিতে তিলমাত্র ভীত হইত না। সমুন্নত চরিত্র উপেন্দ্রের স্নেহের নির্দ্দেশ আপ্রাণ শক্তিতে পরিপালনে সে ভক্তের আনুগত্যে উপেন্দ্রকে অন্তর দেবতারূপে বরণ করিয়া লইয়াছিল। উপেন্দ্রের একটু তুষ্টি, তৃপ্তি ও স্নেহের অধিকার পাইতে নিঃশেষে জীবন বিলাইয়া দেওয়াও কিরণময়ী পরম

সার্থকতা মনে করিত। তাহার এই একমাত্র জীবন দেবতারও স্পর্দ্ধা ও ঔদ্ধত্য কিন্তু সে সহ্য করিতে পারিল না। অমূলক সন্দেহে, যখন উপেন্দ্র 'কিরণময়ীর ছোঁয়া খাবার খাইতেও ঘৃণা বোধ হয়' বলিলেন, প্রত্যুত্তরে তীব্র ঝঙ্কারে কিরণময়ীও শুনাইয়া দিল, "যে অমনি ক'রে ঘৃণায় থালাটা সরিয়ে দিতে পারতো সে সতীশ, তুমি নও, ঠাকুরপো।... সেদিন যখন নিজের মুখে তোমায় ভালবাসা জানিয়েছিলুম, তখন ত আমার দেওয়া খাবারের থালাটা এমনি করে ঘৃণায় সরিয়ে রাখনি। নিজের বেলায় বুঝি পরস্ত্রীর হাতের মিষ্টান্নে ভালবাসার মধু বেশি মিঠে লাগে ঠাকুরপো?" দাম্ভিকের উদ্ধত্যের প্রতি এই তীব্র কষাঘাত কিরণময়ীর অন্তঃশক্তির প্রখরতা দেখাইয়া দিল। আবার উপেন্দ্রের অহেতুক সন্দেহ দূর করিবার জন্য কিরণময়ী জানাইল, "যে, একবার (উপেন্দ্রকে) ভালবেসেছে, তার সাধ্য নেই, আর কাউকে ভালবাসে।... আমার বুক ফেটে যাচ্ছে ঠাকুরপো, সমস্ত মিথ্যা,...ছি ছি, তোমার আসনে কি না দিবা—!" সর্ব্বহারার এই করুণ ক্রন্দনে, আপ্রাণ চেষ্টায়ও দেবতার দয়ার আশ্রয়টুকু যখন খসিয়া গেল, অসহ্য ঘৃণায় উপেন্দ্র তাহাকে "নাস্তিক, অপবিত্র, ভাইপার" বলিয়া পা ছিনাইয়া লইয়া চলিয়া গেলেন, ঘৃণার তীব্রতায়, উপেক্ষার আঘাতে কিরণময়ীর 'নিস্পলক দুই চক্ষু ভেদিয়া আগুন ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল।' উপেক্ষা, অপমান ও ঘৃণার অনলে কিরণময়ীর সমস্ত অন্তরশক্তি প্রতিহিংসার প্রলয় মূর্ত্তিতে জ্বলিয়া উঠিল। অপমানিতা ও আহতা নারী কাল সর্পিনীর মত প্রতি নিঃশ্বাসে বিষ উদ্গীরণ করিয়া উপেন্দ্রের দাম্ভিকতা চূর্ণ করিতে বদ্ধ-পরিকর হইল। যেমন একদিন সে প্রবৃত্তির তাড়নায়, পিপাসায় 'পচা নর্দ্দমার কাল জল' পান করিয়াছিল, তেমনি আজ প্রতিহিংসার জ্বালায়

দিবাকরের উপপত্নী সাজিয়া বসিল। নিজের এই রূপ স্মরণ করিয়া কিরণময়ীর 'সমস্ত মুখ যে অদ্ভুত হাসিতে ভরিয়া গিয়াছিল', সে হাসির নিষ্ঠুরতা নির্ব্বোধ দিবাকরের দৃষ্টি এড়াইয়া গেল। "তুমি এখন আমার গুরুজন, স্বামীর মত।...বলিয়া ফেলিয়াই দুরন্ত হাসির বেগ সামলাইবার জন্য মুখে আঁচল গুঁজিয়া দিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া হাসিতে লাগিল।" আন্তর বহ্নি যে কি দুরন্তভাবে কিরণময়ীকে দগ্ধ করিতেছিল, তাহা এই পরিহাস অভিনয়ের অন্তরালে কিরণময়ীর স্বগতোক্তি, 'পোড়া কপাল এ-ও অদৃষ্টে লেখা ছিল', সুস্পষ্টে বুঝাইয়া দেয়। উপপত্নীর নিখুঁত ভূমিকা অভিনয়েও 'যবনিকার অন্তরালে' দিবাকর যেন মাঝে মাঝে কিরণময়ীর অন্তর্নিহিত 'সত্য বস্তুটির অকস্মাৎ দেখা' পাইতে লাগিল। সে বুঝিল, 'কিরণময়ীর সুন্দর দুই চক্ষে বাসনা-দীপ্ত বুভুক্ষু দৃষ্টির মাঝে আর যাই কেন না থাক, তাহার জন্য সেখানে এক বিন্দু ভালবাসা নাই।' কিরণময়ীর 'বিষাক্ত চুম্বন ও নিষ্ঠুর হাসি যে প্রতিহিংসা উদ্গীরণ করিতেছিল তাহার জ্বালা দিবাকরকেও বিষাক্ত করিয়াছিল। বাণবিদ্ধা ব্যাঘ্রীর মত প্রোজ্জ্বল চক্ষে "দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া আস্তে আস্তে বলিল,......'তোমার উপীনদা' মাথা উঁচু ক'রে চলবে—সে হবে না ঠাকুরপো, সব কথা আমার বুঝবে না, বোঝবার প্রয়োজনও নাই,...... কিন্তু অপরাধের ভারে যখন আমার মাথা নুয়ে পড়বে তখন তোমার উপীনদা'র ঘাড় উঁচু ক'রে চলবার মত মাথা কিছুতেই রাখব না—এ তুমি নিশ্চয় ক'রে জেনো।"......বলিয়া সে সুদৃঢ় বলের সহিত দিবাকরকে বুকের উপর টানিয়া লইয়া চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "জাহাজ যদি ডোবে, আমরা যেন এমনি ক'রেই মরি। তীরে ভেসে যাব লোকে দেখবে, ছাপার কাগজে উঠবে, তোমার উপীনদাদারা পড়বে, সে কেমন

হবে ঠাকুরপো ?" লেখকের সুনিপুণ অঙ্কনে অন্তর্নিহিত প্রতিহিংসা বহ্নি যে কি তীব্রতায় কিরণময়ীর নারীত্বের সবটুকুকে ভস্ম করিতেছিল তাহাই প্রতিভাত হইল। দহনের বহ্নিঝলকে, দগ্ধ শবের দুর্গন্ধে ও শ্মশানচারী বুভুক্ষু কুকুরের চীৎকারে লেখক অতি অপূর্ব্ব চিত্রের সৃষ্টি করিয়া প্রতিহিংসার মূর্ত্তি কিরণময়ীর নারীত্বের শেষ পরিণতি দেখাইলেন। ভয়ে আশঙ্কায়, ঘৃণায়, সমবেদনায় পাঠকের মনে এক বিস্ময়কর অননুভূত রসের সৃষ্টি করিলেন। এখন হইতে আমরা কিরণময়ীর যে রূপ দেখিতে পাই, তাহা কিরণময়ীর নারীত্বের রূপ নহে, উহা তাহার ভস্মীভূত নারীত্বে উদ্ভূত প্রেতের রূপ।

যাত্রাপথে, সমুদ্র বক্ষস্থিত তরী উদ্বেল তরঙ্গমালার বক্ষ ভেদ করিয়া চলিয়া থাকে। পথের প্রত্যাশিত বাধা বিঘ্নের ও বিপদ সমূহের সচেতনতায় নাবিকের মনে এক স্বাভাবিক সতর্কতার শক্তির সঞ্চার করিয়া রাখে। এই সতর্ক শক্তির প্রেরণায় সমুদ্রপথের সকল বিপদে ও ঝঞ্ঝাবাত্যায় নাবিক স্থৈর্য্য সহকারে গন্তব্যপথে তরণী চালনা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু বাত্যাহত সমুদ্র বক্ষের বিপদ হইতে দূরে যখন সে নিরাপদ বন্দরে আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন নিরাপদ জ্ঞান নির্ভরে বিপদের নিরাশঙ্কায় অবস্থা পরিবর্ত্তনে তাহার কর্ম্মদক্ষতা ও শক্তি বিশ্রামের শান্তিতে বলহীন হইয়া পড়ে। ইহা স্বাভাবিক নিয়ম। রণাঙ্গনে আমরা সৈন্যের যে তৎপরতা, সাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় পাইয়া থাকি, শান্তির নিরাপদ আশ্রয়ে, আশঙ্কাবিহীনতায় সে শক্তি তাহার জাগ্রত থাকে না। এই কারণে হিংস্র সিংহকেও অতর্কিতে পাশবদ্ধ হইয়া শক্তিহীনতার মূর্ত্তিতে শীকারীর করায়ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। শক্তিমান, ধীর চরিত্র উপেন্দ্রের সুদৃঢ় আশ্রয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়া কিরণময়ীর অন্তঃশক্তি নিশ্চিন্তে

শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। আশ্রয়ের উপর স্থির বিশ্বাসে সে বিশ্রান্ত সিংহীর মত নিঃশঙ্ক শান্তিতে দিবাকরকে লইয়া স্নেহ কৌতুকে দিন কাটাইতেছিল। কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভূমিকম্পের মত উপেন্দ্রের ঘৃণা, অবিশ্বাস, নির্ম্মম ব্যবহার, কিরণময়ীর বিশ্বাসাশ্রয়টুকু সহসা অপসারিত করিল। আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত আঘাতে স্তব্ধ হইয়া ও বেগ সামলাইতে না পারিয়া কিরণময়ী আত্মহারা হইল। তাহার অন্তঃশক্তি ও ধর্ম্ম বিশৃঙ্খল হইয়া তাহাকে উন্মাদ করিয়া তুলিল। অতর্কিত আঘাতে হতশক্তি হইয়া যে আবেষ্টনের মাঝে সে নিজেকে দেখিতে পাইল, এবার শক্তিহীনতায় সে আবেষ্টন তাহাকে প্রভাবান্বিত করিয়া করায়ত্ত করিল। উপেক্ষায়, ঘৃণায় ও নিষ্ঠুর অবিশ্বাসে যে প্রতিহিংসার অনল তাহার অন্তরে জ্বলিয়া উঠিল, তাহা নির্ব্বাপিত করিবার মত শান্তিবারির সন্ধান সে আর পাইল না। তাহার শুষ্ক কঠিন স্বামী নাস্তিকতার যুক্তিতে অলৌকিক শক্তিনির্ভরতায় তাহাকে আস্থাহীন করিয়া তুলিয়াছিলেন এবং ইহকালের সুখই যে মানব জীবনের পরমার্থ তাহা বুঝাইয়াছিলেন। উপেন্দ্র যখন তাহার সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া বসিল, বাস্তবজীবনে তাহার আশ্রয়ানুভূতি লাভ করিবার জন্য কিরণময়ীর সমস্ত নারীত্ব জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিরণময়ী বুঝিল, একমাত্র উপেন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহারও স্থান তাহার জীবনে নাই, হইতে পারে না। সুরবালার 'যে একবার আমাকে (উপেন্দ্রকে) ভালবেসেছে তাহার সাধ্য নাই যে অন্য কাহাকে ভালবাসে' উক্তির যাথার্থ্য কিরণময়ী তাহার প্রতি অনুপরমাণুতে অনুভব করিতে লাগিল। এই জীবন সত্যের সাক্ষাৎ লাভের সার্থকতায় ও উল্লাসে তাহার সমস্ত নারীপ্রাণ একান্তে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহকালের সুখই যাহার চরম আদর্শ,

পরকালের ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত যে মানিতে শেখে নাই, তাহার এই জীবনেই মিলন চাইই; জন্মান্তরে জীবন-দেবতার মিলন স্পর্শের অপেক্ষা সাবিত্রী করিতে পারিত, কিন্তু কুয়াশাচ্ছন্ন জন্মান্তরে বিশ্বাস কিরণময়ীর ছিল না, অপেক্ষা করা তাই তাহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। "এতদিন (উপেন্দ্রের নিকট) চলেও যেতুম,......শুধু যদি একবার জানাতো আমাকে চায় কিং না।" তাই আমরা দেখিতে পাই কিরণময়ীর 'বাসনাদীপ্ত বুভুক্ষু দৃষ্টির মাঝে আর যাই কিছু থাকুক না কেন', অন্য কাহারও প্রতি তাহার বিন্দুমাত্র ভালবাসা ছিল না, থাকাও অসম্ভব। আপ্রাণ শক্তিতে জীবন সার্থক করিয়া তুলিবার, একমাত্র জীবন-দেবতার আশ্রয় লাভ করিবার শেষ প্রয়াসটুকু পর্য্যন্ত যখন ব্যর্থ হইতে চলিল, প্রাপ্তির আর কোন আশাই রহিল না, স্বভাব-তারল্যে নির্ভরের আশায় বঞ্চিত হইয়া নিরাশার গভীর অন্ধকারে কিরণময়ী উন্মাদ হইয়া উঠিল। এই অসীম নিরাশার বক্ষেই কিরণময়ীর উন্মাদ লক্ষণের প্রথম স্থচনা দেখিতে পাওয়া যায়। উপেন্দ্রের সংস্পর্শে আসার পূর্ব্ব জীবনে কিরণময়ীকে অন্তঃশক্তির স্বতঃ বিচ্ছুরিত রূপে, দুর্ম্মদ ভঙ্গীতে দেখা গিয়াছিল। কিন্তু সে শক্তির ধারা ছিল লক্ষ্যহীন। সকল বাধা বিপত্তির আবেষ্টন ভাঙিয়া সে শক্তি অন্তঃস্ফুরিত লীলায় লক্ষ্যবিহীন ভাবে ছুটিতেছিল। কিন্তু উপেন্দ্রের সংস্পর্শে, শক্তিমানের মহত্তর আকর্ষণে, নব জাগরণে কিরণময়ী জীবনের লক্ষ্য প্রথম স্থির দেখিতে পাইয়াছিল। অহর্নিশ উপেন্দ্র তাহার বক্ষ জুড়িয়া রহিল। এতদিনের লক্ষ্যহীন লীলায়িত অন্তঃশক্তি তাই একান্তে দেবতাব প্রাপ্তির জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিল। বুঝিল, প্রাপ্তি ও মিলন ভিন্ন সে জীবনে শান্তি ও সার্থকতা নাই। লক্ষ্যহীনতায় এতদিন যে দুনিবার শক্তি অন্ধস্রোতে

যাহা সম্মুখে পাইতেছিল তাহা অবলম্বন করিয়া অন্তরশক্তি প্রাবল্যে সেগুলিকে দলিত করিয়া আবার স্বতঃপ্রবাহিত হইতেছিল, উপেন্দ্রের সংস্পর্শে আসিয়া সেই জীবনের লক্ষ্যহারা গতিধর্ম্ম চরম লক্ষ্যের সন্ধান পাইয়া আপ্রাণ শক্তিতে সেই একমাত্র লক্ষ্য উপেন্দ্রকে জীবনে আশ্রয় করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। বুঝিল, ঐ আশ্রয় জীবন হইতে খসিয়া গেলে সে জীবনে সার্থকতার ও আত্মতৃপ্তির আর কোন সুযোগই আসিবে না। কারণ সে জীবনে আর কাহারও স্থান কোন মতেই হইতে পারে না।

আজীবন সাধনায় ও কঠোর তপস্যায় জীবনের এই একমাত্র লক্ষ্য প্রাপ্তির আশা, যখন উপেন্দ্রের অবিশ্বাস, উপেক্ষা ও ঘৃণায় দূর হইয়া গেল, সমুদ্র বক্ষে কূলহারা তরীর মত নিরাশার ক্ষুব্ধ আবর্ত্তে কিরণময়ী লক্ষ্যহীন হইয়া উন্মাদ হইল। শক্তিময়ী চরিত্র যখন সারাজীবন সংগ্রামের পর করতলগত বিজয়লাভে অপ্রত্যাশিত রূপে বঞ্চিত হয়, তখন নিরাশার পীড়ন, জীবন-শক্তির অসার্থকতা, অতৃপ্ত বাসনার বিক্ষোভ এবং অন্তঃশক্তি সত্ত্বেও অক্ষমতার তিরস্কার সেই চরিত্র-শক্তিকে বিক্ষুব্ধ ও বিতাড়িত করিয়া উন্মত্ততায় পরিণত করে। ইহা চারিত্রধর্ম্মের স্বাভাবিক নিয়ম। যথার্থ সার্থকতার ইঙ্গিত যতদিন জীবনে না আসিয়াছিল, অন্তঃশক্তির লীলাতরঙ্গে ততদিন কিরণময়ী সে আবেষ্টনকে আত্মশক্তিতে অনুপ্রেরিত করিয়া পরাভূত করিতেছিল। যখন জীবন ধারায় সমুদ্রের বক্ষের মত উদারশক্তি উপেন্দ্রের সাক্ষাৎ মিলিল, জীবন লক্ষ্যের এই প্রথম সন্ধানে সমস্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া সেই লক্ষ্য অবলম্বনে দৃঢ় পণ হইল। কঠোর নিষ্ঠায় লক্ষ্য যখন প্রায়শঃ করতলগত, সহসা আকস্মিক কারণে উপেন্দ্রের উপেক্ষা, ঘৃণা ও

অবিশ্বাসে যেন নিমেষে সেই প্রাপ্ত সন্ধান কোন গাঢ় আঁধারে মিলাইয়া গেল। জয়ের তোরণে সমাগতা বিজয়িনী অকস্মাৎ সেই বিজয় তোরণ ভূমিসাৎ দেখিতে পাইয়া বিক্ষিপ্ত চিত্ত ও উন্মাদ হইয়া গেল।

অতএব আমরা দেখিতে পাই যে, এই শক্তিময়ী কিরণময়ী চরিত্রে উন্মত্ততার বীজ তাহার জীবন নৈরাশ্যে প্রথম উপ্ত হইল। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী চরিত্রে যে সাময়িক অসঙ্গতি দেখা গিয়াছিল তাহা চরিত্রগত দুর্ম্মদ শক্তির লীলায়িত তরঙ্গ উচ্ছ্বাস মাত্র। উন্মাদের প্রথম লক্ষণ, উপেন্দ্রের ভালবাসা লাভের নৈরাশ্যেই প্রথম দেখা গেল। নৈরাশ্যের প্রথম আঘাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রতিহিংসায় কিরণময়ী উন্মত্ত হইয়া উঠিল। দিবাকরের সহিত গৃহত্যাগের ও স্বামী-স্ত্রীর ভূমিকার অন্তরালে বিক্ষিপ্ত ও উচ্ছ্বসিত হাস্য, আত্মগ্লানির উচ্ছ্বাস, মানবধর্ম্মে অবিশ্বাস প্রভৃতি সকলই উন্মাদের লক্ষণ ইঙ্গিত করে। চিরবিজয়ধর্ম্মী কিরণময়ী চরিত্রের স্বাভাবিক ধর্ম্মে পরাজয় স্বীকার করিতে কদাচও পারে না। জীবন-আসনে উপেন্দ্রকে বসাইবার আপ্রাণ প্রচেষ্টা যখন তাহার নিঃসংশয়ে ব্যর্থ হইল, উপেন্দ্রের ঘৃণা ও উপেক্ষায় যখন তাহার সকল আশা নির্ম্মূল হইল, তখন পরাজয়ের বিক্ষোভে কিরণময়ীর জীবন-শক্তিতে স্বতঃই মৃত্যুর ছায়া পড়িল। উন্মাদের এই প্রথম অবস্থায়ও যখনই উপেন্দ্রকে বিশ্বাস করিবার কোন কারণ খুঁজিয়া পাইয়াছে, যখনই উপেন্দ্রের সেই হিমাচলের মত স্থির উন্নত চরিত্রের কথা কেহ কিরণময়ীকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে, উন্মত্ততার নেশা কাটিয়া গিয়া ভক্তিতে ও স্নিগ্ধতায় আবার সে সহজ কিরণময়ী হইয়া উঠিয়াছে। দিবাকরের মুখে 'অপরাধে শাস্তি তিনি কোনদিন দেন নি', ক্ষমায় অপরাধীকে উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন শুনিয়া বিস্ময় ভক্তিতে, 'তুই

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কিরণময়ী তাহার মুখের পানে তাকাইয়া রহিল। তাহার অন্তরের বিপ্লব শুধু তাহার অন্তর্য্যামী জানিলেন।' দিবাকরের সান্নিধ্য, স্বামী-স্ত্রীর ঘৃণিত ভূমিকা, অহর্নিশ যে বিষ উদ্গীরণ করিতেছিল, দিবাকরের মুখে, উপেন্দ্রের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও শ্রদ্ধার কথা শুনিয়া যেন সে বিষের দহন শান্ত হইল, 'দুইটি বিপরীত প্রকৃতি কোন অদৃশ্য আকর্ষণে (উপেন্দ্রের প্রতি সম ভক্তিতে) এমন এক জায়গায় আসিয়া মিলিত হইয়া গেল, যেখানে বিরোধ ছিল না। ·· ···তাহার মুখের উপর (আবার) জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সেই নির্ম্মল স্নেহ, হাস্য, কণ্ঠে ভালবাসার তেমনই অনুযোগ', শক্তির আবির্ভাবে কিরণময়ীকে সহজ দেখাইল। একান্তে নিবেদিতা নারী জীবন-তারল্যে একনিষ্ঠায় অন্তরের সকল শক্তি লইয়া আশ্রয়-শক্তিতে নির্ভর করে। আশ্রয়ের শক্তিহীনতায় সন্দেহে নারীরূপ বিকৃত হইয়া উঠে। আবার যখনই সেই আশ্রয়ের শক্তি অনুভব করে, নারীত্বের সহজ মূর্ত্তিতে, স্বচ্ছন্দে আত্মস্থ হইয়া ওঠে। নারীত্বের ইহা হইল বিশিষ্ট ধর্ম্ম,—আন্তর সত্য।

দিবাকরের সহিত কিরণময়ীর সম্বন্ধটা যে শুধু একটা অভিনয়, উপেন্দ্রের প্রতি প্রতিহিংসা লইবার একটা কৌশল মাত্র, পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আরাকানে জীবনযাত্রায় লেখক তাহা সুস্পষ্টভাবে দেখাইয়াছেন। প্রতিহিংসার প্রথম সঙ্কল্পে কিরণময়ী হাতের কাছে যাহা পাইল তাহাই অবলম্বন করিয়া উপেন্দ্রের মাথা হেঁট করাইতে প্রাণের সকল শক্তি নিয়োজিত করিল। কারণ উপেন্দ্রের সন্দেহ, ঘৃণা ও নির্ম্মম ব্যবহার কিরণময়ীর নারীত্ব শক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। উপেন্দ্রের ব্যবহারে কিরণময়ী এতদিন যে আশঙ্কা করিয়া আসিতেছিল তাহা বদ্ধমূল হইল। সে বুঝিল, উপেন্দ্র নীতি ও ধর্ম্মের আদর্শে এক

প্রাণহীন দেবতা। প্রাণের যে স্নেহ স্পর্শ পাইয়া প্রেমামৃত পানে সে মাতাল হইয়াছিল, যাহার সংস্পর্শে আসিয়া জীবন সার্থকতার প্রথম সুনিশ্চিত নির্দ্দেশ দেখিতে পাইয়াছিল তাহার ঐ অহেতুক নির্ম্মমতা, অনুদারতার পরিচয় পাইয়া সে বিরূপ হইয়া উঠিল। কিন্তু আরাকানের পথে দিবাকরের মুখে আবার উপেন্দ্রের চরিত্রস্বরূপের পরিচয় পাইয়া, উপেন্দ্র ক্ষমাশীল ও স্নেহ-প্রবণ মহাপুরুষ শুনিতে পাইয়া, যেন কিরণময়ী অনেকটা আত্মস্থ হইল। প্রথম হইতেই দিবাকরের সহিত 'এই দেখানো ভালবাসার টানাটানি, ..এই ছদ্মলীলা'য়, ঘৃণার বিভীষিকায় কিরণময়ীর প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। দিবাকরের মুখে আবার উপেন্দ্র-মাহাত্ম্য শুনিয়া, 'কোনদিন তিনি শাস্তি দেন নাই' শুনিয়া, তাঁহার কঠিন প্রাণে ক্ষমার স্থানও আছে জানিতে পারিয়া তাঁহার প্রতি আবাব কিরণময়ীর আস্থা ফিরিয়া আসিল। দিবাকরের সংসর্গে দিন দিন কিরণময়ী শুধু ইহাই অনুভব করিতেছিল যে, উপেন্দ্রের চরিত্র কত মহান, তাহার শক্তি কত দৃঢ় ও আকর্ষণ কি দুর্দ্দমনীয়! 'উপীনদাদা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া যে তাহার (দিবাকরের) পক্ষে কী মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা ইহা অত্যন্ত নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা অবধি কিরণময়ী তাহার নারী-হৃদয়ের নিভৃত অন্তঃস্থলে একটু স্বস্তি পাইতে-ছিল না।' উপেন্দ্রের চরিত্রে শ্রদ্ধাবতী হইয়া তাই তাহার, 'রাজ-সিংহাসনের তলে বসিয়া উভয়ের (কিরণময়ী ও দিবাকরের) সন্ধিপত্র যখন স্বাক্ষরিত হইয়া গেল, তখন ঘুম ভাঙিয়া এই ছেলেটার (দিবাকরের) জন্যই করুণার ব্যথায় কিরণময়ী একদিকে যেমন পীড়িত হইয়া উঠিল, এই অবশ্যম্ভাবী ঘৃণার (স্বামী-স্ত্রীর ছদ্ম ভূমিকার) বিভীষিকা হইতে মুক্তি পাইয়াও সে তেমনি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।' পুনরায় দিবাকরকে

দেবতার গচ্ছিত ধন ছোট দেবরের মত, ভাইয়ের মত, ছেলের মত স্নেহে কিরণময়ী গ্রহণ করিল। তাই শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও ক্রুদ্ধ দিবাকরের প্রহার ও লাথি খাইয়াও তাহাকে ক্ষমা করিয়া বাহিরের ক্রুদ্ধ জনতাকে সে সহজ কণ্ঠে "আমাকে মেরেছে তা' তোমাদের কি ?" বলিয়া বিদায় করিয়া দিল এবং "হাঁড়িতে ভাত রান্না আছে বেড়ে দিই খাও" বলিয়া দিবাকরকে খাইতে অনুরোধ করিল। প্রশ্নের উত্তরে সে দিবাকরকে জানাইল, "যেদিন তোমার উপীনদা' আমার হাতে তোমাকে প্রথম সঁপে দিয়ে যান, সেইদিন থেকেই তোমাকে ছোট ভাইটির মত, নিজের ছেলের মত ভালবেসেছিলুম, তাই ত এই ছ'মাস ধ'রে একঘরে বাস করেও তোমাকে এই দেহটা নষ্ট করতে দিতে পারি নি। তোমার চক্ষের ক্ষুধায়, তোমার মুখের প্রেম নিবেদনে আমার সমস্ত দেহ ঘৃণায়, লজ্জায় এমন করে শিউরে ওঠে ঠাকুরপো!" এই আন্তরিক স্বীকার উক্তিতে লেখক কিরণময়ীর সমস্ত অন্তর পাঠক সমাজে খুলিয়া দেখাইলেন। দেখাইলেন যে, প্রতিহিংসার তীব্র উন্মাদনায় দিবাকরকে অপবিত্র করিয়া তুলিবার যে চেষ্টা কিরণময়ী করিয়াছিল সে তাহার সহজ নারীত্বের আন্তরিক বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া নয়; ঘৃণায় উপেক্ষায় তাহার অন্তরের, নারীত্বের বিকৃত রূপের ইহা ক্ষণিক ধর্ম্ম মাত্র। বিশ্বাসের প্রলেপ আবার যখন ফিরিয়া পাইল, সে উপেন্দ্রের চরিত্রে শ্রদ্ধাবতী হইয়া উঠিল। ভুল স্বীকার করিয়া স্নেহের মর্য্যাদায় সে দিবাকরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বলিল, "আর একজনের (উপেন্দ্রের) সর্ব্বনাশ করবো মনে ক'রেই তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছি। কিন্তু সমস্ত আমার আগাগোড়া ভুল হ'য়ে গেছে। আর এই ভুলের জন্যেই আজ তোমার পায়ে ধরে মাপ চাচ্ছি, ঠাকুরপো।"

কিন্তু উপেন্দ্রকে জীবনে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা কিরণময়ী ছাড়িতে পারিল না। প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা ও দ্বন্দ্বের তীব্রতা আবার বাড়িয়া চলিতে লাগিল। প্রাণের সত্যকে অস্বীকার করিয়া, ইহকালের আশা পরকালে পরিপূর্ণ দেখিতে ও জন্মান্তরে মনের সাধ পূর্ণ দেখার অপেক্ষা করা, তাহার আন্তর ধর্ম্মবিরোধী ছিল। অন্তরের তৃপ্তি, ইহকালের সুখ, তাহার ইহকালেই চাই। অন্যথায়, ব্যর্থতায়, মৃত্যু বরণ করাই কিরণময়ীর চরিত্রের একমাত্র সম্ভাব্য পরিণতি। "আমি ভগবান মানি নে, আত্মা মানি নে, জন্মান্তর মানি নে—ধর্ম্ম নরক, ওসব কিছুই মানি নে—ও সমস্তই আমার কাছে ভূয়ো, একেবারে মিথ্যে! মানি শুধু ইহকাল, আর এই দেহটাকে। ...কিন্তু এ জীবনে পোড়া দেহটা কি আর ছাই কিছুই চাইলে না, চাইলে শুধু ভালবাসা? যেদিন সত্য সত্যই ভালবাসলুম, সেইদিনই টের পেলুম কেন আমার সমস্ত দেহটা এমন ক'রে এর জন্যে উন্মুখ হ'য়ে অপেক্ষা করছিল।"

কিরণময়ীর অপরাজেয় দুর্ম্মদ নারীত্ব শক্তি সারা জীবনে মাত্র দুইটি বৃহত্তর চরিত্রের পরিচয়ে আসিয়াছিল। পরিচয়ে সতীশকে শ্রদ্ধায় অনুপ্রাণিত করিয়া ভ্রাতার আসনে বসাইল; আর উপেন্দ্র, চরিত্র-শক্তির দৃঢ়তার জন্য তাহার সারা বুক জুড়িয়া দেবতার আসনে বসিল। বস্তুবাদ-বিশ্বাসী কিরণময়ী ইহকালের দৈহিক ও আন্তরিক সুখই জীবনের চরম সার্থকতা মানিয়া লইয়া আন্তর আসনস্থিত কাল্পনিক দেবতার জাগ্রত স্পর্শ দেহের প্রতি অনুপরমাণুতে পাইতে চাহিল। জন্মান্তরে বিশ্বাস না থাকায়, জীবনান্তরে প্রাপ্তির অপেক্ষা সে করিতে পারিল না। কিন্তু উপেন্দ্র ছিলেন ঈশ্বরে, জন্মান্তরে নির্ভর-বিশ্বাসী, প্রেমভক্তি উচ্ছলা সুরবালার স্বামী। তাহাকে প্রাপ্তির পথ তাই এক

সুরবালাই জানিয়াছিল। বিশ্বাস, ভক্তি ও নির্ভরের অচ্ছেদ্য স্বর্ণসূত্রে তাই উপেন্দ্র এই বিচারবুদ্ধিবিহীনা, একান্ত নির্ভরশীলা, 'পশুরাজ' সুরবালার অন্তরে চির প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। প্রলয়ের উন্মাদ আবর্ত্তে, প্রলোভনের দুর্নিবার আকর্ষণে, দৈহিক যৌবন-সম্পদে এবং ইহকালের কঠোর তপস্যায়ও কিরণময়ী উপেন্দ্রকে তাহার সেই আসন হইতে টলাইতে পারিল না। উপেন্দ্র সাবিত্রীকে যে বিধি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন, যদি কিরণময়ীও অনুরূপ বিধান মানিয়া লইতে পারিত, যদি অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় কঠোর তপস্যায় জন্মান্তর পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিত, জীবনে তাহার উন্মাদ ধর্ম্ম আসিত না। জ্ঞানধর্ম্মে, উপেন্দ্র, কিরণময়ীর আন্তর শক্তি ও তাহার গতি সকলই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নিরুপায়ে, করুণায় এই গতি শক্তির ইহকালে কোন শান্তির বিধান না করিতে পারিয়া বিক্ষোভে তাঁহারও অন্তর্দাহ হইতেছিল। যে এই প্রমত্ত দুর্ণিবার শক্তিধারাকে শান্ত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিতে পারিত সেই 'পশুরাজ' সুরবালার সান্নিধ্য কিরণময়ীর ভাগ্যে আর ঘটিল না। কিরণময়ী সুরবালাকে অতি অল্পক্ষণের পরিচয়ে জীবন-গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছিল। স্নেহে ও প্রেমের কি গভীরতায় ও অতল স্থৈর্য্যে যে নারী তাহার দেবতাকে জীবনে লাভ করিতে পারে, ঐ সাময়িক পরিচয়ে কিরণময়ী সুরবালার নিকট সে শিক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু নারীর গভীর প্রেমসমুদ্র যে শক্তিতে প্রশমিত, শান্ত করিতে হয় সে শিক্ষার সুযোগ কিরণময়ী পাইল না। সুরবালার সংসর্গ তাহার ভাগ্যে আর ঘটিল না। ঘটিলে হয়ত আখ্যায়িকায় সাবিত্রীর চরিত্র বিকাশের পরে আর কিরণময়ী চরিত্রের পরিণতি দেখাইবার কোন আবশ্যক হইত না। এই অপরাজেয় দুর্ব্বার নারীত্ব শক্তি, "জীবনে

কেবল একটা লোকের কাছে একদিন হার মেনে মাথা হেঁট ক'রেছিল, (ক'রেছিলুম), সে সুরবালার কাছে।"

আখ্যায়িকা হইতে সুরবালাকে অপসারিত করিয়া তাই লেখক এই দুর্ম্মদ নারী চরিত্রের সহজ পরিণতি দেখাইলেন। উপেন্দ্রের জীবন সংশয়ের খবর পাইয়া এবং সতীশের মারফৎ ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন শুনিয়া কিরণময়ী ক্ষমা লাভের আশায় সতীশের সহিত দিবাকরকে লইয়া আরাকান হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিন্তু জাহাজঘাটে নামিয়া যখন বেহারীর মুখে শুনিল, "সেই বৌটি যদি এসে থাকে ত তাকে আর কোথাও রেখে আপনারা দু'জন বাসায় আসবেন, সঙ্গে আনবেন না যেন" এই কথা সাবিত্রী বলিয়া দিয়াছে, এবং "উপীনবাবু কাল রাত্তিরে সাবিত্রী মাকে ডেকে নিজেই বল্লেন ভয় নেই, কিরণ বৌঠান আমার ব্যারামের নাম শুন্‌লে এ বাসায় কেন, এ পাড়ায় ঢুকবেন না", তাহার মনে পড়িল, উপেন্দ্রের সেই শেষ কথা, 'ভাল আপনি বাসতে কাউকে পারবেন না, শুধু সর্ব্বনাশ করতেই পারবেন।' উপেন্দ্রের ক্ষমার বা আশ্রয়ের কোন আশা আর তাহার রহিল না। শেষ বিদ্রোহে আন্তরধর্ম্মচ্যুত হইয়া কিরণময়ী উন্মাদ হইয়া গেল। লেখক এই অসাধারণ চরিত্রের সাধারণ পরিণতি দেখাইলেন। এবং আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তিতে ইঙ্গিত রাখিয়া গেলেন যে, ক্ষমা ও স্নেহের যাদু ব্যতীত প্রমত্ত চরিত্রকে প্রশান্ত করিবার আর অন্য কোন উপায় নাই।

উন্মাদ অবস্থায় মানবের মনোবৃত্তিগুলি পরস্পরের সহিত বন্ধন-হারা হইয়া বিশৃঙ্খল ও অসংলগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মনোবৃত্তির অসংলগ্ন প্রকাশই উন্মাদের লক্ষণ, এই অবস্থায় বৃত্তিগুলি যে কেবল

পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় তাহা নয়, সর্ব্বপ্রকার বাহ্যিক প্রভাব হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। বুদ্ধি, শিক্ষা, সংস্কার ও সমাজধর্ম্মের কোন প্রভাবই আর উন্মাদ মনে লক্ষিত হয় না। উন্মাদের বিভিন্ন মনোবৃত্তিসকল এক এক সময় এক একটি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। অবজ্ঞা, উপেক্ষা ও ঘৃণার যে তীব্র আঘাতে বিক্ষুব্ধ হইয়া কিরণময়ীর আত্মসম্মান জ্ঞান, অভিমানে প্রতিহিংসায় উপেন্দ্রের উন্নত শির ভূলুণ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, আরাকান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর জাহাজঘাটে বিহারীর মুখে কিরণময়ী উপেন্দ্রের আবার অবজ্ঞার ও উপেক্ষার ইঙ্গিত পাইয়া আঘাতে মনোধর্ম্ম বিচ্যুত হইয়া উন্মাদ হইয়া গেল। এবং তাহার চিত্তবৃত্তির অসংলগ্নতা প্রকাশ পাইতে লাগিল।

আরাকানের পথে দিবাকরের মুখে উপেন্দ্রের গুণগান শুনিয়া একদিকে যেমন কিরণময়ীর প্রতিহিংসাবৃত্তি শান্ত হইতেছিল, অন্যদিকে অন্তঃসলিলারূপে ধীরে ধীরে সুরবালাব জীবনাদর্শ তাহার অন্তরে সঞ্চারিত হইতেছিল। তাহার অবচেতন মনে একনিষ্ঠ গভীর প্রেমস্বরূপের এক গভীর ছাপ পড়িতেছিল। কি অতল, স্থির প্রেম-সম্পদে, কি একনিষ্ঠ আন্তর নির্ভরশীলতায়, কি অটল ও দৃঢ় বিশ্বাসে এবং আত্মহারা অবিচলিত ভক্তি নিবেদনে যে নারী জীবনে সার্থকতা লাভে ধন্য হইয়া থাকে তাহা কিরণময়ীর সমুদয় চেতনারাজ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল। আরাকান প্রবাসের নিরুপায় আবেষ্টনে সে তাহার এই আন্তর বিশ্বাসকে কার্য্যে রূপায়িত করিবার কোন অবসর পাইতেছিল না। দুর্ভেদ্য আবেষ্টন হইতে উদ্ধার লাভের কোন আশাই তাহার ছিল না।

কিরণময়ী ও সাবিত্রী

সতীশের আরাকান আগমন একেবারেই অপ্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু সেই অসম্ভব যখন সম্ভব হইল; তাহাদিগকে ফিরাইয়া আনিতে উপেন্দ্রের ক্ষমা ও স্নেহের বার্ত্তা বহন করিয়া যখন সতীশ উপস্থিত হইল এবং জানাইল যে মৃত্যুপথযাত্রী উপেন্দ্র তাহাদিগকে শেষ বিদায় দিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন, উপেন্দ্রের জীবন আশঙ্কায় কিরণময়ী সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিল। গৃহত্যাগের পরে আরাকান হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের শেষ মুহূর্ত্তে কিরণময়ীর সমস্ত অন্তরখানি কিরূপে উপেন্দ্রের প্রতি একান্তে নিবেদিত ছিল, উপেন্দ্রের প্রতি কিরণময়ীর ভালবাসা ও আকর্ষণ কত সুদৃঢ় ছিল লেখক তাহা কিরণময়ীর চেতনা লোপের সূক্ষ্ম ইঙ্গিতে দেখাইলেন। আনুগত্যে, প্রেমের গভীরতায় সম্পূর্ণ আত্মহারা হইয়া কিরণময়ী আত্মাভিমান সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিল। জাহাজ ঘাটে পৌছিয়া বিহারীর মুখে উপেন্দ্রের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার ইঙ্গিত পাইয়া আঘাতের গুরুত্বে তাহার মনোধর্ম্ম বিপর্য্যস্ত হইল। সুরবালার আদর্শে বিশ্বাস ও ভক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া প্রেমধর্ম্মে দীক্ষিতা কিরণময়ীর মনে অভিমান বা বিক্ষোভ আর জাগিবার অবসর পাইল না। দেবতার আদেশ বিচ্ছিন্নজীবনে বরণ করিয়া লইয়া সে সতীশের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থানে উঠিল। দেবদর্শনেচ্ছু সুদূরের যাত্রী প্রাণের যে কি গভীর কামনায় সেই দর্শন প্রার্থনা করিতেছিল, কিরূপে কায়মনোবাক্যে যে সে উপেন্দ্রের রোগমুক্তি কামনা করিতেছিল, তাহা কিরণময়ীর "আমি ভগবানকে দিনরাত জানাচ্ছি তার (উপেন্দ্রের) পায়ে ত আমি অনেক অপরাধ করেছি, তাই তার ব্যামো আমাকে দিয়ে তাকে আরাম করে দাও। আচ্ছা, ভাই, একি হ'তে পারে? উপোস করে দিন রাত ডাকলে সত্যি সত্যিই কি তাঁর দয়া হয়? তাঁকে

ডাকলে তিনি আসেন? গঙ্গাস্নানে অনেক পাপ কেটে যায়, না?” প্রভৃতি আকুল-জিজ্ঞাসায় সুস্পষ্ট হইয়া ওঠে। বিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তি উন্মাদ কিরণময়ীর কি গভীর নিষ্ঠা ও আকর্ষণে উপেন্দ্রের নিকট নিবদ্ধ ছিল তাহা আমরা দেখিতে পাই। অবিচলিত প্রেম ও ভক্তির অনিরুদ্ধ এক আকর্ষণে যেন যন্ত্রচালিতবৎ কিরণময়ী মুমূর্ষু উপেন্দ্রের শয্যাপার্শ্বে উপনীত হইল। সে, ‘যেন কোন্ উগ্র ক্ষুধাতুর উন্মাদ শোকমূর্ত্তি ধরিয়া ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।’ যে কিরণময়ী ইহকাল ও দৈহিক সুখ ভিন্ন জীবনের অন্য সার্থকতার কথা কোনদিন ভাবিতে পারে নাই, বিচারলব্ধ জ্ঞান ভিন্ন বিশ্বাস, ভক্তির স্থান যে কখনও স্বীকার করে নাই, সুরবালার চরিত্র আদর্শে সেই কিরণময়ীর অন্তরে বিশ্বাস ও ভক্তির কি স্নিগ্ধ অন্তঃসলিলা ধারা উৎসারিত হইতেছিল, লেখক তাহা দেখাইলেন। উন্মাদ কিরণময়ী বলিল, “সুরবালা মরে গেছে শুনে আমি আর কেঁদে বাঁচিনে। সেই ত আমার গুরু! সেই ত আমাকে ব’লেছিল ভগবান আছেন! আহা! তখন যদি বিশ্বাস হ’ত!·····আমার আঁচলে মা কালীর প্রসাদ আছে, ঠাকুরপো (উপেন্দ্র) একটু খাবে? আহা, কত কাঁদলুম, কত তোমার জন্যে বললুম ঠাকুরপো! বলি, ‘মা কালি! ঠাকুরপোর ব্যামো আমাকে দিয়ে তাকে ভাল করে দাও! আমার বেঁচে থেকে আর লাভ কি! কি বল ঠাকুরপো? সত্যি নয়?” ভক্তি বিশ্বাস ও একান্তে আত্মনিবেদনের অম্লান অর্ঘ্য উপেন্দ্র গ্রহণ করিলেন। ‘উপেন্দ্রের চোখ দিয়া কিরণময়ীর জন্য জল গড়াইয়া পড়িল।’ সার্থকতায় উন্মাদ কিরণময়ীর প্রাণেও আনন্দধারা উৎসারিত হইল। কি সে তৃপ্তি! “নীচের ঘরে কিরণময়ী ঘুমোচ্ছেন,” সতীশের এই উক্তিতে লেখক চির ঝঞ্ঝাহত উন্মাদ কিরণময়ীর প্রাণেও যে তৃপ্তির

কি শান্তিধারা আসিয়াছিল তাহা দেখাইলেন। তৃপ্তির গভীরতায়, প্রাপ্তির নির্ভরতায় ও জীবন সার্থকতায় যখন "সকলের বিদীর্ণ কণ্ঠে গগনভেদী ক্রন্দনে সমস্ত পাড়া কাঁপিয়া উঠিল", তখনও, "স্বস্তিতে নীচের ঘরে কিরণময়ী ঘুমাইতে লাগিল।"

এইরূপে লেখক যে সঙ্কীর্ণ, অনুদার ও পঙ্কিল আবেষ্টনে কিরণময়ীর অসামান্য নারীত্ব শক্তি বিষাক্ত হইয়া বিকৃত হইতেছিল, একে একে সেই আবেষ্টনসকলকে উদার, সম্প্রসারক ও সহানুভূতিমণ্ডিত করিয়া কিরণময়ীর আন্তরশক্তির স্বরূপ ও মাধুর্য্য সুপ্রকাশিত করিলেন। পাঠকের সহানুভূতির সহজধারা কিরণময়ীর প্রতি সুনিবদ্ধ রহিল।

করেন। তাঁহার তুলিকায় সত্য ও সুন্দরের স্বরূপ-মাধুর্য্য ফুটাইয়া তিনি বিশ্বকে পরিবেশন করেন। যেমন কোন একটি নৈসর্গিক দৃশ্য অঙ্কন করিতে গিয়া, প্রকৃতির কেবল সুন্দর ও সবুজকে ফুটাইয়া তুলিলেই শিল্পীর কাজ শেষ হয় না, স্থানীয় অনুর্ব্বর ক্ষেত্র, জঞ্জাল, আগাছা প্রভৃতি যাহাতে চিত্রপটে অসুন্দর না দেখায় তাহার বিধান করা যেমন শিল্পীর প্রতিভার পরিচয়, তেমনই কেবলমাত্র চরিত্র-মাধুর্য্য ও উৎকর্ষ্য সুন্দর করিয়া পরিবেশন করিলে কথাশিল্পীর চরিত্র-অঙ্কন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কেননা, সকলেই দোষেগুণে মানুষ। তাই পাপপুণ্য সকল মানুষের প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। তাই যদি চরিত্রের দুর্ব্বলতা ও পঙ্কিলতাকে ঘৃণায় বর্জ্জন করা হয়, তাহা হইলে পাপ-পঙ্কের উদ্ধারের আর কোন সুযোগ থাকে না। শিল্পী বিচারক নন, তিনি কবি। তাঁহার প্রতিভায় দোষগুণ মিশ্রিত মানবচরিত্রসকল

দোষে ও গুণেই সুন্দর হইয়া ওঠে। সৃষ্টি-নৈপুণ্যই হইল শিল্প-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য।

স্বীয় প্রতিভায় শিল্পীর চক্ষে সুন্দরের যে চিত্র প্রতিভাত হয়, শিল্পী তাহাকেই রূপ দান করিয়া থাকেন। এই রূপায়ন, ছবি, কতখানি জীবন্ত ও বাস্তব হইল, কল্পনার ছবিখানিতে কতখানি বাস্তবের প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় শিল্পী সক্ষম হইয়াছেন, শিল্প বিচারে তাহা প্রথম দ্রষ্টব্য। বাস্তবের স্পর্শহীন কল্পনা একদিকে যেমন প্রাণহীন, অন্যদিকে কল্পনা অনমুপ্রাণিত বাস্তব তেমনি নীরস ও অনমুপ্রেরক। চরিত্রের নগ্নতায়, পঙ্কিলতা যদি চক্ষে পড়ে, নীতিসূত্রের ও আদর্শের দোহাই দিয়া যদি সেই নগ্নতাকে আমরা একবারে ত্যাগ করি, তবে চরিত্র-সত্যের একদিক অস্বীকার করা হইবে; এইরূপ একচক্ষু হইয়া শিল্পী চলিতে পারেন না, এবং চলিলেও তাহা নীতির দিক দিয়া মঙ্গলপ্রদ হয় না। শুধু যাহা আছে তাহাকেই অস্বীকার করা হয় মাত্র। এবং এই অস্বীকার ও উপেক্ষায় সে পঙ্কিলতা আর পরিমার্জ্জিত হইয়া সুন্দর হইবার সুযোগ পায় না। তাই যেমন স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে প্রকৃতির নগ্নতা ও পঙ্কিলতা শিল্পীর তুলিকায় সুন্দর হইয়া ওঠে, তেমনি চরিত্র-শক্তির যথাযথ স্ফুরণ এবং শক্তির স্বাভাবিক গতি মাধুর্য্যে, লীলায় দোষ-ত্রুটিগুলিকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া, মঙ্গলাদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া ক্ষমার্হ করিয়া তোলাই প্রতিভাবান্ শিল্পীর বৈশিষ্ট্য। তিনি পঙ্কিলতাকে আরও পঙ্কিল, এবং দুর্ব্বলকে দুর্ব্বলতর করিয়া তোলেন না, তাহাদের বাস্তব রূপ দেখাইয়া যাহাতে পরিমার্জ্জিত ও সবল হইবার সুযোগ পায়, সৌন্দর্য্যের সংস্পর্শে তাহার বিধান করেন।

নারী চরিত্রের আন্তর শক্তির বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ কি, তাহার প্রকৃতিগত

কিরণময়ী ও সাবিত্রী

মাধুর্য্য ও শক্তি কিরূপ আবেষ্টনে ও ধারায় প্রবাহিত হইলে সুন্দর হইয়া ওঠে, বিরোধী শক্তির সংঘাতে তাহা কি রূপ ধারণ করে, এইরূপ যত প্রকার আবেষ্টন ও শক্তির সংঘর্ষে অনুকূল ও প্রতিকূল শক্তির সংঘাত নারীত্বে সম্ভব হইতে পারে, শরৎচন্দ্র শক্তির সেই সম্ভাব্য-বিকাশগুলি তাহাদের স্বাভাবিক গতি ও পরিণতি, প্রকৃত ও বিকৃত অবস্থা, যেমন যেমন দেখিয়াছেন তেমনি স্বীয় লেখনীতে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ইহাতে তিনি কোন নীতির প্রশ্ন, আদর্শের কথা উত্থাপন করেন নাই। তিনি নারীর আন্তরশক্তির সহজ রূপ যেমন দেখিয়াছেন তাহাই আঁকিয়াছেন। তাঁহার এই দেখা সত্য কিনা বুঝিতে হইলে আমাদের অন্তরে তাঁহার চিত্রগুলি কিরূপ ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে তাহাই বুঝিয়া দেখিতে হইবে। এই আন্তরশক্তি কি ধারায় সুনিয়ন্ত্রিত করিলে মঙ্গলাদর্শের আবির্ভাব হইবে সে কথা সমাজকর্ত্তা ও নীতিজ্ঞদের বিচার্য্য। শিল্পী শরৎচন্দ্র অন্তঃশক্তির যে নিগূঢ় প্রবাহ দেখিতে পাইয়াছেন, আন্তর সত্যের যে রূপ দেখিয়াছেন, সেই শক্তি ও রূপের সহজ বিকাশ অঙ্কন করিয়াছেন। তিনি সমাজকর্ত্তা নন, নীতিজ্ঞ নন, অর্থশাস্ত্রবিৎ নন—তিনি কবি, দ্রষ্টা ও শিল্পী। তাঁহার প্রতিভায় বিশ্বের যে রূপ যে ভাবে ধরা পড়িয়াছে, তিনি তাহাই সৌন্দর্য্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিত মঙ্গলাদর্শে অনুপ্রাণিত করা নীতিজ্ঞদের কাজ, তাঁহার নয়।

শেষ